তিন দশকের পদাতিক

(ছোটগল্প সংকলন)

অনাথবন্ধু রায়চৌধুরী

অনন্যা
১৭/১, শ্মশান কালীতলা রোড, বড়িষা

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ মহালয়া, ১৯৬৪

প্রকাশক
শ্রীমতী মীরা রায়চৌধুরী

প্রকাশক
অনন্যার পক্ষে
শ্রীমতী মীরা রায়চৌধুরী
১৭/১, শ্মশান কালীতলা রোড,
বড়িশা, কলিকাতা-৮

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরতা

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায়
সারদা প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,
২২, পঞ্চাননতলা রোড,
কলিকাতা-৪১

প্রাপ্তিস্থান ঃ

দে'জ
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

নাথ ব্রাদার্স
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

তমলুক
২৮, দেশপ্রাণ শাসমল রোড,
সি, আই, টি, মার্কেট
কলিকাতা-৩৩

এই গ্রন্থ নিবেদিত হলো

আমার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখের সাথী

জীবনরসিক-শ্রীমতী মীরা রায় চৌধুরীর উদ্দেশ্যে।

সূচীপত্র

বিষয়

আমার কথা

তিন দশকের পদাতিক একটি দুঃসাহসী গল্প সংকলন।

সাতচল্লিশের পর থেকে এই তিন দশকের জীবনের খণ্ড খণ্ড বিচিত্র উপলব্ধি গোটা দেশ কালের সংঘাতময় অখণ্ড ঘটনা প্রবাহের আলোকসম প্রতিবিম্ব। বিম্বিত হয়েছে প্রতিটি গল্পে অনন্য স্বাদের পরীক্ষিত আংগিকে। যে মূল্যবোধের ওপর ভাস্বর হয়ে আছেন আমার পূর্বসূরী শিল্পী সাহিত্যিকেরা এবং সাম্প্রতিক কালের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় নক্ষত্রসম সাহিত্যকর্মীরা তাদের সৃষ্টিশীল সার্থক সাহিত্যকর্মের মধ্যে —আমি তাদেরই অনুগামী।

শুধু তাদের কাছে নয় প্রতিদিনের জীবনে কঠিনতম মূল্যবোধের মাধ্যমে যারা প্রত্যাশা করেন, জীবন বৃহত্তর স্বার্থে মহৎ প্রচেষ্টায় পরিত্যাগ করুক সুখী স্বার্থান্বেষী চতুর ক্লীবত্ব, ক্রীতদাসত্ব—আমি প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ সেই অগণিত অনভিজাতের কাছে। বাংলা সাহিত্যের রাজকীয় মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত সেইসব মহাজন মহানায়কদের সাধনার বৃহৎ আংগিনায় আমার পদার্পণ, সামান্যের এ দুঃসাহসিক অসামান্য স্পর্ধা নিঃসন্দেহে কৌতুককর—তবু এটাই আমার পথ। এ পথের ঋত্বিক হতেই আমি বেশী আগ্রহী।

এই তিন দশকের আলো অন্ধকারেই আমার জন্ম। জন্ম আমার চেতনার। শত পথ শত মতের অনিবার্য আবর্তনে আবিল, আবিলতর ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের অন্তরাত্মা। সাম্রাজ্যের লোভ, সম্পদের লুঠেরা মনোবৃত্তি আজ ঘরে বাইরে প্রচণ্ড সাবালক। সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের মাঝখানে সৃষ্টি করেছে যে প্রজাতিগত ফাঁক এই তিন দশকের জীবনে তার জ্যামিতিক প্রতিফলন বড়ই বিস্ময়কর। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে জল্লাদ প্রভুশ্রেণী ও ততোধিক নিষ্ঠুর তাদের ভৃত্যেরা জাদুকরী কায়দায়

টেনে নিয়ে চলেছে গোটা জাতটাকে। যে দেশে মানুষের একটু ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতাই বিপন্ন সেখানে বিশুদ্ধ শিল্প-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক কলাচর্চ্চার কথা ভাবা বিকৃতি। কোন রকম আত্মসন্তুষ্টি না নিয়েই বলছি একজন শ্রমজীবি হিসেবে আমার এই সংস্কৃতি প্রীতির দুঃসাহস যদি সুধীজনের দৃষ্টি-গোচর হয় কোন করুণা-নয় নির্মমভাবে সমালোচিত হোক। অগণিতজনের অবহেলিত মনের অপমানকর বুকজোড়া জ্বালা নিয়ে আমিও স্বীকার করে নিই আমার অপূর্ণতা। প্রচণ্ড এই ভেজালের যুগে আমার মৌলিক সাহিত্যকর্মের জন্য কোন রকম প্রসংশার ছাড়পত্র দাবি করছি না।

নমস্কার

অনাথবন্ধু রায়চৌধুরী

এই গ্রন্থ প্রকাশে যতদূর সম্ভব নিখুঁত করার চেষ্টা হয়েছে। লোড্‌শেডিং ও অন্যান্য কারণে কিছু ত্রুটি থাকলে তারজন্য আমি দুঃখিত। —লেখক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে আমার কর্মজীবনের সাথী তেল কালি বালি ঘাটা সেই সব মজবুত মানুষদের কাছে, যাদের দরদী সাহচর্য এই গ্রন্থের প্রাণ ; আমি ঋণী।

শ্রীবাবলু তরফদার, সত্য সাহা, প্রবীর রায়, রঘুনাথ মণ্ডল, দিলীপ মান্না, উদ্দ্‌ কবি, মহম্মদ হোসেন ও আরও অনেকে।

বিশশতক পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীশান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ সলিল রায় (পোর্ট ট্রাষ্ট, সেন্টিনারী হসপিট্যাল)।

আমি কৃতজ্ঞ আমার সাহিত্যিক, কবি, শিল্পীবন্ধু শ্রীবীরেন ঠাকুর, বীরেন সরকার, দেবকুমার মুখার্জীর কাছে।

আমি কৃতজ্ঞ ফিজিক্যাল কালচারের একদা প্রখ্যাত, সেই বিপ্লবী মনের সৌম্য সুন্দর মানুষ শ্রীনির্মল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

আমি কৃতজ্ঞ দূরদর্শনের কর্মী আমার বান্ধবী শিল্পী মনের মালতী মুখার্জীর কাছে। (আমার সিষ্টার)

আমি ঋণী পরম শ্রদ্ধেয় কালিঘাট হাই স্কুলের কৃতিমান শিক্ষক বন্ধু শ্রীমুরারী চট্টোপাধ্যায়, স্বপন চট্টোপাধ্যায় ও নাট্যশিল্পী ও গল্প লেখক মিহির চৌধুরীর কাছে।

গ্রন্থ প্রকাশে বন্ধুবর কুশল নাগের সহযোগিতার কাছে আমি ঋণী।

আমার জীবন সংগ্রামের দরদী সহমর্মী আমার আত্মীয় ও পরম আত্মীয় যারা আমায় সৎ জীবনে চলার প্রেরণা দিয়েছেন, যারা বেঁচে নেই, যারা বেঁচে আছেন সকলের শুভেচ্ছা আর ভালবাসাকে প্রণাম জানিয়ে আন্তরিক ভাবে ঋণ স্বীকার করে নিচ্ছি।

সবশেষে এই গ্রন্থের মুদ্রণ শিল্পী, মুদ্রণ যন্ত্রের পরিচালককে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমার কর্তব্য।

অনাথবন্ধু রায়চৌধুরী

যখন টাকার মূল্য চব্বিশ পয়সা

১

যদি এক টাকার মূল্য চব্বিশ পয়সা হয় তাহলে একজন মানুষের দাম কত হবে? প্রশ্ন মোমের।

মোম সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। প্রণবেশ তার গৃহ শিক্ষক। এমন ধরণের অংক প্রণবেশ তার ছাত্র জীবনে পেয়েছে বলে মনে হয় না। বি.এস.সি. পাশ করে এখনও সে চাকরী পায়নি। দু'চারটে টিউশানি করতে হচ্ছে। অংক ইংরিজিতে প্রণবেশ চিরকালই ভাল। রীতিমত লেটার পাওয়া ছাত্র। বয়স এখন তার বাইশ বছর। বড় ইচ্ছে ডাক্তারী পড়ার। এখনও সে সুযোগ হয়নি। ঠিক আছে ডাক্তারী যখন পড়া হল না, চেষ্টা করেছিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার, তাও যখন হলনা এখন সে ভাবছে এম.এস সি. পরীক্ষা দেবার কথা। একটা বছর নষ্ট হল। মোমের বাবা, মি. বোস. একটা বিলিতি ফার্মের একজন ফোরম্যান্। তার মা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌সের একজন কর্মী। তাদের একমাত্র সন্তান মোম।

অংকটা যে ঠিক কি সেটাই বোঝাতে পাচ্ছে না মোম। অংকের দিদি মুখে মুখে ক্লাসে বলেছেন। মেয়েরা খাতায় টুকে নিয়েছে। মোম সবটা পারে নি। শুধু প্রথম লাইনটাই সে মনে করতে পারে। মনে মনে ভীষণ চটে যায় প্রণবেশ। চালাকী—তার সংগে চালাকী করা হচ্ছে?

—জানেন, সামনে রবিবার আমরা দীঘায় বেড়াতে যাচ্ছি। আপনি কখনও দীঘায় গেছেন? সমুদ্র দেখেছেন? সমুদ্রের আওয়াজ মানে গর্জন আর ঝাউবন—মার কথাই ফাইন্যাল।

—তুমি কি এখন গল্প করবে, না—

—জানেন, বাপি না চেকে মাইনে পায়। পুরো মাইনেটা

ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ায়। আপনার কোন একাউণ্ট আছে? বাপি বলে—প্রত্যেকের একটা স্মল্ একাউণ্ট থাকা দরকার।

চুপ কর। ধরা যাক্, এক টাকার মূল্য সমান একজন মানুষের দাম, মানে কি? একজন মানুষের শ্রমের দাম। এবার থেকে অংক ভাল করে খাতায় টুকে নিয়ে আসবে, বুঝেছ ?

—দূর বাবাঃ! এসব অংক আমার মাথায় একদম ঢোকে না।

—ক্যাটবেরী আর ক্যাম্পাকোলা খেয়ে খেয়ে তোমার মাথায় আর কিছু নেই।

—আমার মাও তাই বলে।

সমস্ত ঘরটা পুরো লাল কার্পেটে মোড়া। নরম কার্পেটে পা রাখতে ভারি আরাম। ঘরটা বেশ বড়। মধ্যিখানে নানা রংয়ের মার্বেল পাথরে মোড়া থামটা দেখতে বেশ লাগে কেমন মোগল আমলের মত। উত্তর দিকে চার ফুট বাই পাঁচ ফুট একটা শার্সি পাল্লার জানলা। জানলার এপারে অর্থাৎ ঘরের মধ্যে ঠিক নিচে দেওয়ালের গায়ে একটা বক্স টাইপ ফুলের কেয়ারী। তাতে কিছু মৌসুমী ফুলের চারা ও সবুজ মানি প্ল্যাণ্ট। তার পাশে একটা বেশ বড় একোরিয়াম, তার পাশে বাথ্রুমে যাওয়ার দরজা, তার পাশে ঠাকুরঘর, তার পাশে কুকুরের ঘর—দরজার ওপর একটা প্লেট লাগানো—Beware of Dog. কুকুরের ঘরে একটা সিংগেল বেড খাট, একটা ছত্রিশ সাইজ সিলিং ফ্যান, কাঁচের দরজা। দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। ফ্যানটা চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুরছে। নাম তার ডেল—কুকুরটার। লোপসি খায় আতপ চালের, সংগে চারটে পাকাকলা, দু'টাকার রসগোল্লা, আধসের টক দই সয়াবিন পাউডার দিয়ে ফ্রিজে পাতা। রাতে পাহারা দেয়। ডেলের গায়ে বিশ্রী গন্ধ। সিনথল্ সাবান দিয়ে বাহাদুর স্নান করায়। যখন সামনে দিয়ে পায়খানা করাতে নিয়ে যায় তখন একবার করে মোমের নরম সুদৃশ্য পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত চেঁটে যায়। তখনি মনে হয় ওটা ভীষণ অসভ্য। ছাত্রীর সামনে একজন তরুণ শিক্ষকের

শালীনতা—মোমের খুব ভাল লাগে। গা শিরশির করে প্রণবেশের। তের বছরের মোমের শরীর প্রায় ষোল বছরের মত। ওর সাজানো দাঁতগুলো খুব সুন্দর। হাসিটা দুষ্টুমীতে ভরা। মোম বলে—ওরা শিবা কোম্পানীর ফ্লোরাইড পেষ্ট ব্যবহার করতো। কিন্তু কোম্পানী ষ্ট্রাইক—বোম্বের অনেক ওষুধ কোম্পানীতেই ধর্মঘট চলছে। বাধ্য হয়ে ওরা এখন ব্রাইট ব্যবহার করছে।

কে জানে কবে প্রণবেশ চাকরী পাবে বাইশ বছরত পার হতে চল্লো। কুকুর চাঁটা পায়ে মোম হাত বুলোয়, সেই হাত দিয়ে ঘাড় চুলকোয়, সেই হাত দিয়ে কলম ধরে, সেই কলমে প্রণবেশকে লিখতে হবে—কি বিশ্রী ব্যাপার। ওর পড়ার টেবিলটা খুব দামী। দুধ সাদা সানমাইকা দিয়ে টপটা বাঁধানো। কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না অংকটা কোন্ ফরমূলায় করা যায়। তাছাড়া অঙ্কটা যদি সম্পূর্ণ পাওয়া যেত। তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—

—এই সুকুমারী?

—কি হল? মোম জবাব দেয় না। হাসে। প্রণবেশ বুঝতে পারে না হঠাৎ সুকুমারীর কি প্রয়োজন হল।

—সুকুমারী?

—যাই দিদিমণি!

প্রৌঢ়া সুকুমারী আঁচলে চাবি বাঁধতে বাঁধতে তিনতলা থেকে নেবে আসে। শোন্! আমার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে আছে—তাড়াতাড়ি যা।

সুকুমারী একটা ট্যাবলেট আর ফ্রিজ খুলে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসে। এখন ফ্রিজ খোলা। আপেল, কমলালেবু, কলার সংগে পর পর কয়েকটা বোতল সাজানো—জিন্ হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, সোডা, অরেঞ্জ কোয়াস; ক্যাম্পাকোলা।

—কি ব্যাপার তোমার শরীর খারাপ লাগছে?

—ধ্যাৎ? কিছু বোঝে না।

—দাদাবাবু আজ ওনারে ছেড়ে দেন।

—কেন সুকুমারীদি? পড়বে না? আরও পড়া রয়েছে যে ইংরিজি, জিওগ্রাফী, ট্রানশ্লেশন্।

হাসে মোম।

—ও জানে না। টি.ভি.তে আমার নাচের দিদিমণির একটা প্রোগ্রাম্ আছে তাই।

—যাও।

—এই সুকুমারী দরজা বন্ধ করে বইগুলো গুছিয়ে রাখ।

২

হুগলীর লোক ওরা। হুগলী জেলার আরামবাগের লোক প্রণবেশরা। ওর দাদা অমলেশ কোন এক বিখ্যাত দৈনিক সংবাদ-পত্রে কাজ করে। কম্পোজিটর। ভবানীপুরে বাসা নিয়ে থাকে। দু'তিন মাস অন্তর বাড়ি যায়। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর প্রণবেশ ভেবেছিল দেশের কলেজেই ভর্তি হবে। দাদা বললে না, এত ভালভাবে পাশ করে মফঃস্বলের কলেজে পড়তে হবে না। মা ও মাষ্টারমশাইরা ও তাই বললেন। কিন্তু একজন কম্পোজিটরের মাইনে তো বেশী নয়। তার ওপর রাত্রে কাজ। সকালে খবরের কাগজ বিক্রী। তারপর ঘরে ফিরে নিজেদের রান্নাবান্না। তবুও দাদার আত্মবিশ্বাস দারুন। প্রণবেশকে সে-ই ধরে করে—স্কটিশে ভর্তি করে। কি করে সম্ভব হল সেই জানে। শহরের অনেক রহস্য। বিশেষ করে কলকাতাকে আজও বোঝে না। দাদা বলে—তুই বড় বেশী সরল। একটু চালাক চতুর হ দেখি। তুই হচ্ছিস একজন প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্র। এ শহরে তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। হয় ডাক্তার নয় ইঞ্জিনিয়ার। শুধু পড়াশোনা করে যা তারপর আমি আছি।

তবুও শহরের সংগে গ্রামকে এক সরল রেখায় দাঁড় করিয়ে

কিছুতেই মেলাতে পারে না। এখানে প্রচণ্ড মানুষের ভিড়। এখানে মানুষ প্রচণ্ড ব্যস্ত। এখানে মানুষ-মানুষ বুঝে মেপে কথা বলে। এখানে মানুষ ফুটপাতেও ঘরকন্না করে। কলেজের ছেলে-মেয়েরা ভীষণ ফূর্তিবাজ। অনর্গল কথা বলে। প্রতিদিন পোষাক পাল্টায় ছেলে-মেয়েরা পরস্পর বন্ধু হয়। অনেক সময় কাটায় কফিহাউস চাংওয়া, পিপিং, নীরা, সাবিরে। কেউ কেউ কি সব ট্যাবলেট খায়। বেশ কিছুদিন চারিদিকের শব্দে, চেঁচামেচিতে, আলো বাতাসহীন গুমট গরম ঘরে প্রণবেশের নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হতো, ঘুম আসতোনা। আস্তে আস্তে তার মন থেকে এই সব বিভ্রান্তি মিলিয়ে যেতে সুরু করল। মিলিয়ে গেল, গ্রাম, সবুজ গাছপালা, কাদামাটির পথ ঘাট, অলস নির্জন দুপুর, ঝিঁঝিঁ ডাকা সন্ধ্যে, পাখি ডাকা ভোর। দাদা বলতো—ঘুম না হলে, জ্বর বা আমাশা হলে ট্যাবলেট কাছে রাখবি, খাবি। দাদা বললে—দেখি সামনের মাস থেকে একটা ভাড়ার ফ্যানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। এখন কলকাতা একটু একটু করে ভাল লাগছে। সকাল সন্ধ্যে 'চা খেতে সুরু করে মাথা ধরাটাও ছেড়ে গেছে। ভাড়ার ফ্যানে হাওয়ার চেয়ে শব্দ বেশী তবে ঘুম হয়। মা বোনের জন্য মন কেমন করাটা পড়ার চাপে অনেক কমে গেছে। দাদাকে চশমা নিতে হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে সাইকেলে করে কাগজ বিক্রী, পাড়ার কালোমুদির সংগে বাধ্য হয়েই বোনটাকে বিয়ে দিতে হয়েছে দু' বিঘে ধান জমি বিক্রী করে।

প্রণবেশের পাশ করার পর থেকে দাদার ছুটোছুটি বেড়েছে ডাক্তারীতে ভর্তি করার ব্যাপারে। প্রণবেশ জানে যা অসম্ভব তার পেছনে কেউ-কেউ ছুটতে ভালবাসে। তার ভাইয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে অমলেশ ক্ষইছে। একটা একটা করে দিন যায়, পার হয় মাস বছর। অনেকগুলো করে চুল পাকে অমলেশের। তার ছুটি নেই। ছুটোছুটির অন্ত নেই। দাদার মুখোমুখি হতে ভয় পায় প্রণবেশ।

—শালা। এতগুলো লটারীর টিকিট কাটলুম—ওয়েষ্ট বেঙ্গল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, মাদ্রাজ, তামিলনাড়ু —সব ভোকাট্টা। সব ফোরটয়েন্টি। উনিশশো আশি সব ওলটপালট করে দিয়ে যাচ্ছে। এবার জানিস সাট্টায় লাগাতে হবে কিছু পয়সা। দেখি ভাগ্যের চাকা ঘোরে কিনা। দেখলিতো বাঘা বাঘা অনেক লোককে ধরলুম—চিফ-রিপোর্টার, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিফ সেক্রেটারীর ভাইপো আরও অনেক কেষ্ট বিষ্টু—অনেক বিষ্টুকে তেল দিলুম। কেউ পাত্তা দিতে চায় না। বলে গ্রামে পাঠিয়ে দাও স্কুল মাষ্টারী করুক। দেশকে গড়ে তুলুক। জ্ঞান-জ্ঞান দেয়। এদের কিসের বাচ্ছা বলবি? টাকা যদি থাকতো দেখিয়ে দিতুম। একটা যদি কিছু হয়ে বেরুতে পারিস—কাউকে ছাড়বিনা। দুয়ে নিবি—চুষে ছিবড়ে করে দিবি। মাইনেটাও যদি খানিকটা বেশী হত! ঘাবড়াসনি। দেশের বাড়িটা বিক্রী করে দেব। কি হবে দেশ? তোকে যদি মানুষ না করে তুলতে পারি দেশের লোকের কাছে কি জবাব দেব? বকুলবাগানের মি. বোস-কে চিনিস চিনবি না। কিলবার্ণ কো'তে মি. বোস বিরাট অফিসার। ভবানী-পুরের মত জায়গায় নিজের বিরাট বাড়ি, গাড়ি, আমার কাষ্টোমার। দু' তিন খানা কাগজ নেয় ইংরেজি, বাংলা, তিন চারখানা ম্যাগাজিন, লোক ভাল। তবে একটু রেস খেলে, মানে সব সময় খেলেনা, যখন বন্ধু বান্ধবদের সংগে একটু মালটাল খায়, মাল যে সব সময় খায় তা নয়, এই যখন একটু ক্যামাক্ ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাট বাড়িতে গিয়ে ফূর্তিটুর্তি করেন, অবশ্য ওটা ওর দোষ নয়, ওর স্ত্রীর জন্যে, স্ত্রী সুন্দরীতো চাকরী করেন। ওসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাদের কি। পড়ানো নিয়ে কথা। টাকা পয়সা ভালই দেবেন। মেয়েটাও বাচ্ছা-শুধু একঘণ্টা সপ্তাহে চারদিন। এই কম্পোজিটর মানে লেবার। জানিস পনু তুই যদি মি. বোসের মত পরিবারের ছেলে হতিস, দেখতিস। টাকা না থাকলে কেউ মানুষ মনে করে না। যত বড় বিদ্বানই হ'ও না

কেন। এই জন্যেইতো বলতে হয় ভদ্রলোকের বাচ্ছা না ইয়ের বাচ্ছা।

৩

বকুলবাগান, ভবানীপুরের মত জায়গায় নিজের বাড়ি। সামনেটা বেশ সাজানো গোছানো এক ফালি বাগান। উত্তর চাপা হলেও দক্ষিণটা খোলা। একতলার বেশ একটা বড় অংশ পুরো ফ্ল্যাট সিসটেমে ভাড়া দেওয়া। কোন অংশীদার নেই। মি. বোস ভীষণ বুদ্ধিমান সুখী মানুষ। ভবানীপুরেই তিন পুরুষের বাস। উঁচু মহলে ভীষণ প্রভাব। সেই জন্যে বাড়ির ট্যাক্সটাও খুবই কম। পৌর পিতা, পৌর পাল, ও.সি. ডি. সি. মায় চিফ্ মিনিষ্টার পর্যন্ত তার যাতায়াত। ফুটবল খেলে, জুয়া খেলে, মাল খেয়েই কেরিয়ারটা নষ্ট করেছেন তা-নাহলে এতদিনে বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার হ্যা ঐ কিলবার্ণেই। এসব ওর স্ত্রী মিসেস বেলা বোস বোঝেন না। ওর কাছে এসবের কোন মূল্য নেই। ওর কনট্রাক্টর দাদা, বিড়লা কনসার্ণের হোমরা চোমরা বাবা, আই. এ. এস ভগ্নিপোত—বালিগঞ্জে বাড়িখানার দামই আট দশ লাখ টাকা—এর ওপর আর কথা আছে? ওসব মধ্যযুগীয় বনেদী ঐতিহ্যে ওর শ্রদ্ধা নেই।

—বুঝলেন প্রণবেশ বাবু!

—তুমি বলুন!

—বলছিলাম, সুন্দরী মহিলা মাত্রই—যদিও আপনার বয়স আমার হাফ, বিশেষ করে বালিগঞ্জের হয়—যারা আদি কলকাতার খানদান পরিবারের নয়—তারা হয় উগ্র আধুনিকা। পুরুষানুক্রমে এদের কোন বনেদী ঐতিহ্য নেই। হালফিলের উঠতি। যদিও তুমি শিক্ষক প্রায় পুত্রতুল্য, আমার মেয়েকে কোনমতেই ইংরিজি মিডিয়াম স্কুলে ভর্ত্তি করতে রাজি হইনি। আমার স্ত্রী, ওর বাবা, কনট্রাক্টর দাদা, আই. এ. এস. ভায়রা ভাইকে ডেকে এনেছিল আমাকে বোঝাতে। জানেন মশাই—অনর্গল ইংরিজির তোড়ে

স্রেফ ভেসে গেল। স্বীকার করে গেল সাচ্চা বাংলা মিডিয়ামের কাছে ওসব সেণ্ট টাইপ, কনভেণ্ট, মিশনারী তলিয়ে যাবে। বলো —মাষ্টার—মোম-পড়ছে কেমন?

—ভাল। ছেলেমানুষতো—ভীষণ সরল।

—ঠিক। আসলে হয়ে গেছে ক্রশ বিটিং। তার মানে বনেদী খানদানী বংশ + স্রেফ চুরি আর ঘুসের দু'নম্বরী পয়সায় বড়লোক —মিলেমিশে—ওহ্যাঁ! কি একটা অংক বলছিল মোম? যদিও অংকটংক আমার মাথায় আসেনা। আজকাল স্কুলগুলোয় অদ্ভুত অদ্ভুত সব অংক শেখাচ্ছে। সব কিছুর মধ্যে গোজামিল আর ভেজাল। আমাদের সময়ে ছিল কালটিভেশন্ ইজ বেটার দ্যান ম্যাটরিকুলেশন্। টাকার মূল্য যদি চব্বিশ পয়সা হয় তাতে তোর বাবার কি? পলেটিক্স্ বোঝেন? বেসরকারী পুঁজির পরিমাণটা কল্পনা করতে পারেন? সেই অনুযায়ী এগ্রিকালচারে ইনভেষ্ট হচ্ছে? এফি্সিয়েন্সি অফ প্রাইভেট সেকট্র মানে ইনএফিসিয়েন্সি অফ পাবলিক সেক্টর। কেন এক চেঁটিয়া পুঁজি দেশের মানুষের বুকের ওপর চেপে বসবেনা বলুন? মুদ্রাস্ফীতি? সেভেনটি পারসেণ্ট মানুষের খাবার সংস্থান নেই। ত্যানা পরে কাজ কাজ করে ঘুরছে গ্রামে গঞ্জে। বুঝলেন কেন টাকার মূল্য চব্বিশ পয়সায় নাবানো হয়েছে? এই দশ বারো বছর আগেও লোহা কারখানার একজন লেবার যে মাইনে পেত-তাতে সে এক ভরি সোনা কিন্তে পারতো। আর এখন? সারা মাস হাড় ভাংগা খাটুনী খেটেও আধভরি সোনার দাম ওঠে না। আর আপনার দাদা কম্পোজিটরের চাকরী করে ভাইকে ডাক্তারী পড়াবার স্বপ্ন দেখছেন? যত ভাল ছাত্রই হোন না কেন কোন চান্স নেই। পেছনে মামার দরকার। কেন বাবা এসব অংক তোরা স্কুলে শেখাচ্ছিস্ ছেলেমেয়েদের? খালি লেকচার। লেকচারের বাচ্চা তৈরী করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ইয়েস! যদি আমার শ্বশুর বাড়ির মত কোন আমলা পরিবারের ছেলে হতে ঠিক তোমাকে একটা মওকা মত

জায়গায় গেঁথে দিত। লিখে নাও, কথাটা ডট্ দিয়ে লিখে নাও। অংক? ওসব অংক টংক আমাদের কাছে খাটবে না। আমরা খোদ বিলিতি ফার্মের ব্রিটিশ আমলের লোক। ওসব ঘুস দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, টুকে পাশ করার কারবার এখানে নেই। মালের কোয়ালিটিতে কোন গোলমাল নেই। বাজার দর যতই কম বেশী হোক না। পারবে নিজেকে বিক্রী করতে? মানে তোমার মস্তিষ্ককে?

তাহলে গাড়ি বাড়ি সুন্দরী মেয়েমানুষ কোন কিছুর অভাব থাকবে না। তারপর যাক দেশ জাহান্নামে। আমার স্ত্রীকে আমি কি করে বিশ্বাস করাবো! এই সব কারণেই তার সংগে আমার দ্বন্দ্ব। এদের কথা হচ্ছে ধর মারো খাও। দু হাতে লুটে নাও। আর তুমি বলছ কিনা আমার মেয়ে ছেলেমানুষ, সরল? তোমাকে এক বাজার থেকে কিনে আর এক বাজারে তিন ডবল দামে বিক্রী করে দেবে। তুমি ছাড়াও ওর মা আরও দু'জন দিদিমণি রেখেছে। তার মধ্যে একজন মেম সাহেব। হ্যাঁ ঐ অংক ইংরিজিতে। তার মানে কি হল? ডবল এ্যাকশন্। P^3 ফরমুলা।

তাহলে অংক কি দাঁড়াচ্ছে?

সপ্তম	শ্রেণীতে	কন্যা	বাবদ	মাসিক	খরচ	৫০০্ টাকা
অষ্টম	,,	,,	,,	,,	,,	৭০০্ ,,
নবম	,,	,,	,,	,,	,,	৯০০্ ,,

বুঝতে পারছ? বছরে দুশো টাকা বেশী। কারণ এই দশ বছরে বাজারের প্রতিটি জিনিষের দাম বেড়েছে দুশো থেকে হাজার গুণ! মাথা পিছু আয় বেড়েছে?

দশম, একাদশ, দ্বাদশে এসে দাঁড়াচ্ছে ১৫০০্ টাকা।

তারপর যদি ডাক্তারীতে ভর্ত্তি করা হয় পনের হাজার।

পাঁচ বছর পড়া ও খাওয়া পরার খরচ বাবদ প্রায় পঁচিশ হাজার।

পাশ করিয়ে বের করে আনতে পনের হাজার।

এবার ডাকো তোমাদের ডঃ অশোক মিত্রকে —অংকটা কষে দিক,

দেশ কোথায় ?—হুগলী আরামবাগ।
রেফারেন্স ?—কম্পোজিটর দাদা।
কি, ব্যাপারটা বুঝতে পারছ ? কেন টাকার দাম চব্বিশ পয়সা ?

মি: বোসের প্রচণ্ড বিদ্রুপের হাসি আর্তনাদের মত বুকে হাহাকার তোলে প্রণবেশের।

কোন ডঃ অশোক মিত্রের ক্ষমতা নেই মানুষকে এই অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে পারে বুঝলে খোকাবাবু! অতো সোজা নয়। আমার মেয়ে তোমার ছাত্রী তোমার সংগে একটু ফান করেছে—মানে জোক। এর নাম ভারতবর্ষ উনিশো আশি।

৪

—বুঝলি পনু! এবছর যে করে হোক তোকে আমি ডাক্তারীতে ভর্তি করাবোই। কিছু ভাবিসনি। কালো—আমাদের ভগ্নিপতি হাজার টাকা দেবে বলেছে। দেশের জায়গা বাড়িটা বিক্রী করলে হাজার পাঁচেক পাওয়া যাবে। বাইরের লোককে দিতে পারলে আরও চার পাঁচ হাজার হতো কিন্তু ভদ্রাশনত শরিক ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যাবে না। আমার অফিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে হাজার খানেক পাওয়া যাবে। ওতে হবেনা বই পত্তর ? তারপর তো কাবলীওলা আছেই। তাছাড়া মিঃ বোস রয়েছেন। মি. বোস তোর খুব প্রশংসা করেন বুঝলি। উনিই বলছিলেন ওনার এক ছোট শালী আছে। বয়সটা অবশ্য একটু বেশী হয়ে গেছে। তাতে কি। ওরা বরাতি লোক। কলকাতা শহরে চরিত্র দোষ বলে কিছু নেই। সামনেই মা গংগা রয়েছেন একবার স্নান করে নিলে সর্ব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অনেক টাকা দিতে রাজি আছেন, মায় পাঁচ বছরের ডাক্তারীর সব খরচ। যদি ডাক্তারী পড়তে না চাস তাহলে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবে দরকার হলে, শুধু তুই রাজি হয়ে যা।

—না।

—না? না মানে? না মানে কিরে? এতদিন কলকাতায় থেকে তুই বলছিস না? আমি এতদিন খবরের কাগজে কাজ করে দেখছি দিনকে রাত, রাতকে দিন বানাচ্ছে শাদা কালোর হরফ আর তুই লেখাপড়া শিখে লেটার মার্কস নম্বর পেয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার টিউশনি জোগাড় করতে পারিস না আবার বলছিস না? এই না-মানে কি জানিস? পারতিস তুই তোর নিজের যোগ্যতায়, তোর বাবা পারতো তোকে কলকাতায় রেখে স্কটিশ চার্চে ভর্তি করতে? ডাক্তারী পড়াবার কথা চিন্তা করতে? এই না মানে কি জানিস? এই না মানে হচ্ছে তুই আমায় বাধ্য করছিস চলন্ত বাসের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে। তার মানে আমার রক্ত, মাংস, শ্রম সব কিছু দিয়ে নিজেকে বিক্রী করে তোকে মানুষের মত মানুষ করে গড়তে যাওয়ার অপমৃত্যু। তোর আমার মত মানুষের এদেশে দাম ক'পয়সা জানিস? চব্বিশ পয়সা। দেওয়ালে লিখে রাখ কথাটা। এই কথাটা বুঝতে তিরিশটা বছর আমার চলে গেছে। রাত পেরুলে কাল সকালে কাজ থেকে ফিরে এসে তোর জবাব চাই। তানাহলে লাথি মেরে কলকাতা শহরের বাইরে বের করে দেবো। ভেবে দেখিস।

৫

কলকাতার বুক চিরে পাতাল রেল হচ্ছে। শিয়ালদায় উড়াল পুল হচ্ছে। হুগলী নদীর বুকের ওপর হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলী সেতু। হচ্ছে লেকটাউন। ঝিলমিল। ডায়মণ্ডহারবার রোডকে প্রশস্ত করা আরও কত কাজ। তবু লোকে বলে দেশ এগুচ্ছে না।

টালা থেকে টালিগঞ্জ সুড়ংগ পথে চলবে ইলেকট্রিক ট্রেন। তখন আর লোডশেডিং থাকবেনা। দৈনিক প্রায় পঞ্চাশ লাখ মানুষ গ্রাম বাংলা থেকে নানা কাজে ছুটে আসছে কলকাতায়। এখানে জমির বর্তমান দর তাই পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা কাঠা।

এখানে একখানা একটু ভদ্রভাবে থাকার মত ঘরের ভাড়া আড়াইশো থেকে পাঁচশো, পাঁচ থেকে পনের হাজার টাকা সেলামী।

লণ্ডনে টেমসের তলা দিয়ে, জার্মানীতে রাইনের তলা দিয়ে, সারা মস্কো শহরে জালের মত ছড়িয়ে আছে মেট্রোট্রেন। এদেশে কেন হবেনা? কেন ভারত মহাকাশের সন্ধানে পারমাণবিক চুল্লি করবে না? কেন নিরাপত্তার স্বার্থে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে না? তাই গ্রামকে নয় শহরকে সাজানো হচ্ছে নব বধূর সাজে। সুন্দরীর সয়ম্বর সভায় তার মত অনভিজাতেরা একলব্যের মত মুছে যাবে আগামী দিনের রূপসী কলকাতার বুক থেকে। এই সুবিপুল দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের জন্যে দেশের কীর্তিমান ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় নেই। পানের দোকানের আয়নায় নিজের মুখটা ভাল করে দেখে নেয় প্রণবেশ। কেমন ভারি ভারি মানুষ মানুষ দেখাচ্ছে। কোথায় সেই স্বপ্ন কাজল নবারুণ তারুণ্যের কাঁচা সজীবতা তার দু চোখে? যে কোন মূল্যেই হোক তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার দাম এখনই হিসেব করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ডাক্তার হতে পারলে প্রায় লাখ খানেক টাকা। বিয়ে করলে আরও লাখ খানেক টাকা। তারপর একবার আমেরিকায় গিয়ে পড়তে পারলে শুধু ডলার, কোটি কোটি ডলার। জিমিকার্টার! রেগন। ও:! কালকের রাতটা কি দু:-স্বপ্নের রাত গেছে! পাখাটা ভয়ানক শব্দ করেছে। দাদা মি: বোসকে কথা দিয়েছে। শরৎ চাটুজ্যের 'চরিত্রহীন' রাত জেগে পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে মধ্য যুগীয় ব্যাপার, সময়ের প্রচণ্ড অপব্যয়। ভারত মহাসাগরে দিয়াগোগার্সিয়ায় কেবলই মার্কিন রণতরী ভিড়ছে। অতিকায় মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিন জাপানের উপকূল সমুদ্রে এসে বিনা প্ররোচনায় একটা জাপানী মালবাহী জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ, যুদ্ধ এবার একটা লাগবে মনে হচ্ছে। কয়েক কোটি নির্দোষ মানুষের জীবনে নেমে আসছে ভয়ংকর সেই শ্বাস রোধকারী অভিশপ্ত মৃত্যু। একমাত্র যারা

যোগ্যলোক লড়ে জিততে পারবে, তারাই বাঁচবে। মনুষ্যত্ব নামক বস্তুকে মন নামক বস্তু থেকে বাস্তুচ্যুত করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

বকুলবাগানের 'বসুভিলা'— কলকাতার অতীত ঐতিহ্য নিয়ে আর বুঝি বেশী দিন বেঁচে থাকবেনা। ভেংগে পড়বে। উঠবে হালফিলের স্কাইস্ক্রাপার। তাও ভেংগে পড়বে একদিন। এরা অনেক ভোগ করেছে, অনেক মজা লুটেছে এইবার পাতাল রেলের কবরে তলিয়ে যেতেই হবে। পথ ছেড়ে দিতে হবে গ্রামের মানুষকে। পথে পথে ঘুরে ঘুরে মার খেয়ে হেরে গিয়ে ওরা পিছু হটছেনা। একটা নতুন শক্তির বনিয়াদ তৈরী হচ্ছে। যে করেই হোক সে পথ করে নেবে। দাদাকে বাঁচাতে না হয় সে নিজেকে বিক্রী করবে।

আজ 'বসু ভিলা'কে নীরব মনে হচ্ছে কেন? বাড়িতে কেউ নেই নাকি! ছাত্রীর পরীক্ষার কথা ভেবেই সে রবিবারের কথাটা মনে রাখেনি। কলিং বেল টিপতেই জ্বলে উঠে আলো। আলো জ্বলতেই দরজা খুলে যায়। দরজা খুলতেই অভাবনীয় ভাবে মিসেস বেলা বোসের মুখোমুখি। কি মোহময়ী সুখী সুন্দর মুখ!

—আজ অফিস যান নি?

—না। আসুন। মোম নেই। মি. বোস নেই. সুকুমারীও নেই। সব দীঘায়।

আপনি?

—হ্যাঁ আমি। আমি ছাড়াও ঐ যে রয়েছে অভিজাত বংশের উত্তরাধিকার মি. বোসের প্রিয় ডেল। উচ্চ বংশ পরিচয়ে এ বাড়িতে সগৌরবে বাস করছে।

—ওটা কি ছাড়া? ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো? কি রকম লক্ লক্ করছে ওর জিবটা, কি বিশ্রী গায়ে গন্ধ।

—ভয় নেই। আসুন, বসুন।

ডেল—মানে শ্রীমান এ্যালসেসিয়ান নিজের ঘরে প্রবেশ করে কর্ত্রীর নির্দেশে। কাঁচের দরজা বন্ধ হয়। ফ্যানটা ঘুরতে সুরু করে।

প্রণবেশ তার পরিচিত চেম্বারে বসে।

— আমি তাহলে উঠি।

—সেকি ! আপনাকে আপনার দাদা কিছু বলেনি ? আপনার দাদাকে তো মি. বোস টেলিফোনে সব বলে দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় আপনি এখানে আসবেন, খাওয়া দাওয়া করবেন, রাত্রে থাকবেন।

তন্দ্রা মেশানো মদির চোখের নিবিড় আহ্বান বুঝি একেই বলে। পরিপূর্ণ এক নারীতে যা বিকশিত, উদ্বেলিত। এই প্রথম প্রণবেশ একজন পরনারীর চোখের দিকে তাকাতে অস্বোয়াস্তি বোধ করে।

এই প্রথম শহর কলকাতাকে মনে হচ্ছে বহু ছিদ্র বিশিষ্ট বিরাট এক অন্ধকার ব্যূহ। প্রবেশের পথ আছে বহু, নির্গমনের পথ নেই একটিও। এই কি সেই চোখ ধাধানো মনকে বিভ্রান্ত করা আধুনিক সভ্যতা, যা তার দাদাকে যাযাবরের মত ঘুরিয়ে সমস্ত প্রাণ শক্তি নিঃশেষ করে নিচ্ছে ? বেলা বোস সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী প্রাণোচ্ছল, প্রণবেশ তারুণের অরুণ রাগে সুদীপ্ত সপ্রতিভ। যার হারাবার কিছুই নেই তার ভয় পাবার কি আছে ? সে যে একা, কিন্তু একি দুর্ব্বার প্রবল প্রেরণা যা তাকে প্ররোচিত করছে চার-দিক থেকে।

—কি দেখছেন ?

—আপনাকে, আপনি কি দেখছেন ?

এখন প্রণবেশ প্রস্তুত।

যতখানি নির্দোষ শিশু মনে হয়েছিল—এ যে ততখানি নয়। এ যে রীতিমত শাল তরু নির্ভীক নিঃসংশয়। বেলা বোস প্রতিপক্ষ তোমার সম্মুখ সমরে প্রস্তুত। পঞ্চশরে দগ্ধ কর ঐ তরুণ যুবচিত্ত কে।

—কি ভাবছেন ?

— কিছু নাতো।

একথা আগে যদি জানতো। দাদাতো তাকে কিছুই বলেনি। এযে রীতিমত ষড়যন্ত্র। একথা আগে যদি বুঝতো ঐ নারীর কোমল অংগের আবরণে মনের অগ্নি কোণে যে এত বারুদ জমে আছে কে জানতো। কে বুঝবে ঐ নিষ্পাপ দেহ সমুদ্র ঘিরে আছে প্রেমহীন স্থুল জৈবিক প্রেরণা। কি নিদারুন দুঃসহ দিন তিনি যাপন করে চলেছেন।

—কি হলো?

—কিছু নাতো!

—নিশ্চয় কিছু ভাবছেন, বলবেন না।

—তেমন কিছু নয়।

—আপনার তো ভাবার মত তেমন কিছু অস্থবিধে থাকার কথা নয়। আপনার দাদার সংগে মি· বোসের সব কথাবার্তাই তো ঠিক হয়ে গেছে। এখন থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন। পড়াশোনা খুব ভাল ভাবে করতেই হবে বুঝলেন। তা নাহলে সারা জীবন পরের গোলামী করে যেতে হবে। ঠকতে হবে। এই দেখুন না আমাদের সব কিছুই আছে আবার কিছুই নেই বেহুলার বাসর ঘর আর কি? কি হলো?

— হ্যাঁ ঠিক তাই।

—কি ঠিক তাই। আমি বলে চলেছি আর আপনি তাকিয়ে আছেন যিশুর ফটোর দিকে। আচ্ছা লাজুক লোকতো আপনি।

মিসেস্ বোসের দিকে তাকাতে কেমন ভয় সংকোচ। দাদার কথা ভেবে মনটা ভীষণ খারাপ। সারারাত জেগে দাদা ছাপাখানায় কাজ করে। সারা রাতের কঠিন পরিশ্রমের পর সামান্য মজুরীর জোরে ওরা কিনে নিয়েছে তার জীবন সত্ত্ব।

সারাদিন ধরে কলকাতা শহরের অভিজাত রথি, মহারথিদের দোরে দোরে ধর্ণা দেয়, স্বপ্ন দেখে ভাইকে ডাক্তারী পড়াবার। এ অসহ্য অপমানের শোধ নেবার জন্যে টগবগিয়ে ফুটে উঠে তার ই টিউশনিটা ছাড়তে হবে। কলকাতা ছাড়তে হবে।

—শুনলাম কি একটা অংক নাকি আপনি পারেননি ?

—কে বললে ?

—মোম বলছিল।

—সে কি !

—ভাবছি ওকে দার্জিলিংএ পাঠিয়ে দেব। এখানে এই বাপের পাল্লায় পড়ে ফুলের মত সুন্দর একটা জীবন স্রেফ নষ্ট হয়ে যাবে!

—সেকি !

প্রায় আঁতকে ওঠার মত শোনায় প্রণবেশের কণ্ঠস্বর। চমকে যান মিসেস বেলা বোস।

—আপনার কাছে এখন লজ্জা পাওয়ার কোন মানেই হয় না। আপনাকে নাম ধরে ডাকতে চাই। আপনার নামটিও ভারি সুন্দর।

—ডাকুন না। সুন্দর আর কি! দাদা তো পনু বলে ডাকে। আমি আপনার ছোট ভায়ের মত।

—প্লিজ! না, না। আমি কারু দিদি বা বৌদি হতে চাই না। ওসব ভীষণ সেকেলে ব্যাপার। আপনাকে যদি একবার নূ-ইয়র্ক ঘুরিয়ে আনা যেত ওখানে everything is তুমি। তুমি কথাটা ভারি মিষ্টি না প্রণবেশ? জান মেয়েটাকে দার্জিলিং কনভেণ্টে দিতে চাই। আমার জীবনে তো কিছু হলো না। কষ্ট হবে, তবে মেয়েটার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হবে না। তাছাড়া আমিও ফ্রি। জান, কলকাতা বড় ডাইনী শহর। এখানে লোভ লালসা তোমায় এমন পেছু টেনে ধরবে না—অল্প বয়সে বিয়ে জিনিষটা মোটেই ভাল নয়, এটা একটা ব্ল্যাকমেলিং।

—আচ্ছা প্রণবেশ বলো না প্লিজ আমি কি খুব মুটিয়ে গেছি?

—না, না।

—তোমার ভাল লাগে? আমার এখন thirtyeight, twentysix, thirty eight. রাইট proportion কি বলো?

নিশ্চয়।

আমার এখন বয়স কত বলতো?

—চব্বিশ ?

—দূর পাগল।

—আটাশ ?

—যাঃ।

—তিরিশ ?

—হল না।

—তাহলে পয়তাল্লিশ ?

—পয়তাল্লিশ হলে তো চাকরীই নষ্ট করে দেবে বস্।

—তাহলে কত ?

—বলবো না।

—কেন ?

—বলতে নেই। তুমি বড্ড ছেলে মানুষ। আমার বোনের পাল্লায় পড়লে তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে—

—এই ব্যাপারটা যদি আপনি আমার দাদাকে আর মি. বোসকে বুঝিয়ে দয়া করে ষ্টপ করাতে পারেন। জানেন, এই অল্প বয়সে আমার বিয়ে করার এতটুকু ইচ্ছে নেই। দাদা জোর করে—

—তাতে আমার ইণ্টারেষ্ট ?

—আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো। আপনি তো Indian Air Lines এ আছেন ইচ্ছে করলে আপনি আমায় রোম বার্লিন আমেরিকা প্যারিস পাঠিয়ে দিতে পারেন। তারপর আপনি যা বলবেন—কেউ জানতে পারবে না। আমি কথা দিচ্ছি। আমাকে বাঁচান।

—আমায় কি রকম দেখতে তো বললে না ?

—খুব ভাল। একেবারে ফ্লিম একট্রেসদের মত।

—আমার বোনের চেয়ে সুন্দর ?

—ভীষণ সুন্দর।

—রিয়েলি ?

—বিশ্বাস করুন। On God shake বলছি।

—একটু ড্রিংক করবে?

—ক্যাম্পাকোলা? ও খেলে আমার ভীষণ মাথা ধরে, বমি বমি পায়। মানে অন্য একদিন।

—সত্যি তুমি প্রণবেশ ভীষণ ভালো ছেলে। আমি একটু ড্রিংক করি অ্যাঁ। এসো, বসো এখানে। আরে না না, তোমায় ড্রিংক করতে হবে না। সত্যি প্রণবেশ I like you very much, believe me.

—আপনি কথা দিচ্ছেন বলুন?

—কথা দেওয়ার লিবার্টি আমার যে নেই প্রণবেশ। তুমি তো জান না মি· বোসের নির্দেশেই আমায় চলতে হয়। জান, আজকের এই ব্যাপারটা একটা ফাঁদ। তোমার মত নিষ্পাপ একজন তরুনকে ফাঁদ পেতে ধরবার জন্যে ওরা আমায় ব্যবহার করেছে। এর আগেও করেছে; ভবিষ্যতেও করবে।

—তার মানে?

—তার মানে—কলিং বেল বেজে উঠে।—কে? এক মিনিট প্রণবেশ।

—টেলিফোনে তো আপনাকে বলে দেওয়া হয়েছিল।

—তা হয়েছিল। টেলিফোনের পরে আজই বিকেলে ঘণ্টাখানেক আগে পেয়েছি এই টেলিগ্রাম।

—এখন আমার বাড়িতে তো মেল মেম্বার কেউ নেই। কি করি?

—টেলিফোন করলে নিশ্চয় কেউ এসে যাবে?

—What! কি ব্যাপার বলুন তো?

—আমাদের মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

—সে কি!

—আয় পনু! নমস্কার।

দু জনে পথে নামে।

দুই ভাই বহুদিন পর পাশাপাশি পথ হাঁটে।

কেউ কোন কথা বলে না।

—দাদা?

—বল!

—দাদা। আমাদের মা আর কবার মারা যাবে? দাদা! তুমি মায়ের নামে এই মিথ্যে কথা কেন বলতে গেলে?

—যে নেই তার নামে মিথ্যে বললে দোষ হয় না রে। কিন্তু যে বেঁচে আছে, যার বেঁচে থাকার ওপর নির্ভর করছে আমাদের মান মর্য্যাদা, দেশের ভবিষ্যৎ। জেনে শুনে তিলে তিলে তাকে অপমৃত্যুর পংকিল অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া মহাপাপ বুঝিলি না?

দুঃশাসন

মুখ ফেরাও কলকাতা বন্দরের দিকে।

অনেক অনেক দিন অপেক্ষার পর এস, ভি, এ্যাডভেঞ্চারের ক্যাপ্টেন পাকিজার কাছে ওয়ারলেশে ম্যাসেজ এসেছে।

লাইট হাউস সাণ্ডহেড থেকে এ্যাড্‌ভেঞ্চারকে বন্দরে ফিরিয়ে আনো। নির্দ্দেশ এসেছে খোদ ডি. এম. ডি. অফিস থেকে।

বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে শীতের সময় হলেও একটা প্রচণ্ড নিম্ন চাপের সৃষ্টি হচ্ছে আজ কদিন ধরে। ক্যাপ্টেন পাকিজার ওপর ডেক ইঞ্জিনরুম মিলিয়ে জাহাজের নস্কর, সুখানী, ট্যাণ্ডেল, সারেং, ইলেকট্রিসিয়ান, টেকনিসিয়ান সবাই খুবই বিরক্ত। পনের দিন ট্রিপের নাম করে বন্দর থেকে জাহাজকে সেল করানো হয়েছিল। আজ প্রায় একমাস হয়ে গেল তাদের বন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। নাবিকেরা সবাই প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ঘরে ফেরার জন্যে। ক দিন আর ভাল লাগে অথৈ দরিয়ার বুকে অহেতুক ভেসে বেড়াতে। জল মাপার কাজ যখন শেষ হয়েগেছে তখন অযথা কি উদ্দেশ্যে বে-অব বেঙ্গলের মুখে স্যাণ্ডহেডে জাহাজকে আটকে রাখা হয়েছে! পাইলট ভেসেলের জায়গায় তাকে ষ্টাণ্ডবাই আটকে রাখা হয়েছে! এটা কোন কৈফিয়ৎ নয়—এটা বেআইনী। তাছাড়া ইঞ্জিনের অবস্থাও ভাল নয়। একটা জেনারেটর সম্পূর্ণব্রেক-ডাউন। তিনটে মটোর বোটের দুটোই অকোজো. একটা ফ্রেস ওয়াটার প্যাম্প বিকল. রেশনের স্টক ফুরিয়ে আসছে। কোন্ আইনে আছে রিলিফের লোককে জোর করে আটকে রাখা। ট্রিপের সময় সীমা ছাড়িয়ে জাহাজ দরিয়ায় আটকে রাখা? বই পড়ে মাছ ধরে, তাস খেলে, জুয়া খেলে মাল খেয়ে কদিনই বা দরিয়ার বুকে কাটানো যায়। রেডিও অফিসার বলছে যে কোন

সময় তুফান উঠতে পারে, হতে পারে সামুদ্রিক ঝড়, টাইফুন। ভয় পাওয়ার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে যা ক্যাপ্টেন সাহেব চেপে যাচ্ছে। সবাই ফুসছে, চটছে, হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে রাগ ঝাগড়া, হচ্ছে সারেংয়ের সঙ্গে তর্কা-তর্কী। কিন্তু কেউ সাহস করে ক্যাপ্টেনের সামনে মুখ খুলতে পাচ্ছে না। জাহাজের ক্যাপ্টেন, বড় মালুম, ছোট মালুম, চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার সবাই ঘনঘন মিটিংয়ে বসছে, ম্যাপ দেখছে, রেডিও অফিসার ঘন-ঘন ম্যাসেজ রিসিভ করছে, ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে। কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু কোন কথাই তাদের জানানো হচ্ছে না। নিয়ম নেই, বলা যায় প্রশ্ন করার অধিকারও নেই। দরিয়ার বুকে ক্যাপ্টেনই সব।

লস্কর থেকে সারেং সবাই ঘিরে ধরে সেকেণ্ড সুখানী বলরামকে-কি ব্যাপার তুমি মুখ খুলছ না যে ওস্তাদ ?

বলরাম রুকে উঠে, তোমরা কি শালা ভেড়ী আছ। যাও না, ধর ক্যাপ্টেনকে। মায়ের দুধ খেয়েছ না বাপের বাট চুযে মানুষ হয়েছ ?

—তুমি মাইরী ভয়নক চটে যাও, সারেং হেসে বলে।

—তুমি শালা একনম্বরের গরুচোর। ক্যাপ্টেনকে মশকা পালিশ দেবার সময় তুমি, ফয়দা লোটবার সময় তুমি, লোকের নামে চুকলী করবার সময় তুমি আর লড়বার সময় আমি, না। শালা বুড়ি খানকী।

—ঠিক, ঠিক বলেছ ওস্তাদ। দোব শালাকে পাণিতে আড়িয়া করে, হারামী কাঁহাকা। রুকে উঠে অনেকেই।

—এই এই কি হচ্ছে এসব অসভ্য কথা। সারেং ভয় পেয়ে যায়। ঠিক এই রকম সময় - নির্দ্দেশ এলো ডি. এম. ডি. অফিস থেকে এ্যাডভেঞ্চারের মুখ ফেরাও বন্দরের দিকে।

ঠিক এই রকম সময় বলরাম চিৎকার করে ওঠে-- সামাল।

সারেং ঘন্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেয়—টার্নটু-টার্নটু-টার্নটুরে তার মানে ইঞ্জিন রুমে ফিরে যাও।

—কি হলো ওস্তাদ। যুধিষ্ঠির বলরামের পাশে এসে দাঁড়ায় উদভ্রান্তের মত বলরাম ডেকের রেলিং ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে, বাতাসে কি যেন বার বার শুকছে। কোন কথার জবাব দেয় না।

অন্ধকার হয়ে আসে আকাশ। এলো পাতাড়ি ধাক্কা মারা বাতাস আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের জলে। আর্ত কান্নার মত দূর থেকে ভেসে আসছে হয়তো কোন বিপন্ন মালবাহী জাহাজের ভেঁপু।

ক্যাপ্টেন পাকিজা জাহাজের রেডিও অফিসার মারফৎ হুগলী পয়েন্ট ওয়্যারলেশ ষ্টেশনে ম্যাসেজ পাঠায়। একটি মালবাহী জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েছে, তার প্রপেলার ভেংগে জলে পড়ে গেছে। র‍্যাডার মানে স্থখানও ভালো কাজ করছে না। তাদের জাহাজ থেকে খুব কাতরভাবে রেডিও ওয়্যারলেশ মারফৎ কাছাকাছির জাহাজে আবেদন জানানো হচ্ছে বাঁচাও। সেভ আওয়ার শোল।

প্রচণ্ড গাঢ়গভীর কুয়াশা আর অন্ধকারে সমুদ্রের মধ্যে কোন কিছুই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

এ্যাডভেঞ্চার ছাড়াও, আই. এন. এস. ব্রহ্মপুত্র, এস. ভি. নদীয়া আর. ভি. অনুসন্ধানী অনুসন্ধান কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সবাই মিলে তল্লাস চালিয়েছে। হেভি পাওয়ারের সার্চলাইট বিভিন্ন দিক থেকে একযোগে আলো ফেলছে। লাইটিং ভেসেল, ক্যাণ্ডেল ফ্লেমের তীব্র গ্যাসের আলো যা নাকি তিনমাইল চক্রাকারে কেবলই ঘুরে চলেছে। সমুদ্রগামী জাহাজকে দিকভ্রান্ত জাহাজ-কে আলো মারফৎ পথ দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড গাঢ় গভীর কুয়াশায় সেই আলোও নিঃস্প্রভ।

এই মুহূর্তে কোন বিবাদ নেই। বিপদের মুখে সবাই এখন এক পরিবারের লোক। জীবন সমুদ্রে প্রচণ্ড সংগ্রাম যেখানে অনিবার্য সেখানে সহজেই ভেংগে যায় বিভেদের দেওয়াল।

এ্য.ডভেঞ্চারের ক্যাপ্টেন থেকে আরম্ভ করে একজন সাধারণ লস্কর পর্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে সবাই প্রস্তুত হয়ে নেয়।

ক্যাপ্টেন ব্রিজ থেকে টেলিগ্রাফে ইঞ্জিনরুমকে নির্দ্দেশ দেওয়া হলো টপ গিয়ারে ইঞ্জিন চালাও। ক্যাপ্টেনের নির্দ্দেশ মত যে যার জায়গায় তৈরী।

এহেডে জাহাজ, পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। ক্যাপ্টেন ব্রিজে কমাণ্ডার পাকিজা, চিফ অফিসার অর্জুন সিং গভীর মনোযোগে ঝুঁকে পড়েছে ম্যাপ আর কম্পাসের ওপর। রেডিও অফিসার দত্ত খট খট শব্দে কেবলই ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে আর রিসিভ করছে।

সমুদ্রের গর্জন আর উত্তাল পাতাল ঢেউয়ের ওপর গোটা জাহাজটাই মাঝে মাঝে তলিয়ে যাচ্ছে, লাইফ জ্যাকেট বেঁধে যে যার জায়গায় তৈরী। টপ গিয়ারে ইঞ্জিন চালু রেখেও এক ইঞ্চি এগুনো যাচ্ছে না। যে কোন মুহূর্তে গোটা জাহাজটাই একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ের বাড়িতে তলিয়ে যেতে পারে গভীর সমুদ্রে। এই আধঘন্টা আগেও শীতের গাঢ় কুয়াশার মধ্যে সমুদ্র ছিল শান্ত নিশ্চল। সবাই ভাবছিল ঘরে ফেরার কথা। আর এখন প্রত্যেকেই নিজেদের বিপন্ন অস্তিত্বের সামনে এক একজন জল দানব। ভুলে-গেছে ওরা ঘরের কথা, চাকরীর ঝগড়ার কথা, পরস্পরের প্রতি অভি-যোগের কথা। দাঁতে দাঁত চেপে স্থখান ধরে আছে সেকেণ্ড স্থখানী বলরাম। গায়ে এখন তার দশ ঘোড়ার হিম্মত। বিরাট বিরাট কুণ্ডলী পাকানো প্রবল গতিশীল জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ছে ক্যাপ্টেন ব্রিজের ওপর। পোড় খাওয়া ক্যাপ্টেন পাকিজাও সমুদ্রের ঐ ভয়ংকর উত্তাল পাতাল ঢেউয়ের মুখে বমি করে ভাস্‌ছে। জাহাজের আগিল গোঁত খেয়ে নীচুর দিকে নেবে গেলে পেছনের পপেলার জলথেকে ওপরে উঠে সাঁই সাঁই করে ঘুরছে। একএক সময় সেই উন্মাদ জল দানব গোটা জাহাজটাকে ঝাঁকিয়ে ওপরে তুলে ধরে ছুঁড়ে আছড়ে ফেলছে বিশ তিরিশ ফুট নিচে। তার ওপর

শীতের বাতাস একশো কুড়ি কিলো মিটার গতিতে হাঁড়-পাঁজরা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যেকের মুখের চেহারায় একটা নিষ্ঠুর জলদস্যুর ছাপ। ডেকের লস্কর যুধিষ্ঠিরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো ঢেউয়ের একটা বাড়িতে ছিটকে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। আবার হয়তো আরএকটা ঢেউয়ের পালটা বাড়িতে ছিটকে এসে পড়বে ডেকের ওপর। একজন এসে সারেংকে খবর দিলে, সে বাতরুমে ঢুকে অনর্গল বমি করছে, কাঁদছে, বুক চাপড়াচ্ছে, আর কি সব বিড় বিড় করে বকছে। তার চোখ দুটো ভয়ে দিশাহারা হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কেউ তার সামনে যেতে সাহস করছে না। কেউ তাকে সামলাতে পাচ্ছে না। ছেলেটা নির্ঘাত মরবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো চলবে এই ভয়ংকর বিপর্যয়। দিনরাত্রি ঘন কুয়াশার মধ্যে আর প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস মিশে একাকার হয়ে যায়। বিপুল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে বিপন্ন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চলবে কঠিনতম সংগ্রাম। উত্তাল সমুদ্রের ভয়ালরূপ দেখে ভয়ে পাগল হয়ে গেছে ছেলেটা। টক, ঝাল; সমুদ্রের নোনাজল, বমির ট্যাবলেট কোন কিছুতেই ওর বমি বন্ধ হচ্ছে না। এরপরে হবে রক্ত বমি। সবাই যে যার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে। যুধিষ্ঠিরের মত যারা নতুন তারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আর নয়, জাহাজ একবার কিনারায় ভিড়্‌লেই স্রেফ পালিয়ে যাবে। আর কোন দিন খেতে না পেয়ে মরে গেলেও জাহাজের চাকরীতে নাম লেখাবে না। সারেং দৌড়ে উঠে আসে ক্যাপ্টেন ব্রিজে। "কাপ্তানসাব। আমাদের পোর্ট সাইডের গ্যাংওয়ে ভেংগে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।'

— ড্যাম ইট। স্টার্বোর্ট সাইড সবঠিক হ্যায় ?

—সব ঠিক হ্যায়, বড় সাব।

—সারেং, মটোর বোর্ট রেডি করো। চিফ ?

—ইয়েস স্যার।

—you hold the সুখান।

—O'K স্যার।

—বলরাম। Come hurry.

—সেলাম বড় সাব।

—বলরাম। যাও ও ছোকরাকো আচ্ছা সে বানাও। লে যাও উসকো তুমহারা সাথ মটোর বোর্ট মে।

—বড় সাব—

—I say Captain's order. Under stand. Go hurry.

রেডিও অফিসার। ওসাকা মারু। ক্যাপ্টেন Speaking,

ওয়ারলেসের মাউথপিসে মুখ রেখে ক্যাপ্টেন পাকিজা ওসাকা মারুর সংগে যোগাযোগের আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়।

সারেং আর সেকেণ্ড সুখানী বলরাম দুজনেই এক এক লাফে ক্যাপ্টেন ব্রিজ থেকে দুরন্ত গতিতে নেবে আসে লোয়ার ডেকে। এতক্ষণে মনে হচ্ছে এ্যাডভেঞ্চার অনেক খানি কাছাকাছি এসে পড়েছে জাপানী মালবাহী জাহাজ ওসাকামারুর।

ঝড়ের দাপট কমলেও সমুদ্র এখনও ভীষণ উত্তাল। এ্যাডভেঞ্চার নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে ওসাকা মারুর ওপর নজর রাখছে। গভীর রাত্রিতে কনকনে হিমেল সামুদ্রিক বাতাস আর ঘন-কুয়াশা উপেক্ষা করে 'ওসাকামারুর' বিপন্ন নাবিকেরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে ডেকে।

এই অবস্থায় মটোর বোর্ট জলে নাবানো এবং ওসাকামারুর কাছাকাছি যাওয়া ভয়ংকর বিপজ্জনক। বন্দর কর্মী হিসেবে নিজেদের সমুদ্র এলাকার মধ্যে বিপন্ন বিদেশী জাহাজের নাবিক-দের কথা ভাবলে এক মুহূর্ত দেরী করা চলে না। তাছাড়া ক্যাপ্টেন সাহেবের নির্দেশ।

হ্যাংয়ার থেকে মটোর বোর্ট আড়িয়া করা হচ্ছে।

কাপ্তান সাহাবের হুকুম আমার কিছু করার নেই। সারেং যুধিষ্টির-কে জানিয়ে দেয়।

—মানিনা কাপ্তান সাহেবের হুকুম। করুক চার্জসীট, সাসপেণ্ড,

ছেড়ে দেবো শালার চাকরী। মরিয়া হয়ে চিৎকার করছে যুধিষ্টির। সময় হাতে বেশী নেই। দেরী করা যাবে না। ওর ইঞ্জিন ঠিক সময়ে স্টার্ট করতে না পারলে উত্তাল ঢেউয়ের এক ধাক্কায় এখুনি কোথায় তলিয়ে যাবে। এই সময় একটা দাবাই আছে। বলরাম এগিয়ে যায় যুধিষ্টিরের দিকে, বা হাত দিয়ে চেপে ধরে ওর গলা, ঝাঁপিয়ে পড়ে ডান হাতে মারে এক ঝাপ্পোড়। বাঁচাতেই হবে ওকে।

—শালা শুয়ার কি বাচ্ছা। পকড় রসি। বোট পর উতার। পকড় হিভিং লাইন। হতচকিত উদভ্রান্ত যুধিষ্টিরের নাক দিয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসে তাজা রক্ত।

—ওস্তাদ। তুমি আমায় মারলে! মেরে ফেলো। আমি কখনই মটোর বোটে নাববো না।

—আবে তোর বাপ নাববে। বলেই আবার হাত চালায়।

রুকে যায় যুধিষ্টির, ঠিক আছে। চলো কিনারায়। মোলাকাৎ হবে তোমার সংগে। আমার নাম যুধিষ্ঠির মান্না। চাকু দিয়ে তোমাকে না হাসিয়েছি তো—

দুজনেই একযোগে ঝাঁপিয়ে নাবে মটোর বোটে।

আবে পহলে কাম পাকড়। পিছে রুস্তমী! জেনানা কা বাচ্ছা। একৃসিলেটর ফুল করে টপ গিয়ারে ইঞ্জিন রেখে প্রচণ্ড-গতিতে মটোর বোট ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে। বলরামের এই সব ক্ষেত্রে চারটে চোখ। মন তার হাইস্পীড ইঞ্জিনের চেয়েও গতি সম্পন্ন।

অন্ধকার ঘন কুয়াশা আর ঢেউয়ের দোলায় দোল খেয়ে ছোট্ট মটোরবোট ওসাকামারুর দিকে এগিয়ে চলে। হাতে টর্চ নিয়ে কমাণ্ডার পাকিজা হুরের ওসাকামারু জাহাজের উদ্দেশে সংকেত পাঠায়। ওয়্যারলেসে জানানো হয় মটোরবোট যাচ্ছে, সারেং ও অন্যান্য লস্করেরা হতবাক বিস্ময়ে অন্ধকারের মধ্যে মটোর বোটের ক্ষীণ শব্দ শোনার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের চোখে মুখে

মৃত্যু কালিন উদ্বেগ স্পষ্ট ছাপ রেখে যায়। সবাই মনে মনে ভাবে ভালোয় ভালোয় ওরা ফিরে এলেই ভালো।

বলরাম যুধিষ্ঠির দুজনেই চুপচাপ। দুজনেরই চোখ জ্বলে মৃত্যুহীন দানবিক প্রেরণায়। প্রতি মূহূর্তে মৃত্যুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে ওসাকামারুর দিকে। ওরা ভুলে গেছে ওদের আলাদা অস্তিত্বের কথা। নাকে হাত দিয়ে টের পায় নিজের রক্তের স্বাদ। সমুদ্রের নোনা জল দিয়ে ধুয়ে নেয় মুখটা। প্রচণ্ড আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে। সে ভুলে গেছে তার পেটের যন্ত্রনার কথা, বমির কথা। যুধিষ্ঠির একবার ভাবে এইবার যদি সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলরামের ওপর কেমন হয়? এখন দুজনেই ওরা সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে। কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না। বদলা নেবে সে। তার গায়ে হাত! তুমি শালা দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলা মুল্লুকে এসে রং লিয়ে যাবে।

—খবরদার, সামাল। চেঁচিয়ে উঠে বলরাম।

সামনেই একটা বিরাট কুণ্ডলী পাকানো ঢেউ দেখে যুধিষ্ঠির কি করবে ভেবে পায় না। বলরাম এক ঝটকায় ওকে নিজের বুকে চেপে ধরে ঢেউটা তাদের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। একপেট জল খেয়ে ফেলে যুধিষ্ঠির।

—কি বে ভাবছিলি এ দুষমনটাকে একধাক্কায় জলে ফেলবি! বদলা নিবি? হেসে উঠে বলরাম। তাকে প্রচণ্ড প্রফুল্ল দেখায়। জাহাজ থেকে অনেকদূরে চলে এসেছে ওরা প্রায় ওসাকামারুর কাছাকাছি।

তোকে জানে বাঁচিয়ে দিলুম আর তুই শালা আমাকেই পাণিতে আড়িয়া করার কথা ভাবছিস! খবরদার। রসি পাকড়। জাপানী জাহাজ থেকে ওদের লক্ষ্য করে রসি ছুড়ছে নাবিকেরা। ঝুঁকে পড়ে জল থেকে দড়ি টেনে তুলছে যুধিষ্ঠির। বলরাম ওর কোমরটা পাঁজিয়ে ধরে আছে। রসি মটোরবোটের খুটে

গলিয়ে ফাঁস লাগাতেই মটোর বোটের মুখ ঘুরিয়ে দেয় বলরাম।

ঝড়ের দাপট কমে গেছে ফুঁসছে সমুদ্র। মনে মনে গজ-রাচ্ছে যুধিষ্ঠির। মুখে কোন কথা বলছে না। একবার সে ঝুঁকি নিয়েছিল বলরামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। বলরাম না ধরলে ঐ দৈত্যাকার ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে সে হয়তো এতক্ষণে মটোর বোট থেকে ছিটকে কোথায় তলিয়ে যেত। এ যাত্রায় বলরাম তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই লোকটাকেই সে জলে আড়িয়া করতে চাইছিল। ওরা এখন ফিরে চলেছে জাহাজের দিকে! দুটো জাহাজের দূরত্ব অনেকটা কমে এসেছে। ওপাশ থেকে ওসাকা-মারুকে বেঁধে ফেলেছে এস, ভি, নদীয়া, এপাশ থেকে এস, ভি এ্যাডভেঞ্চার।

ক্যাপ্টেন পাকিজা খুব খুসি। অবধারিত জাহাজ ডুবির হাত থেকে তার নেতৃত্বে ওসাকামারুকে নিরাপদে বন্দরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

পরদিন ওসাকামারুর ক্যাপ্‌টেন্‌, এস, ভি, এ্যাডভেঞ্চারের ক্যাপ্‌টেন্‌ ও অন্যান্য নাবিকদের এক পার্টিতে আহ্বান করে। পেটি পেটি মদ, মুরগী. কেক, কমলা, চিজ, কাজু আসে। জাহাজে পান ভোজনের বান ডেকে যায়। যুধিষ্ঠির একপাশে গোজ হয়ে বসেছিল। বলরাম নিজেই ওর কাছে এগিয়ে আসে। তার গর্ব সে তার একজন সহকর্মীকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে নিজে হাতে রক্ষা করেছে। হেসে পিট চাপড়ে একটা পুরো রামের বোতল নিজে হাতে যুধিষ্ঠিরের দিকে এগিয়ে দেয়।

—কা বে রংবাজ! লে বেটা পিও।

—আমি মাল খাই না।

—শালা জাহাজী মাল খায় না বললে গাড়ে লাথি মেরে জাহাজ থেকে নাবিয়ে দেবে। গোসা! গোসা হইছে।

এইবার বলরাম সকলের সামনেই নিজের প্যান্টের পকেট

থেকে একটা ধারালো জাপানী স্প্রিং চাকু বের করে এগিয়ে দেয় যুধিষ্ঠিরের দিকে। লে তুইতো বলেছিলি কিনারায় গেলে আমায় চাকু দিয়ে হাসাবি। লে লে চালিয়ে দে। লেকিন এক বাত! তেরা মা কা কসম! আমার বিবি আর একটা বাচ্ছা আছে ও ত্নটোকে সামলাস।

—ওস্তাদ আমায় মাপ করো। তুমি না থাকলে আমি সেদিন বমি করতে করতে—পাগল হয়ে গেছিলুম।

—তাহলে মানছিস, আমি তোর দুষমন নয়?

—এই গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে বলছি।

সেই ভয়ংকর সামুদ্রিক ঝড়ের রাতের অভিজ্ঞতার কথা কোন দিন ভুলতে পারবে না যুধিষ্ঠির।

কে. পি. ডি'র ডক বেসিনে এ্যাডভেঞ্চারকে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রায় তিন বছর বাদে সার্ভে বসছে। ড্রাইডক হবে জাহাজ। বলরাম আজও সেকেণ্ড সুখানী। শিল্প নগরী কলকাতায় এসেছিল সে রুটির সন্ধানে। এই বাংলার জলহাওয়ায় বন্দরের চাকরী জীবনে কেটে গেছে তার অনেকগুলো বছর। সে সব দিনের কথা সে কি এত সহজে ভুলে যেতে পারে। কবে সেই বচপনে সে দক্ষিণ ভারত ছেড়ে এসেছে।

ভাণ্ডারী থেকে লস্কর, লস্কর থেকে সেকেণ্ড সুখানী। কাম কাজ ছাড়া জীবনে বোঝেনা কিছুই। দারু, রেণ্ডীর ধার ধারে না। জুয়া, সাট্টা, সুদীকারবারের মধ্যে সে নেই। সে কেবল কিতাব পড়ে। অনেক চেষ্টায় সে বাংলা শিখেছে। নিজের মাতৃভাষার অক্ষরের সংগে তার পরিচয় নেই। সাদি করেছে বাংগালী মেয়ে। বাংলা শিখে সে বাংলা কেতাব পড়ে। কেতাব পড়েই নাকি তার দেমাক বিগড়ে গেছে। একজন পাক্কা জাহাজীর এ নেশা বহুৎ খারাব। সহজে কেউ উল্টো সিধে বোঝাতে পারে না। অন্যায় সে সহ্য করতে পারে না। ক্যাপ্‌টেন্‌, অফিসার পেঁদিয়ে কয়েকবার তার চার্জসিট, সাসপেনসন্‌ হয়ে গেছে। ওর সার্ভিস্‌ বই ভর্ত্তি অনেক রিপোর্ট।

ডক বেসিনে জাহাজ বেঁধে ক্যাপ্টেন থেকে লস্কর যে যার সব বাড়ি কেটে পড়ে। থাকে শুধু সেকেণ্ড সুখানী, দু একজন লস্কর, রাতের ভাণ্ডারী। সেকেণ্ড সুখানী বলরামের আজ সিপকিপিং ডিউটি। সংগে একটা কেতাব এনেছে। সারারাত জেগে জাহাজ পাহারাদারীর কাজে ঘুমলে চলে। তাছাড়া মচ্ছড়ের কামড়ে ঘুমও আসে না।

শীতের মরশুম। সুখা মরশুম।

এই সময়টায় গংগা কেমন মড়ার মত নিষ্প্রাণ। আজ আর দরিয়ার বুকে সেই ঢেউ নেই। গংগা কেবলই মজে আসছে। আলমবাজার পর্যন্ত চড়া পড়েছে। হাওড়া ব্রিজের কোল থেকে প্রায় বাবুঘাট পর্যন্ত কলকাতা জেটিতে আজ আর মালবাহী জাহাজ ভেড়ে না। দশ বারো হাজার টন কারগো নিয়ে জাহাজ আজকাল আর কলকাতা বন্দরে আসছে না। বন্দরের পর পর কয়েকটা ড্রেজিং জাহাজ ও লঞ্চকে বিক্রী করা হয়েছে। তার বদলে এসেছে নতুন নতুন ডিজেল জাহাজ, টাগ। কিছু ইস্টিমের লোক ডিজেলে গেছে বটে সার্ভিসে জুনিয়র হয়ে গেছে। নতুন নতুন অনেক অফিসার এসেছে। অনভিজ্ঞ অফিসার। অনেক অভিজ্ঞ ভাল অফিসার বেশী টাকা মাইনের চাকরীতে পোর্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানী অথবা বিদেশের বন্দরে কাজ নিয়ে। পোর্ট শিল্পে দক্ষ কারিগর অফিসারের সংখ্যা দুচার বছর বাদে খুবই কমে যাবে। চারিদিকে লোক সারপ্লাস। সব রিক্রুটমেণ্ট বন্ধ, প্রমোশন বন্ধ। এই বন্দরকে, এসিয়ার মধ্যে এমন একটি শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী সুরক্ষিত বন্দরকে, চক্রান্ত করে সেকেণ্ড পোর্ট করে দেওয়া হবে। এখন-ইতো কলকাতাকে হলদিয়ার থেকে আলাদা করে দেবার কথা বার্তা চলছে। ফারাক্কা থেকে যদি একলক্ষ কিউ সেক্ জল এই ভাগিরথীর বুকে বইয়ে দেওয়া না যায়। যদি না নদীর নাব্যতা গভীর হয় বাঁচবে না এই বন্দর। জলই প্রাণ সেই জল যদি জাহাজ চলাচলের উপযোগী না হয়—তাহলে কি গংগার বুকে শুকা মরশুমে

ফুটবল খেলা হবে? সারা বন্দর গাঁওয়ে ডকের মধ্যে কেমন একটা থমথমে ভাব। মনে হয় কাম কাজ কেমন সব বন্ধ হয়ে আসছে। চারিদিকে পায়রার ভিড়, কুকুরের ভিড়। জেটির পাশে বিরাট লম্বা সারি বন্ধ গোডাউনগুলো কেমন ফাঁকা, অন্ধকার। ক্রেনগুলো অকেজো চুপ চাপ দাঁড়িয়ে। চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে তৈরী সাইলোপ্ল্যান্ট। চারিদিকে নোংরার স্তুপ। গোডাউনের দেওয়াল ভাংগা, পাঁচিল ভাংগা তালা খোলা, অনেক পাম্প অকেজো, অনেক রেল লাইন জংগলে বুজে গেছে, অনেক ওয়াগন ভেংগে চুরে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে লোহাকাঠ স্তুপাকার। ঝুপড়ি গাছ তলায় অলস কাজের ফাঁকে চলেছে জুয়া, তিন তাস। এখানে ওখানে নানান গুঞ্জন। কোথাও নেই কোন প্রাণের উত্তাপ, কাজের জোয়ার। ওপর থেকে তলা পর্যন্ত মানুষ কেবলই আসছে আর যাচ্ছে। সমস্ত চেতনা এখানে অবরুদ্ধ। গংগার দিকে তাকালে বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠে বলরামের। এই গংগার সঙ্গে তার কত দিনের পরিচয়। এই গংগা তার প্রাণ। তারাতো জলের পোকা। সেই জলই যদি শুকিয়ে যায়। অথৈ দরিয়ায় বুকে যদি জেগে উঠে চড়া। তাহলে তারাও তো বাল-বাচ্ছা নিয়ে বেঘোরে শুকিয়ে মরবে। স্রোত নেই গভীরতা নেই কেমন করে জাহাজ চলা চল হবে? কয়লা, লোহা, চা, পাট এখান থেকে রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কি হবে তাদের? জীবনের? জীবিকার?

সমস্ত ডক বেসিন শীতের কুয়াশায় অন্ধকার দেখাচ্ছে।' অন্ধকারের মধ্যেদিয়ে হারিকেন জ্বেলে দু'একজন করে লস্কর লঞ্চ, জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। ক্যাপ্টেন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথাই ভাবছিল বলরাম। এমন সময় জাহাজে ফিরে এলো যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির ফিরে এলো কেন? ও-কি তবে বাড়ি যাই নি? আজ তলবের দিন ছিল। ওর তো বাড়ি যাবার কথা। এই সব বেসরম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক গুলোকে সহ্য

করতে পারে না বলরাম। যারা তাদের পরিবার 'সন্তান সন্ততির দায়িত্ব সৎভাবে পালন করে না তাদের প্রতি ও আজকাল বিজাতীয় ঘৃণা অনুভব করে। যুধিষ্ঠিরও বলরামকে পছন্দ করে না। যুধিষ্ঠির এখন ট্যাণ্ডেল হয়েছে। ট্যাণ্ডেল হয়ে ওর দেমাক বেড়ে গেছে। সব ব্যাপারেই ও আজকাল টপকে যেতে চায়। সহকর্মীদের সংগে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। কমাণ্ডার অফিসারদের বাড়ি পর্যন্ত ওর যাতায়াত। আপন মনে বই নিয়ে বসে বলরাম। হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। যুধিষ্ঠির ওকে দেখে ক্যাপ্টেন ব্রিজে উঠে আসে।

—সেই কেতাব! কি এত পড়ো ওস্তাদ। ছোট বেলায় এ রকম মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে লস্কর ট্যাণ্ডেল, সুখানীর কাজ করতে হতোনা। ক্যাপ্টেন চীফ অফিসার হয়ে যেতে। কি পড়ছ বাংলা কেতাব? ওতে প্রেম মহবৎ কিছু আছে। মেয়েমানুষ, লদগালদগি?

এই সব কথায় আজকাল আর অপমানিত বোধ করে না বলরাম।—যা না শালা সামনেইত মুন্সীগঞ্জ রয়েছে, ঘুরে আয় না।

—মাপ করো রাজা। ওখানে গেলেই সিফিলিস গণোরিয়া, ইয়া বড় বড় সুই লিতে হবে—সুই।

এই জন্যেই তোদের বলে লোহা কাটা। মদ, মেয়েমানুষ, তাস, জুয়া খিস্তি ছাড়া কথা নেই।

—আরে ওস্তাদ জাহাজী মানেইতো তাই। কমাণ্ডার থেকে লস্কর এমন সাচ্ছা আদমী কে আছে বলো তোমার মত? তুমি হচ্ছ আমাদের দৈত্যকুলের প্রেহ্লাদ। এ শালা লাইনের দোষ।

তুই আজ বাড়ি গেলি না?

নাঃ।

কেন?

ভাল লাগলো না। আজকাল আর কিছুই ভালো লাগে

না ওস্তাদ। এ শালা কয়েদীর জীবন কাহাতক ভালোলাগে বলো? শালা যেন কেমন মরে গেছি। এই মানুষ মানুষ চেহারাটা নিয়ে বুনো জন্তুর মত বেঁচে আছি। রাস্তার ধারের ঐ কুত্তাগুলোকে দেখোনি-ওদের যেমন কোন বিকার নেই। রাস্তাতেই সংগম করছে, বাহ্যাহচ্ছে, মানুষের বাচ্চাদের সংগে একই জায়গায় খাচ্ছে ঘুরছে— আচ্ছা ওস্তাদ! চাকরী থাকবেতো?

—তোর তো ক্যাপ্টেন পাকিজা আছে হাতের লোক, পাকিজার মেমসাহেব তোকে পেয়ার করে।

—ওদের ভালবাসার কথা বলছ? কুত্তার ভালবাসা। ওস্তাদ ঐ দেখ।

—কিরে?

—মেয়ে মানুষ। বেশ টাটকা তাজা। ওস্তাদ এদিকেই আসছে।

—ওরা আওয়ারা ভিক্ষিরী। থালা হাতে ভাতের জন্যে আসছে দেখছিস না।

—তাহোক বিধবার আবার সভ্য অসভ্য।

—যুধিষ্টির! তুই না একটা ওয়ার্কার, ভদ্রঘরের ছেলে? তোর একটা ইজ্জত আছে?

— ভদ্র ঘরের ছেলে? হয়তো কোন দিন ছিলুম। ইজ্জত? ইজ্জতের কথা বলছ? তুমি বিশ্বাস করো আমাদের ইজ্জত এখনও আছে? তুমি একটা বেকুব। ক্যাপ্টেন পাকিজা তো একটা খাস ভদ্রলোকের বাচ্ছা। ইজ্জতদার আদমী। অনেক টাকা মাইনে পায়, অনেক উঁচু পোষ্টে কাজ করে—ওর মেম সাহেবের সুরতখানা দেখেছ-ইরানী বুলবুল। সে কেন রাত্রে বৌ ছেড়ে ঝিয়ের সাথে রাত কাটায়? অনেক তো লেখা পড়া জানে—কেন সে টানা —মালের কারবার করে? ওঃ! ওস্তাদ! মালটা খাসা গো। মালিক ঠিক সময়েই জুটিয়ে দিয়েছে।

—তোর ঘরে কি মা বোন নেইরে?

—সবাই যদি ওস্তাদ মা আর বোন হবে তবে বৌ কে হবে? থাকো তুমি কেতাব নিয়ে।

ঘৃণায় থুতু ফেলে বলরাম। শিক্ষা দীক্ষা থেকে বঞ্চিত মেহনতীদের জীবনে এ এক অভিশপ্ত দুর্ভাগ্য। এরাই তার সহকর্মী এদের সংগেই কাটাতে হবে বাকি জীবনটা।

গান গাইছে বলরাম।

এতদিনে শ্রীরাম চন্দর করিলেন গমন,

গয়লাদের বাড়ি গিয়ে দিলেন দরশন।

গয়লাদের বৌগুলো সব দুইতে ছিল গাই,

পেছন থেকে শ্রীরাম চন্দর—

—বাবু দুটি ভাত হবে?

এখন একটা পরিপূর্ণ আস্ত মেয়ে মানুষ যুধিষ্ঠিরের সামনে দাঁড়িয়ে। একজন ভরা জুয়ানী মানুষ যে রকমটি কামনা করে আর কি।

বইটা রেখে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় বলরাম।

ড্রাইডকে মনরোভিয়ার একটি মালবাহী জাহাজে রেকর্ডপ্লেয়ারে তীব্র আবেগে বেজে চলেছে পপ সংগীত। জল, আকাশ, চিমনীর ধোঁয়া, জাহাজের হুইসিল, ডক সাইডের নির্জন রাস্তায় রিক্সার ঠুন ঠুন শব্দ মিলিয়ে আলোছায়ার দোলা। জাহাজে জাহাজে ক্যাপ্টেন ব্রীজ সাজানো হয়েছে আলোর মালা দিয়ে। মালয়েশিয়ান্ জাহাজী নাবিকেরা উদ্দাম গতিতে মদের বোতল হাতে নেচে চলেছে। ওদের সংগে সমান তালে নেচে চলেছে হিমালয় অঞ্চলের মাতাল মাংগোলিয়ান বারবনিতারা। এপাশে অন্ধকার ও পাশে আলো। পঁচিশে ডিসেম্বরের রাত। রাত বারোটা বাজলে জন্ম নেবে মহান যিশু। পাপী তাপীদের মুক্তিদাতা। মেহনতীদের এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দিতে তাদের ঘরে কি কেউ জন্ম নেবে না? কলকাতার বন্দরে ক্রমশঃ ভিক্ষিরীদের ভিড় বাড়ছে। এ লক্ষণ ভাল নয়। এই সব আওয়ারা জেনানা মরদ সব দেহাতের আদমী। হয় বানভাসি মানুষ, নয় ক্ষরা

লাগা গাঁও থেকে কাজ কামের জন্যে ক্ষেতিবাড়ি ছেড়ে ভিড় জমাচ্ছে শহরের ফুটপাতে, সি,এম, ডিয়ের পাইপের মধ্যে, পার্কের ধারে, গাড়ি বারান্দার নীচে, ডক-পোর্ট এলাকায়। মানুষই হালে পাণি পাচ্ছে না-তায় আবার জোয়ানী আওরৎ- স্রেফ তলিয়ে যাচ্ছে। কেতাব। সত্যিইতো কি হবে কেতাব ? কেতাব পড়ে কে কবে মানুষ হয়েছে ? যতদিন রাস্তায় রাস্তায় মানুষ কুত্তার মত পেটের জন্যে ঘুরবে, জোয়ানী আওরৎ ইজ্জত বিক্রী করবে, ততদিন শুধু কেতাব পড়ে কিছু হবে না। জঞ্জাল সাফায়ের কাজে নাবতে হবে। কলিজার খুন পশিনা দিয়েই তা করতে হবে।

অনেক তো কেতাব লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে অনেক মূল্যবান নীতিকথা। তাহলে পাপ কেন সিনা ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে ইনসানকে বেআব্রু করছে ? বলরাম যত কেতাবই পড়ুক তবু সে একজন লোহা কাটা ছাড়া কিছু নয়। তবু সে যুধিষ্ঠিরদেরই একজন। যুধিষ্ঠিরদের একজন হলে কি কেতাব পড়তে নেই ? নিশ্চয় সে আনপড় আদমী। জিন্দেগী সুরু করার সেই সব দিনে সে টিপছাপ দিয়েই তলব উঠাতো। তারপর সে অনেক ধাক্কা খেয়ে বাংলা ইংরেজী দুটোই শিখেছে। তার জীবনে এ এক ক্রান্তীয় পরিবর্ত্তন। আজ সে তাই জীবনকে অন্য চোখ দিয়ে দেখছে। জীবন থেকে সে চুন চুন করে পাঠ নিচ্ছে। গোটা বন্দর গাঁওকে দেখে দুনিয়াকে বোঝার চেষ্টা করছে। তাই সে অনেকের চোখেই বেমানান বেয়াদপ। সাহেব দেখলে সে কুর্নিশ করে না। অফিসারদের সংগে মশকাপালিশ করে না। কেতাব পড়েই মাথাটা তার বিগড়ে গেছে। এরপর যদি কোন দিন সব সেই রথি মহারথিরা তাকে একা পায় এই মাটিতেই নিশ্চিত কবর দেবে। যারা দঁড়ি টানে, মাল ঘাড়ে করে জাহাজে তোলে, অচল ইঞ্জিনকে পুরো দায়িত্বে তেল কালি ঘেটে সচল করে, ঝড়ের মুখে অথৈ সমুদ্রে যারা বিপন্ন জাহাজকে জান প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে, আলো দেখায় তাদের

মতামত কেউ গ্রাহ্য করে না, তাদের মানুষের মধ্যেই গ্রাহ্য করে না। জানে না সে এইসব নিয়ে কবে স্বরু হবে আখেরি লড়াই? তাদের মত পোড় খাওয়া মানুষ যদি না বাঁচে পোর্ট বাঁচতে পারে না। গংগা যদি না বাঁচে তারাও বাঁচতে পারে না। কেতাব। এ ভি এক আদমী। ইনসানকি পহেলে নম্বর কা পয়দাবার। কেতাব তার দোস্ত। এইসব ভাবতে ভাবতে বলরাম ক্যাপ্টেন ব্রীজের এককোণে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। সে অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে চাইছে। আর যুধিষ্ঠিররা ক্রমশঃ আলো থেকে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। যুধিষ্ঠিররা যদি পেছিয়ে পড়ে তাহলে কাদের নিয়ে সে এই সব বেইমানীর বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচারের খিলাফে রুকে দাঁড়াবে?

—বাবু দুটি ভাত হবে?

— ভাত?

—হ্যাঁ।

—ভাতা'র নেই?

—নাগো বাবু।

—কোথা থেকে আমদানী?

—সুন্দরবন।

—সুন্দরবন! আহ! কতদিন হচ্ছে?

—এই মাস খানেক।

—একাবারে আনকোরা! বাঃ তা কলকেতা কেমন লাগছে গো। গতরটাতো মন্দ লয় খেটে খেলে হতো নি?

—কে আর আমাদের কাজ দেবে বাবু? পেটের তরেইত—

—এই তো ডকের জল তাহলে পেটে পড়েছে? কাজ? কাজ চাই? এসো উঠে এসো আমি দেব। ধীরে ধীরে আমার হাত ধরে উঠে এসো শব্দ করো না।

—কি নাম তোমার?

—দ্রৌপদী।

তাহলে তো কথাই নেই। চলে এসো পাঞ্চালী। আমার নাম যুধিষ্ঠির। নিঃশব্দে হেসে ওঠে যুধিষ্ঠির। সিগারেট ধরায়। গলগলিয়ে ধোঁয়া বেরহয় ওর মুখ থেকে।

দাঁতে দাঁত চেপে ভীষণ জোরে রেলিংটা আঁকড়ে ধরে বলরাম। গোর্কি, প্রেমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র দুটি পাতা একটি কুঁড়ি, একটি কুঁড়ি দু পাতা। জার, কাইজার, হিটলার। এইবার—এইবার সে কি করবে? তার বুকের মধ্যেটা দাপাচ্ছে। চোখ দুটো জ্বলছে। খুব জোরে রসি চেপে ধরার মত চেপে ধরেছে নিজেকে। রাত বারোটা বাজলো। চার দিক থেকে এক সংগে অনেকগুলো জাহাজী বাঁশি বেজে উঠে। অবশ হয়ে আসে বলরাম। কিন্তু খৃষ্টের মত তার সমগ্র অনুভূতি রক্তাক্ত।

—কিরে খাওয়া হয়েছে?

—হয়েছে, আমি তাহলে বাসনগুলো মেজে দিয়ে যাই বাবু?

—না তোমার অতো কাজ করতে হবে না।

—তাহলি?

—অবাক অস্থির সরস বিস্ময়ে লুব্ধ যুধিষ্ঠির মুগ্ধ। ঈশ্বরের অসীম করুনা। অন্ধ পংগুকে হাত ধরে পার করে দেন, দীন দুঃখীকে দয়া করেন।

পাপীতাপিকে উদ্ধার করেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের নামই তার লীলা। লীলাময়ের লীলা বোঝা ভার, তানাহলে তার বলিষ্ঠ এই দেহবপুর অভ্যন্তরে জমে আছে যে অতৃপ্ত ক্ষুধা—সেই পরম দয়াময় প্রভুই পাঠিয়ে দিতেন না এই মায়ারূপী পরিপক্ক আপেল টিকে। সত্যি বড় ক্ষিদে পেয়েছিল দৌপদীর, খানিকটাডাল, পিঁয়াজ আর কাঁচা লংকা দিয়ে অতোগুলো ভাত কেমন গোগ্রাসে গিলে নিলো। পরম পরিতৃপ্তিতে ওর মুখটা কেমন কোমল হয়ে উঠেছে। যুধিষ্ঠিরের ক্ষুধাতুর চোখের সামনে ও কেমন ধরিত্রীর মত রহস্যময়ী। তাহলি কি করবো এখন?

—আপেল, আংগুর বেদানা, ডালিম কখনও খেয়েছিসরে দৌপদী।

—না বাবু আমার তো ব্যারাম কোনদিন হয়নি। ব্যারাম হলি মানষে ও সব খায়।

—আমার বড় অসুখরে দৌপদী।

—কি হয়েছে বাবু ?

—শরীরের মধ্যেটা বড় জ্বালারে।

—আমি তাহলি—

—দ্রৌপদী ! হবেনা সেই ?

—কি সেই।

—কি সেই ? ছীনালী হচ্ছে ? নিমকি ছিনালী। চল্ কেবিনে চল্। ছোখে জল এসে যায় দ্রৌপদীর। রাতের বেলা কেন সে একা আসতে গেল। দিনের বেলা বহু মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দুটো ভাত চাইতে বড় লজ্জা। তার মত শক্ত সমর্থ মেয়ে মানুষ পুরুষগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ভাত চাইলে লোকে নানা রঙ্গ রসিকতা করে তার দেহের দিকে বেআব্রু তাকিয়ে বেইজ্জত করে। খেটেখাওয়ার বয়সে ভিক্ষে তার চেয়ে বড় লজ্জা বুঝি এ জীবনে আর নেই। মনে মনে সে কেঁদেছে, ঈশ্বরকে ডেকেছে, পৃথিবীটা তার সামনে দুলে উঠে। তারপর যখন দুরাত্মা ঐ দুঃশাসন মিষ্টি মিষ্টি কথায় তার তলপেটটা জড়িয়ে ধরে দেহটা শুকতে শুকতে তার বিকার গ্রস্থ দেহের সংগে চেপেধরে কেবিনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে তখনই সে বুঝেছে লোকটা কি করতে চায়। তারপর তারপর আর সে কিছু মনে করতে পারেনা।

নাঃ লোকজন কেউ নেই। সবে ভোর হচ্ছে। যুধিষ্ঠির উঁকি দিয়ে দেখে বলরাম এখন ঘুমুচ্ছে। কোথাও কোন সাক্ষী সে রাখতে চায় না। কাজ হাসিল। এখন তার মনের অবরুদ্ধ জ্বালা জুড়িয়েছে। কেবিনের পোর্টহোল দিয়ে সে থুতু ফেলে। দেখে নেয় চারদিক।

নে উঠে পড়। তোর গায়ে বড় নোনতা গন্ধ। ভাল করে সাবান দিয়ে স্নান করতে পারিস না। এই নে পাঁচটা টাকা রাখ। রাতের বেলা আবার আসবি বুঝলি। কিরে উঠতে কষ্ট হচ্ছে? এই দেখ আবার কেঁদে মরছিস কেন? ভয় কি আমি তো আছি। কারুকে পরোয়া করি? পোর্ট কমিশন মে কাম করতা হ্যায়-যুধিষ্ঠির ম মা নাম হ্যায়। ওঠ ওঠ। লে এবার কেটে পড়। ক্লান্ত বিপর্যস্ত দেহটা টেনে তোলে দ্রৌপদী। দু চোখে, ক্লান্তি, ঘৃণা, একমাথা এলোরুক্ষ চুল পাছা অবধি এলিয়ে পড়েছে। ভরাট-মাংশল আপেলের মত স্তনে দু গাছা দাঁতের কামড়ের রক্তজমা নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন। টাকা পাঁচটা আচলে বেঁধে সে কোন রকমে টলেটলে জাহাজ থেকে গ্যাংওয়ের ওপর দিয়ে নেবে আসে। মনে মনে ভাবে এর বদলা একদিন নিতে হবে।

এইনে-তোর থালাটা এই সাবানটা নিয়ে যা এটার নাম লাক্স, গায়ে মাখবি। এই আলোর পথ ধরে সোজা পান বাজার চলে যা রাতে আবার আসবি।

সবে ভোর হচ্ছে কোমরে গামছা জড়িয়ে দাঁতন করতে করতে বাইরে আসে যুধিষ্ঠির। নিজের মনে গান ধরে

—গয়লাদের বৌগুলো সব ভাজতেছিল লুচি।
পেছন থেকে শ্রীরাম চন্দর—

নিজের মনে হেসে উঠে যুধিষ্ঠির ফোকটে খুব লাভ করেছে যা হোক। লোভ সামলানো মুস্কিল। অবশ্য ওরা নিরোগ। মনে হচ্ছে লাইনে এই প্রথম। শালা অমন যে ক্যাপ্টেন পাকিজা তাকেই সে বশ করে ফেলেছে। তার মেম সাহেব পর্যন্ত যুধিষ্ঠির বলতে অজ্ঞান। আহ! মেয়েমানুষ তো নয়—গোলাপজাম আম। কি বিছানা! গায়ে কি মিষ্টি গন্ধ। দেহটা যেন শালা সমুদ্রের ঢেউ। খালি উত্তাল পাতাল। প্রথম দিনটা সে কি ভীষণ উত্তেজনা। ভয় পেয়েছিল সে। ক্যাপ্টেনের মেমসাহেব বলে কথা। খিল খিল করে হেসে উঠেছিল মেমসাহেব।

—ক্যায়া ম্যান ! কই ভয় নেই। আও, মেরা কামরামে আও। মোকা মিলেগা—কভি কভি এইসা চলা আওগে মালুম। লেকিন আচ্ছা সে সাবন দেকর গোসল করকে আওগে। যাও আভি ভাগো। কিসের ভয় বলরাম কে! বলরামও পোর্ট ট্রাস্টের চাকর। ক্যাপ্টেন পাকিজাও পোর্ট ট্রাস্টের চাকর। সেও পোর্টের চাকর। ক্যাপ্টেন পাকিজা ফাস্ট্‌ক্লাস ক্যাপ্টেন টিকিট হোল্ডার! কেতাব কেতাব এখানে চলবে না। শালা বইয়ের পোকা। যাওনা বাবা নিজের দেশে। কলকাতা বন্দরের পয়সায় তো অনেক বন্দর গড়া হয়েছে। বোম্বের বড় বড় জাহাজ কোম্পানীগুলো, ধনকুবের বনে গেছে। যাওনা ভাইজ্যাক, টিউটিকোরিন, বার্মা গোয়া, কাণ্ডালা, পারাদীপ। আমাদের ছেলেরা একটু করেকম্মে খাক। শুধু সাহেবরাই লুটে পুটে খাবে? যত মজা তারাই লুটবে আমরা কি শালা সারা জীবন আড়িয়া হাবিশ আর আনন্দ (রমি) টেনেই খালাস? একটু সুখের মুখ দেখব না? কি ইজ্জৎ আছে লেখাপডার? বাজারের মেয়ে মানুষের সংগে কি তফাৎ আছে আমাদের? জাতও যায় পেটও ভরে না। বড় বড় ইনামদার খেতাবধারী লেখাপড়া জানা আমলারা যদি সাধু হতো তাহলে কি এই হাল হয় বন্দরের? গোটা বন্দর গাঁওকে ওরা ধর্ষন করে ছিবড়ে করে ফেলছে। ওরা তো আর পয়দা করেনি এই এতবড় বন্দরটা, ওরা হচ্ছে তৈরী ছেলের বাপ। শুধু মাল পাণি কামিয়ে যাও। যাহান্নামে যাক সব। কিতাব—বাবু কিতাব পড়ছে? গোল্ড মেডেল পাবে। পাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পদ্মশ্রী। যদি কেউ সেচ্ছায় জাহান্নামে যায় তাকে কি কেউ আটকাতে পারে? অনেক প্রতিজ্ঞা করেছিল তলব পেয়ে সে সোজা বাড়ি যাবে। যাবার সময় ছেলেমেয়ের জন্যে আপেল আংগুর মিষ্টি নিয়ে যাবে,! বৌয়ের জন্যে একটা শাড়ি; চমকে যাবে বৌ। কিন্তু তলব হাতে আসতেই সামনে এসে দাঁড়ালো লাল—জয়নাল, পরিমল, রাজদেও সিং—পড়ে গেল জুয়ার আড্ডায়। নগদ কড়

ফড়ে তিনখানা পাত্তি বেরিয়ে গেল। তার স্ত্রী মাদি কুত্তির মত আট মাসের পেট নিয়ে হয়তো এখনও চিত হয়ে ঘুমচ্ছে। তিনটে বাচ্ছা পাড়তে না পাড়তেই মাগীটা কেমন বুড়িয়ে গেছে। পাশে শুতেই ভয় করে। পাশে শুলেই পেটে বাচ্ছা এসে যায়। কোথায় সুখ সংসারে? তার চেয়ে এ জীবন অনেক আজাদীর। টাঁকা তো সে খুব কম কামায় নি। দুনিয়াটা বড় মজাদার। খেলার মাঠ, রেসের মাঠ, বার, হোটেল, মালের দোকান, মন্দির মাগীর বাড়ি, সুদিওলা, মহাজন, সিনেমা, থিয়েটার, শ্মশান দাবার ছকের মত কেমন সাজানো। দুনিয়া গোল হ্যায়। রূপিয়া কেকো, মজালুটো। যুধিষ্ঠিরও সইকরে তলব উঠিয়ে ছিল হাজার টাকা। জাহাজের সবাই সই করে তলব উঠায়। অনেক গাল মন্দ খেয়ে এই জিনিষটা সে বলরামের কাছ থেকে শিখেছে। বাবুরা বিরক্ত হয়। সাহেবরা ভ্রু কোচকায়। পরোয়া করে না বলরাম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে দিয়ে টিপছাপ নয় পে-সিটে সহি করিয়ে নেয়। বড় বেয়াড়া গোছের লোক। বহুৎ আইন বাজ। অফিসাররা সমঝে চলে বলরামকে। সব সময় একটা পীর পয়গম্বর ভাব। মেনে চলে সবাইকে, পরোয়া করে না কাউকে। সহকর্মীদের দায় বিপদে বলরাম আগে বাড়লে অফিসাররা অনেক ভারি ভারি কসুর মাপ করে দেয়। বলরাম তাদের অনেকের গর্ব। কিন্তু লোকটার ঐ একটা দোষ লোকের সুখ দেখতে পারে না। বড্ড নিরামিশ। একটু খানাপিনা, ফুর্তি জলের চাকরীতে কেনা করে থাকে। জুয়ায় তিন তিনখানা পাত্তি বেরিয়ে যেতেই তো মনটা বিগড়ে যায়। বাড়ি যাওয়া হয় না। কালীমার্কা একটা পুরো পাঁট ব্যাগে পুরে সোজা জাহাজে চলে এসেছিল। মালিক ঠিক সময়ই দ্রৌপদীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী। কেজানে সে দ্রৌপদীর ক' নম্বর ভাতার। যে দুঃশাসন মানুষকে প্রতিদিন পশুর জীবন যাপনে বাধ্য করেছে দ্রৌপদীর স্বাধিকার জীবনের অধিকার হরণ করে তাকে বাধ্য

করেছে, দেহ বিক্রী করতে সেই দুঃশাসন দুদিন পরে তার মত মূঢ় বিভ্রান্ত মানুষকে বাধ্য করবে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে। অনেক পরিশ্রমে রক্তজল করা পয়সার এ অপব্যবহার তার মত মানুষকে মৃত্যু ফাঁদের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। পৌরুষের এ ঘৃণ্য পরাজয় অনেক মূল্য দিয়ে বহন করতে হচ্ছে। এইসব উপলব্ধির কথা অনেক বুঝিয়েছে বলরাম। কিন্তু বলরাম এটা বোঝেনি ক্যাপ্টেন পাকিজাদের প্রভুত্বের গভীর প্রভাব যুধিষ্ঠিরদের জীবনের সর্বত্র যে ভাবে শিকড় চালিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া কত দুঃসাধ্য। বলরাম দুঃখী মেয়ে মানুষের অপমান কান্না সহ্য করতে পারে না। মেয়েমানুষের প্যানপ্যানানি তার কাছেও অসহ্য। খুবসুরত্ মেয়েমানুষ দেখলেই কেমন বৌ করতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বিছানায় পেতে। চারিদিকে ভোগের বন্যা। সারা কলকাতা জুড়ে যদি মানুষের সামনে চোখ ঝলসানো লোভনীয় ভোগের সামগ্রী নিষিদ্ধ ফলের মত সযত্নে তুলে ধরা হয়—সেখান থেকে তৃষিত, লাঞ্ছিত, ক্ষুধার্ত কামনাকে কেমন করে দমন করা সম্ভব? তোমার হাতে কাঁচা পয়সা তুলে দিয়ে চুষে ছিবড়ে করে দিচ্ছে এই কলকাতা। তোমার খেলা ফুরিয়ে গেলে ছেঁড়া চটি জুতোর মত ওরা ছুড়ে ফেলে দেবে ডাষ্টবিনে। তার পর জাদুকর নতুন খেলা নিয়ে হাজির হবে নতুন মানুষের সামনে এসব কথা কি লেখা আছে বলরামের কেতাবে?

—তাহলে?

কেন সেই বা ছাড়বে? কেন দয়া দেখাবে মানুষকে? চোরাই মালের পুরো হিস্যা কেনই বা সে অফিসারদের কাছ থেকে বুঝে নেবে না? কেন বা সুযোগ পেলে ভদ্রমহিলাদের আদর সোহাগ চুটিয়ে ভোগ করবে না?

সেদিন স্বামীর সংগে মিসেস্ পাকিজা জাহাজে বেড়াতে এসেছিল। যুধিষ্ঠির ফলাঞ্চায় বসে জাহাজের গায়ে রং করছিল মিসেস পাকিজাকে দেখে তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠির তার সামনে এসে বিস্ময়ের সংগে দাঁড়ায়।

—সেলাম মেম সাহেব।

হায়! তিনি ঘুরে তাকালেন না। চিনতেই চাইলেন না যুধিষ্ঠির কে। আজব দুনিয়া। যুধিষ্ঠির তখন আর মানুষ নয়—লস্কর ক্লাস ফোর স্টাফ। কি অপরূপ মুখোস পরেছ তুমি! সুন্দরী পৃথিবী। প্রয়োজন টুকু মিটে গেলেই কনডেম। এইভাবেই যেমন কনডেম হচ্ছে কোটি কোটি টাকায় গড়ে তোলা কত ক্রেণ, গোডাউন, ওয়্যার হাউস, রেললাইন, ওয়াগণ ইঞ্জিন, জাহাজ লঞ্চ। দেহটা ভাড়া খাটাবার সময় মনে হয়েছিল—সে ও একমূল্যবান সামগ্রী। কত মিষ্টি কথার ফুলঝুরি। কত আরাম। এখন? আরাম হারাম হায়! চাকু চালিয়ে ঐ লাস্যময়ী রমণীর তলপেটের খানিকটা মাখন মাংস কেটে নিতে ইচ্ছে করছে। বেইমান। বেইমানদের কোন ক্ষমা নয়। ঠিক যে ভাবে ওরা লাঞ্চে বসে যুধিষ্ঠিরদের কলিজা রক্ত, মাংস দিয়ে পরম তৃপ্তির সংগে লাঞ্চ করছে চুষে চুষে খাচ্ছে তাদের হাড় মাস, সেই ভাবে ওদের বদলা নেওয়া দরকার। কোন ক্ষমা নয়। দয়া মায়া মমতা নয়।

ঐ সব সাহেবদের কলমের খোঁচায় এই ভাবেই প্রতিদিন খরচের খাতায় উঠছে গোটা দেশটা। ঋনের বোঝা চাপছে তাদের মাথায়। কোটি কোটি টাকা লোকসান। লোকসানের পাহাড়ের তলায় তাদের বিচরণ। কি মূল্যে শোধ হবে সেই ঋণ? কেতাব না পড়েও যুধিষ্ঠির যে মাটিতে পা রেখে চলে, সেই চোরাবালির ওপর দিয়েই তো পথ হাঁটছে বলরাম। এতবুঝে শুনে চলেও বলরামকে সেকেণ্ড সুখানীই থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন দুবের কথা বড় মালুম সাহেব ও হতে পারবে না। মালিকের ছেলে মালিক, মজুরের ছেলে মজুর এটাই তো কেতাবের কথা। টার্ণ টু—টার্ণ টু—টার্ণ টুরে সারেং ঘণ্টা বাজাচ্ছে। কাজে ফিরে যেতে বলছে, ইঞ্জিন ডেক খালাসীদের।

একটি পরিপূর্ণ কর্ম ব্যস্ত দিন। ইঞ্জিনরুম থেকে ইঞ্জিন তোলা হচ্ছে। ডিজেল ইঞ্জিন!

হাবিস—মাল।

মিস্ত্রি খালাসী সবাই ব্যস্ত। ড্রাইডকে ঢুকেছে এ্যাডভেঞ্চার। পাশের ড্রাইডকে ওসাকামারু। কোথাও নেই এতটুকু ক্লান্তি। হাতে হাতে কাজের জোগান। মুখে মুখে মশকা পালিশ। ড্রাইড-কের ধারে বসেছে তিন তাসের জুয়া। থালা হাতে নাংগা নারী কিশোর কিশোরী শিশু ঘুরছে জাহাজে ভাত বা বাসীরুটির সন্ধানে। দেওয়ালের গায়ে ওয়েজ বোর্ড লাগু করার আবেদন।

ডক-পোর্ট—জাহাজী-মজদুর একাই জিন্দাবাদ!

—বাবু দুটো ভাত হবে?

যুধিষ্ঠির এদের একজনকে খুঁজছিল অনেকদিন ধরে। সেই রাতের পর থেকে বহুদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে অনেকগুলো জাহাজে সে বদলী হয়েছে। বহুদিন এই ডক বেসিন এলাকায় সে দেখেনি দ্রৌপদীকে। ওয়াটগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পদ্মপুকুরের আশ-পাশে সে অনেক সন্ধান করেছে। আজ ক' মাস হচ্চে হয়ে সে কেবলই খুঁজেছে দ্রৌপদীকে।

পাণি আড়িয়া।

ব্লুবার্ড—গ্রীক জাহাজ ব্লুবার্ড এসে দাঁড়িয়েছে লক্ গেটের মধ্যে। কলকাতার বাজার সেরে গ্রীক জাহাজ ব্লুবার্ড ফিরে চলেছে অন্য কোন বন্দরের দিকে। পাইলট সিঁড়ি তুলে নেওয়া হচ্ছে। কলকাতার হারবার মাষ্টারের পাইলট জাহাজে উঠে যায়। সেই পাইলটিং করে নিয়ে যাবে ব্লুবার্ডকে স্যাণ্ডহেড অবধি। মানে বে-অফ-বেংগলের শেষ প্রান্ত।

—বাবু দুটো ভাত হবে?

—কি নাম তোর?

—মোর নাম আরসাদ। দুটো ভাত দেবে?

বছর দশবারো বয়স ছেলেটার জাহাজে ভাত চেয়ে বেড়ানো ছাড়াও এদের আরও কাজ আছে। সময় সুযোগ মত কালোয়ার

মহাজনদের ঘরে এরা পৌঁছে দেয় ডকের অনেক মাল পত্তর। কাঠ লৌহ, পেতল। ইলেকট্রিকের কেবিল ইত্যাদি।

—এই আরসাদের বাচ্চা এদিকে আয়। বল তোর বাপের নাম?

—ইস্। ভাত দেবেনা আবার বাপের নাম জানতে চায়।

—শোন না এদিকে আয় না।

—ভাত দেবে তো?

—বল তুই কুত্তার বাচ্ছা। তাহলে দেব?

—কুত্তার বাচ্চা। কৈ দাও? বললুম তো।

—হ্যারে দ্রৌপদীর খবর কিরে?

—সেই সে যে সোন্দর মত? পেটটা বড় মত?

—পেট বড় ক্যানরে?

—ইস্! জানে না আবার! তার এখন বলে হবে।

—সে কি রে?

—হ্যাঁগো মশাই। কি রে ছুটকি বলনা হবে না?

—কবে রে?

—জানি না!

—বল একটা টাকা দেব।

—সত্যি?

—সত্যি।

—সত্যি?

—বলনা শালা খানকির বাচ্চা।

—খানকির বাচ্চা বললে কেন?

—বেশ করেছি।

—বেশ করেছি? তোর মাকে এই করি।

—তবে রে।

কিনারার দিকে গ্রীক্ নাবিকেরা তাকিয়ে আছে। হাতে চায়ের মগ, বিয়ারের বোতল।

লাভ ইন টোকিও।

দুনিয়া জাপান হ্যায়,

পাগল মুঝে বন গিয়া।

—এই সাহেব। এই লাল মুখ বাদর বাচ্চা। রুটি দেনা রুটি।

গানের সংগে দু' হাত তুলে কোমর বাঁকানো টুইষ্টের সংগে থালার বাদ্য আর মুখে আংগুল পুরে সিটি। অর্দ্ধ উলংগ বেওয়ারিশ ছেলে মেয়েগুলোর ন্যাতানো পেট থেকে খসে পড়ছে ছেঁড়া প্যাণ্ট। তাদের জ্বলজ্বলে চোখে, ক্ষুধার্ত মুখে বন্য বেপরোয়া হাসি। হাসছে লাল মুখ নাবিকরাও। মজা দেখছে। এ মজা নতুন নয়। এসিয়া আফ্রিকা আর লেটিন আমেরিকার বন্দরে বন্দরে এই সব বেওয়ারিশ পয়দাবার ওরা দেখে অভ্যস্ত। এইভাবে যিশুখৃষ্ট সারা পৃথিবী জুড়ে জন্ম নিচ্ছে! জাহাজের প্রৌঢ় ক্যাপ্‌টেন ভারতীয় পাইলট অফিসারকে সিগার অফার করে, বাড়িয়ে দেয় একটা পুরো হল্যাণ্ড বিয়ারের টিন।

ডি. বি. এমের লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে টানছে হিভিং লাইন। রুটি আর কেক খেয়ে যিশুখৃষ্টের বাচ্ছাদের কেউ কেউ গাদাকরা রেলওয়ে স্লিপারের ওপর ছেড়া চট বিছিয়ে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। পুলিশ. ওয়াচ ম্যান, সি. এস. এফ্‌ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই ডক-পোর্টের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর নানা কায়দায় পাচার হয়ে যায় অনেক কিছু। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটি পুলিশ খইনি ডলতে ডলতে এগিয়ে আসে ঘুমিয়ে থাকা একটা ছেলের কাছে। তারপর ক্যাত করে মারে এক লাথি।

—উঠ্‌ শালা। হিয়া শোনে কা জায়গা মিলি?

আচমকা লাথি খেয়ে চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসে ছেলেটা। পুলিশটা এদিক ওদিক তাকায়। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে—দেখ্‌ ঐ হ্যায় একঠো পিলেট। উসকো লেতে বাহার ভাগনা! বাদমে পানবাজার পর ভেট হই। ছেলেটা প্লেটটা মাথায় তুলে সোজা হাঁটা দেয়।

হেসে উঠে যুধিষ্ঠির।

অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির পেয়েছিল দ্রৌপদীকে। পেয়েছিল মনসাতলার করপোরেশন হাসপাতালে।

যুধিষ্ঠিরকে হঠাৎ দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল দ্রৌপদী। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল তার চোখ দুটো। সেই রাক্ষসটা আবার এসেছে। তাকে খেয়েছে। এইবার খাবে তার বাচ্চাটাকে।

—কিরে দ্রৌপদী! আমায় চিনতে পাচ্ছিস? বাঃ ছেলেটাত বেশ খাসা হয়েছে রে। যেন রাজপুত্তুর।

বিভৎস কুৎসিত নিলজ্জ ভংগিতে হেসে উঠে যুধিষ্ঠির।

—দ্রৌপদী নয়, মোর নাম পিয়ালী খাতুন। সরস বাৎসল্যে নরম হয়ে উঠে যুধিষ্ঠির।

—তাতে কি আছে। তুই মেয়েমানুষ আমি পুরুষ মানুষ। তোর তো এখন ভরা জোয়ানী। এইতো মালপাণি কামাবার বয়সরে। মানুষের আবার কোন জাত আছে নাকি?

—তালি মোরে বে করে ফেলোনা কেন?

—বে? তুই বৌ হবি? বলিস কিরে! সখ তো তোর মন্দ লয়!

—হুঃ, এই আবার তুমি মরদ। জান বাচ্চাটা কা'র? আমি কালই এটাকে লিয়ে যাবো তোমার জাহাজে।

দ্রৌপদীর তীব্র বিষাক্ত ছোবলে ভয়ে কুঁকুড়ে যায় যুধিষ্ঠির। এমন সাংঘাতিক কথা সে আশাই করতে পারে নি।

—এই, না না মাইরি বলছি। তার চেয়ে তুই এক কাজ কর। এই দশটা টাকা রাখ। কাল আমি আবার আসবো অ্যাঁ। একটা ঘর দেখে তোকে নিয়ে যাবো কেমন।

—বললে নাতো বাচ্চা কেমনটা হয়েছে? দশটাকায় কি হবে। একটা বড় পাত্তি দিয়ে তোমার ব্যাটার মুখটা ভাল করে দেখে যাও। আর হাসপাতালের খাতায় ওর নাম, বাপের নাম ভাল করে নিকিয়ে দিয়ে যাও। তা না হলি কাল সকালেই আমি বলরামদার কাছে জাহাজে এই বাচ্চা লিয়ে হাজির হবো।

যুধিষ্ঠিরের সারা শরীর অবশ হয়ে আসে। এত ভয়, এত আতংক, জীবনে নিজের প্রতি এত তীব্র ঘৃণা এর আগে কোনদিন সে অনুভব করেনি। এখানেও বলরাম। বলরাম তার চিরশত্রু। শুধু বলরাম নয় ঐ সাংঘাতিক মেয়েমানুষটা যদি ঐ রক্তের ঢেলাটাকে নিয়ে জাহাজে সবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে? সে কোথায় দাঁড়াবে? এতদিনে নিজের পরিচয়টা পরিষ্কার হয়ে আসে তার কাছে? অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল এই পৃথিবীতে তারও একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে। এখন কি করবে সে। হত্যা না আত্মহত্যা। না চাকরী ছেড়ে পালাবে? কোথায় পালাবে সে? যে ক্ষুধার জ্বালায় দ্রৌপদী গ্রাম থেকে শহরে এসেও নিস্তার পায়নি। বেচতে হয়েছে ইজ্জত। তাঁরও পালিয়ে বাঁচার রাস্তা নেই। তাকে ঘিরে ধরেছে হাজারও দুঃশাসন। তার বক্ষোরক্ত পান করবার জন্যে চারিদিক থেকে তেড়ে আসছে হাজারও দুঃশাসন। বলরামই পারে দ্রৌপদীর এ অমর্য্যাদার অপমানের শোধ তুলতে। সেই পারে দুঃশাসনকে প্রকাশ্য রাজপথে ফেলে তার বক্ষোরক্ত পান করতে। বলরাম প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। যে শিশু অনাদরে লাঞ্ছিত মাতৃজঠোর থেকে অতিরিক্ত পাপের বোঝার মত নিঃস্ব, রিক্ত এই যন্ত্রণার পৃথিবীতে প্রতারিত হবার জন্যে জন্ম নিচ্ছে— তাকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নেবার কথা নিশ্চয় লেখা আছে বল-রামদার কেতাবে।

এতক্ষণ যুধিষ্ঠিরের মৃত পাংশুল মুখের দিকে তাকিয়ে স্বোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দ্রৌপদী। বাচ্ছাটাকে কোলে তুলে নেয়। অযত্ন লালিত এলোচুল হাতে জড়িয়ে খোপা বাঁধতে বাঁধতে গরবিনী স্থির দৃষ্টিতে ওরদিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে—দেখলে তো বাবু তোমাদের দেওয়ালটা শুধু লম্বা চওড়াই দেখতে। ধাক্কার মত ধাক্কা মারতে পারলে কেমন ধসে পড়ে?

চিরাগ

মি. ত্রিলোকী চাঁদ কাপাডিয়ার স্ত্রী মিসেস প্রেমামালিনী কাপাডিয়ার সারাদিনে বিশেষ কোন কাজ থাকে না। রান্নার তদারক, ঝি চাকরের তদারক; গার্ডেন আর ঘর দুয়ারের তদারক করে সকালটা কাটে বটে কিন্তু নির্জন দুপুর অসহ্য। এত বড় বাড়িতে ছেলে মেয়ে স্কুলে বেরিয়ে গেলে স্বামী তার ব্যবসার কাজে বেরিয়ে গেলে তিনি একাবারেই একা। এই একাকিত্বকে কাটিয়ে উঠার কোন রাস্তাই তার ভাল লাগছে না। দুপুরে গাড়ি নিয়ে সিনেমায় এই গরমে একটুও ভাল লাগে না। বন্ধু বান্ধবীরাও যে যার জীবনে এনগেজড। কাউকেই কাছে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ক্লাব বা নাইট ক্লাবে আড্ডা ছেলে মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকতেই হয় কারণ ওদের আন্টি আসে পড়াতে। তারপর স্বামী যদি ফেরে ড্রিংক করে তাকে সামলাতে গিয়ে দিনরাত দুটোই ফুরিয়ে যায়। এটা বালিগঞ্জ বা পার্ক এভিনিউ নয় যে সংগী সাথীদের সংগে ফূর্তি করে দেহ মনের স্বাস্থ্য বজায় রাখবে।

আজকাল কেন জানি ওসব ভালও লাগে না। ক'দিন ধরে মিসেস কাপাডিয়া তাই ভেবে চলেছেন কি করা যায়। এমন একটা কিছু করতে হবে স্বাধীন নিজস্ব কিছু। কোন ব্যাপারেই তিনি কারু থেকে পেছিয়ে পড়তে চাননা। বয়সও তার তেমন একটা হয়নি যে তিনি বুড়িয়ে গেছেন। এখনও ইয়ং। এখনও সব ব্যাপারে সজীব ও সতেজ। বালিগঞ্জ সার্কেলে—ক্লাবে, পিকনিকে, ফ্যামিলি ফেয়ারে, ফ্যাসন প্যারেডে সবাই তাকে রেসিং হর্স বলেই জানতো। তিনি ছিলেন সব কিছুর মধ্যমণি। অবশ্য সেটাই তার স্বামীর ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। ছেলে মেয়ে

হবার পর এখন উভয়ের মধ্যে আপোষ হয়ে গেছে। এর মধ্যে বয়সটাও একটু বেড়েছে! বয়সের অভিজ্ঞতায় উচ্ছাসটাও একটু কমেছে! স্বামী এখন কি একটা স্বাধীন ব্যবসায় নেবেছে। কয়েক বছরের আমদানীতে জোয়ার বয়ে গেছে। অবশ্য এর পেছনে সিংহানিয়া পরিবারের (তার বাপের বাড়ীর) দানও আছে। তাই ওরা বেহালা অঞ্চলের উপনগরে নতুন বাড়ি করে বালিগঞ্জ ছেড়ে চলে এসেছে। ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হলেও মিসেস কাপাড়িয়া মা হতে চেয়েও ঠিক পাচ্ছেন না। বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেলেও দেহটা তার পঁচিশের কোটা পেরোতে চাইছে না। দেখে মনে হয় ভরা ভাদরের জল টলটল দামাল নদীর পরিপূর্ণতা দিয়ে ভরা।

মিসেস কাপাড়িয়া এখানে এসে নিজেই বাজার করেন, লণ্ড্রিতে যান পায়ে হেঁটে। সন্ধ্যেবেলা কেনাকাটা করতে একাই বেরহন। বাংলাটা মোটামুটি ভালই বলছেন আজকাল। আশ-পাশের দু'চারজনের সংগে আলাপও হয়েছে। কেউ কেউ টি. ভি. দেখতে এসে চা, সন্দেশ, স্যাণ্ডউইচ, অরেঞ্জ কোয়াস দিয়ে সাদরে আপ্পায়িত হন। জলসা হলে পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে টিকিট নেন। পাড়ার প্রফেসর চ্যাটার্জী, মিসেস বুলবুল বিশ্বাস, এমন কি থানার বড়বাবু ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মশাইরাও তাকে মাঝে মধ্যে দর্শন দেন। আপাততঃ তিনি একজন বিশিষ্ট লেডিতে পরিগণিত হয়েছেন। তার লালিম ঠোঁটের হাসি, বুক চলকানো রক্তে দোলা লাগানো আকর্ষণ মন কাড়ে অনেকের। মি. কাপাড়িয়া স্ত্রীর এই আচরণে মনে মনে অবাক হন। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। একদিন মি. কাপাড়িয়া স্ত্রীকে জিগেস করেন—মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা করতে চাইছ মাই ফেয়ার লেডি?

হাসেন প্রেমা কাপাড়িয়া। স্বামীর দিকে তাকিয়ে গর্বের সংগে বলেন-ভেবেছ তুমি একাই স্বাধীন ব্যবসা করে গাড়ি বাড়ি আর চিড়িয়া পুষবে। আর আমরা কবুতরের মত সোনার ডিমে তা দিয়ে সুখে দিন কাটাবো?

—কি করতে চাও বলো, কিভাবে তোমায় আমি সাহায্য করতে পারি ডিয়ার? সেদিন রাস্তায় এক ভদ্রলোক বললেন আপনিতো মিসেস কাপাডিয়ার হাজব্যাণ্ড? আমি অবাক। পেছনে সি. আই. ডি লাগলেও এত অবাক হতাম না।

—তারপর?

—ভদ্রলোকের সাহস আছে।

—তারপর।

—তারপর থেকে আমি ভাবছি বেহালাটাকে তুমি বালিগঞ্জ বানিয়ে ফেলবে নাকি?

—তোমার কথা শুনে আমার একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে।

—খাও!

—না থাক্। এই শোন, আমার মাথায় একটা—পরিকল্পনা এসেছে জান।

—কত লাখ টাকার স্কিম্?

—নো জোক প্লিজ। দেখো আমি একটা কিছু করতে চাই।

—বেশ তো করে ফেলো।

—তুমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছ না। আমি চাইছি একটা নতুন কিছু করতে। অবশ্য মনিটারী বেনিফিট ফিউচারে অবশ্যই আছে। একতলার এতবড় এপার্টমেন্ট আমাদের মত ছোট ফ্যামেলির কোন প্রয়োজন নেই। বাড়ির পজিশনটাও খুব সুন্দর। এখানে একটা কিছু গড়ে তুলতে পারলে—কি করা যায় বলতো?

—আমি বলবো?

—বারে তোমাকেই তো জিগেস করছি।

—এখানে তুমি একটা রেষ্টুরেন্ট কাম বার গড়ে তুলতে পারো। অথবা উষার সেলাই মেসিনের শো রুম।

—আরে নানা—

—তাহলে ইচ্ছে করলে তুমি এখানে একটা লেডিস পারলার—

—বোগাস।

—এবার তুমিই বলো তাহলে

—আমি কি ভেবেছি জান? এখনই ভেবেছি বল্লে ভুল হবে। ছোট বেলা থেকে এই জিনিষটাই স্বপ্ন দেখে এসেছি। তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পাচ্ছি না।

—তোমার ভবিষ্যৎ ভালো আছেতো? আরে আরে কি হলো কোথায় চল্লে এ প্রেম?

—আমি শুতে যাচ্ছি। ডিসটার্ব করো না।

—রাগ করলে ডিয়ার?

রাত অনেক হয়েছিল। চাকর বাকরেরা যে যার শুয়ে পড়েছিল ছেলে মেয়েও ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রেমা কাপাডিয়াও ছেলেমেয়ের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেন। মি. কাপাড়িয়া বুঝলেন শনিবারের রাতটা মাঠে মারা গেল। রেসের মাঠেও আজ তার ভরাডুবি হয়েছে। এই মেয়েমানুষকে নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই। যেমন সোজা সরল তেমনি অবুঝ। বোঝে শুধু আমোদ ফূর্ত্তি। জানে শুধু অবাধ মেলা মেশা। ছেলে মেয়ে দুটো হওয়ার পর থেকে যাও বা একটু পোষ মানানো গিয়েছিল, বেহালার বাড়িতে আসার পর বেশ কিছু দিনের আচরণে মনে হচ্ছে ও আবার প্রাক্‌যৌবনের অবাধ স্বাধীন রোমান্সের নেশায় গা ভাসাতে চাইছে। হয়তো তা নাও হতে পারে। রোমান্স তো বৈষয়িক সুখের স্বাদ দেবে না। এনে দেবেনা বিনা পরিশ্রমের সচ্ছল নিরাপত্তা। মি, কাপাডিয়া আয়নায় মুখ দেখতে চাইলেন। তারও সক্ষম স্বাস্থ্যের জলুস এখনও অটুট। এই সব উদ্বেলিত দোদুল্যমান নারীত্বকে সুখের সহচর্য্যে ভরিয়ে দিতে এখনও তিনি অনবদ্য। তবে কেন মনে এ সন্দেহের কুহক? তাজা রেসের ঘোড়ার চাই অভিজ্ঞ দুর্জয় জকি। তাকে বসে আনতে, বাজি জেতাতে যে কলা-কৌশলের প্রয়োজন তাতো তার দেহমনে কমতি নেই।

সিংহানিয়া পরিবারের কাছে তিনি ঋণী। স্বনামে বেনামে ও:দের বহু শিল্প সংস্থার সংগে তিনি জড়িত। এই পথেই তিনি স্থায়ী ভাবে ভাগ্য লক্ষ্মীকে বেঁধেছেন তার বাহু পাশে। স্বনির্ভর বানির্জ্যিক বুদ্ধির প্রয়োগে সার্থকতার চৌরাস্তায় হাজির। অনেক রাজা উজিরকে ইতিমধ্যেই তিনি কবজায় এনেছেন। দাবার ছক সাজানো, ওস্তাদের নজর রাজা মন্ত্রীর দিকে। কোন সরকারই স্থায়ী নয়। আসমানের রং পাল্টায়। সরকার উল্টে পাল্টে যায়, সাদা চাঁদী কালো হয়। কালো চাঁদী ঘর আলো করে, এ হুকুমৎ কে পাল্টাবে? লাখোরুপিয়ার খোয়াব তার পায়ের তলায় মাটি এনে দিয়েছে। আমদানী রপ্তানীর বাজারে তার যাতায়াত কারু চেয়ে কমতি নেই। কাল গুরুজির কাছে একবার যাওয়া দরকার, নীলা, মুক্ত, হীরে পান্না গ্রহ শান্তির সবদিকেই আট ঘাট বাঁধা ছিল তবুও গদী উল্টে গেল, কারবারে লাল বাতি জ্বলতে দশচক্রের গনণায় একটু এদিক ওদিক হলেই কিস্তিমাৎ।

শনিবারের রাতটাই মাঠে মারা গেল। কাল নেপাল থেকে দু'পেটি গাঁজা আফিম আসছে। দমদম হয়ে মালটি হাত ফেরতাই বাইরে বেরিয়ে যাবে—লাখো রুপিয়া নিট 'নাফা'। 'হাম দো তোমদো'র থিওরী কি শেষে এক লেগে ঝাড় খেয়ে যাবে। প্রেমা স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছে তিনিও স্বপ্ন দেখতেন টাটা, বিড়লা, গোয়েংকা নাহোক বাজাজ বাজুরিয়া হবার। দিল্লী বোম্বাই ফেরৎ কনভেন্টে পড়া প্রেমা কলকাতার বাজারে তাকে টপকে যাবে। একের পর এক ডানহিল পুড়ছে, একটু একটু করে শেষ হচ্ছে একটা পুরো হুইস্কির বোতল, আগুন জ্বলছে ত্রিলোকী চাঁদের বুকে, লোভ লালসার আগুন। জীবন নিয়ে জুয়া খেলা অনেক দিন হলো। মারকিট বড় মন্দা। সামলে চলতে হচ্ছে পদে পদে।

'জ্যোতি বাসু তোমার দাম কে দেবে? এটা ইংলণ্ড আমেরিকা

নয়—বড়বাজারওলারা খুন চুষে চুষে সব ছিবড়ে করে ফেলছে। আদমীকে পায়জামা বানিয়েছে 'নাফা'।

'বাবুর বরাত বড় মন্দ।' কোটি কোটি টাকার মালিক খোয়াব নিয়ে কারবার করেনা। সারারাত জেগে জেগে কালো টাকার বাচ্চা পাড়ে। বাংগালী বাবুরা শিক্ষিত, কুরুসিতে বসে লেখাপড়ার কাজ করতে ভালবাসে। নিউসপেপার পড়ে। কোর্ট কাচারীতে টু'পাইস্ বা হাতে ধরিয়ে দিলে তাদের কেনা যায়। বাবুদের কাধে বন্দুক রেখে সিন্দুক ভরো, লড়িয়ে দাও টক্কর, মজা লোটো, মজা দেখো, মজাদার দুনিয়াটা তুলে ধরো ওনাদের চোখের পরে তারপর 'জি হুজুর' 'বাবুজি'র মস্কা পালিশে মনে হবে এ মজাদার দুনিয়াটা ভারি খুবসুরৎ' সবই তুমার, স্রেফ চাবি কাঠিটা হামার। সিংহানিয়াদের ওখানে তার যাতায়াত ছিল ভাই ব্রাদারের মত, বোট ক্লাবেই প্রথম আলাপ প্রেমার সংগে। তারপর মহব্বৎ। সাদি। দেরী করেনি ত্রিলোকীচাঁদ পাকা খেলোয়াড়ের মতই ওর অনিচ্ছাকে নস্যাৎ করে পয়লাই গেঁথে ফেলে প্রেমাকে। কবুতর আর কি পারে আকাশে উড়তে? পরপর এক ছেলে এক মেয়ে ত্রিলোকী চাঁদের। মেয়েটা হয়েছে ওর মায়ের মতই গোলাপ বাগের বুলবুলি। ঘর আলো করে দিয়েছে। আর ছেলেটা তার জাঠ রক্তের উত্তরাধিকার। যতই সেণ্ট টাইপ স্কুলে পড়াও শেষ পর্যন্ত হয়তো টানামালের কারবার দিয়ে শুরু করবে জিন্দেগী। ত্রিলোকী চাঁদ নিঃশব্দে বাত রুমে প্রবেশ করে। রাত ভোর হয়ে আসে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে ড্রয়িং রুমে এসে দাঁড়ায় প্রেমা। চোখে পড়ে এ্যাসট্রেতে পোড়া ডানহিলের স্তুপ, একটা পুরো হুইস্কির খালি বোতল। নিজেদের বেডরুমে উঁকি মেরে দেখলে যেমনকার বিছানা তেমনি নিঃভাজ। তার মানে ত্রিলোকী নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছে। লজ্জিত প্রেমা। বহুদিন বাদে সে তার সন্তাদের কাছে বড় শান্তিতে ঘুমিয়েছে। ঘুমের প্রশান্তিতে তার মনের

মালিন্য ধুয়ে গেছে। শীতল হয়েছে তার যৌবনের তাপ। দেহ সান্নিধ্য সুখ তপ্ত দেহমনকে যে তৃপ্তি দেয় তার চেয়ে সহস্রগুণ আপন সন্তানের পবিত্র বাৎসল্যরস কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছে তাকে। এস্বাদ অনাস্বাদিত অপূর্ব। ত্রিলোকীর কাছে এব্যাপারে সে কৃতজ্ঞ। আজ আর তাকে বাদে দিয়ে নিজেকে আলাদা করে ভাবা যায় না আপন সন্তানদের দিকে তাকিয়ে আজ তাকে প্রতিটি পদক্ষেপেই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। অতিত বর্তমানের সংগে এ ভাবনার কোন সংগতি নেই। উচ্চশিক্ষা দিলেও উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া সংস্কার মুছে যাবার নয়। তারও যায়নি। বালিগঞ্জ, পাম এভিনিউতে ক্লাব, পার্টি, পিকনিক, নাইট ক্লাবের ফ্যাসন প্যারেডের প্যাশান গেমে মত্তমন প্রমত্ত জীবন এসব কথা ভাবায় নি কোনদিন। বাৎসল্যরসের কোন ঠাঁই ছিল না সেদিনের যৌবনমত্তা প্রমোদ চঞ্চল সেই মনে। পিতা, মাতামহের সেই গদীর লোভ আর 'নাফার' পেছনে ছুটে চলা ছাড়া ওরাও বড় হয়ে আর কিছুই শিখবেনা। মানুষের জানমালের, ইনসানের কানাকড়িও দাম ঐ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত মন দেবেনা। টাকা দিয়ে গায়ের জোরে কিনে নেবে দুনিয়াটা। গোলাম বানিয়ে ফেলবে গোটা দেশকে। এইসব ভেবেই তিনি তার মধ্যেকার অপরিণত ব্যক্তিত্বকে নিজে হাতে গড়তে চাইছেন নতুন করে। মাতৃত্ব নতুন করে তার মনকে জাগিয়ে তুলছে।

সে অস্থির আনন্দের বাইরে কোন উচ্ছাস আবেগ নেই। সিংহানিয়াদের আওতার বাইরে তিনি নিঃশব্দে কৌশলে নিজেকে টেনে আনতে চাইছেন। প্রতিদিনকার জীবনে তাই তিনি একাই পথে নেবেছেন নতুন করে পথ চিনতে। ছেলেমেয়েদের স্কুলের গাড়িতে তুলে দিয়ে অবাক চোখে চলমান জীবন স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পায়ে হেঁটে বাজার করেন, লণ্ড্রিতে যান, লাইন দিয়ে অচেনা মানুষের ভিড়ে বাংলা ছবির টিকিট কাটেন, কষ্ট করে লজ্জা অহমিকা কাটিয়ে আশপাশের প্রতিবেশীদের সংগে

আলাপ করেন। গাড়ি না নিয়ে ভিড় বাসে-ট্রামে বালিগঞ্জ চৌরঙ্গী যাতায়াত করেন। ইতিমধ্যেই আলাপ হয়েছে প্রফেসর চ্যাটার্জীর সংগে। তরুণ অধ্যাপক কথা দিয়েছেন তাকে বাংলা শেখাবেন। মিসেস বুলবুব বিশ্বাসের সংগেও আলাপ হয়েছে। রাস্তার জঞ্জাল, ড্রেন, ভোটার লিষ্টের ব্যাপার নিয়ে আলাপ হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ভবেশ রায়ের সংগে। বাড়িতে ঢিল পড়ার ব্যাপার নিয়ে থানার বড় বাবুর সংগেও পরিচয় হয়েছে। এইভাবেই শ্রীমতী প্রেমা মালিনী কাপাডিয়া জনমনে তার প্রভাব ফেলছেন। তার মনজাত পরিকল্পনা সুন্দরভাবে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। একপ্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ উনি জ্বালাতে চাইছেন। কোথাও টাকা কোথাও একঝালক সৌহার্দের মিষ্টি হাসি, কোথাও চোখে চোখ ফেলে আকর্ষনীয় মিষ্টি মধুভেজা দুটো কথা অনেককেই কাছে আনে, কাজে লাগা-বার পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজন। এখন বাকী শুধু ত্রিলোকীর সমর্থন। এখনও ত্রিলোকী সিংয়ের কাছে টাকার চেয়েও তার বৈচিত্রময় দেহ সান্নিধ্যের দাম অনেক। পরিকল্পনা মাফিক কাজের জন্যে অর্থ বা সামর্থের অভাব তার নেই। কিন্তু এই সব মানুষের নৈতিক সমর্থন ছাড়া এক পাও তিনি এগুতে চান না। বাংগালীদের আছে রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ, সত্যেন বোস থেকে সত্য-জিতের মত হাজারও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কিন্তু বড় বাজারওলাদের গান্ধী নেহেরু ছাড়া কেউ নেই।

ছেলেমেয়েরা বিস্মিত তাদের মায়ের আচরণে। ত্রিলোকী চাঁদ বিরক্ত। কি চায় এ আওরাৎ?

ব্রেকফাষ্টের টেবিলে সবাই ওরা মুখোমুখি বসে। মিসেস কাপাডিয়ার হঠাৎ মনে পড়ে কথাটা। মি. কাপাডিয়ার দিকে চোখ তুলে বলেন শোন, – দু'একদিনের মধ্যে আমার কয়েকটা প্রট্রেট চাই।

প্রট্রেট! কার? অবাক চোখে তাকান মি. কাপাড়িয়া, এ কণ্ঠস্বর

রীতিমত কর্তৃত্বের। একে উপেক্ষা করার কোন শক্তি নেই ত্রিলোকী চাঁদের। নারীর মধ্যে নারী যাকে চিনে ওঠা খুবই মুশকিল, অবহেলা করা বিপদজনক। বাধ্য হয়ে ত্রিলোকীকে স্ত্রীর দাবী স্বীকার করে নিতেই হয়।

—কিসের ফটো ?

—রবীন্দ্রনাথ টেগোর, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ। এবারে রীতিমত তার চেতনায় বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

—কেন ? আমাদের এপার্টমেন্টে তো গান্ধী, নেহেরু, লালবাহাদুর, গুরুনানকজি রয়েছে।

—ও সবচলে যাবে ওপরে তোমার বেড্রুমে। আমাদের মত ছোট ফ্যামিলির পক্ষে দোতলাটাই কাফি। একতলাটা আমার প্রয়োজন।

—হু ইজ বিবেকানন্দ মাম্মী। প্রশ্নকরে পুত্র রাজু।

—ওভি এক মহাজন স্থায় বেটা। দিখা নেহি বিবেকানন্দ গেলাস্ ফ্যাক্টরী ? ইনডাসট্রি ! উত্তর দেয় মি. কাপাডিয়া।

—রবীন্দ্রনাথ টেগর গ্রেট পোয়েট মাম্মী ?

—ইয়েস্ ! যাও বেটা রিডিং রুমমে যাও, আন্টি আয়া। ছেলে-মেয়েকে পড়ার ঘরে পাঠান প্রেমা।

—কি ব্যাপার প্রেম, কি করতে চাইছ বলতো ডিয়ার ?

—তুমি বলো।

—না তুমিই বলো।

—বলবো ?

—নিশ্চয়

ইঁদুরকে নিয়ে যেমন বেড়াল খেলে ত্রিলোকীর দুর্ব্বল বোকা সারল্যে চতুর প্রেমা সেই কৌতূহল নিয়ে ওরদিকে তাকিয়ে মজা অনুভব করে।

—বলবো পরে।

—কখন ?

—রাত্রে। কেমন

—প্রমিস্

—প্রমিস্। শোন আগামী টয়েন্টি ফিফ্‌থ বৈশাখ তুমি অবশ্যই একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে কেমন ! লোকাল কিছু V. I. P. কে ইনভাইট করেছি বাড়িতে একটা পার্টি দেব।

একথায় ত্রিলোকী হঠাৎ ভীষণ উৎসাহিত হন।

—আমিও তাই ভাবছিলাম। নয়া সালের বৈশাখের হালখাতার পার্টিটা গ্রাণ্ডে না করে বাড়িতে করলে কেমন হয় ?

—ওঃ বোগাস্।

—কেনো ? কেনো ?

—জান ঐ ডেটে কি ব্যাপার আছে ? পোয়েট রবীন্দ্রনাথ টেগোরের বার্থডে। আমাদের বাড়িতে সেলিব্রেট করতে চাই।

—উসমে ক্যায়া নাফা হ্যায় ?

—দেখো আমার একটা পরিকল্পনা আছে। বলো তুমি রাজি ?

—জরুর। লেকিন ইনভেষ্টমেণ্ট কত টাকার তো বললে না ?

—নো জোক প্লিজ, আমি উঠছি।

—বাট টু নাইট ইউ প্রমিস্ ?

—ইডিয়ট।

পঁচিশে বৈশাখের বিকেলে নবরূপে নবসাজে সুসজ্জিত হয়ে উঠে 'প্রেমলজ'। মিসেস কাপাডিয়া, তার তরুন বন্ধু প্রফেসর দেবাশিষ চ্যাটার্জী ও মিসেস বুলবুল বিশ্বাসকে নিয়ে ঘরবাড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে একটা উৎসবের রূপ দিয়েছেন। একতলার যাবতীয় আসবাবপত্র ইতিমধ্যে সব ওপরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রেমাকাপাড়িয়ার পরিকল্পনা মত বাংলার মণিষীদের প্রতিকৃতি দেওয়াল জুড়ে সাজানো হয়েছে।

এ ছাড়াও তার ছেলেমেয়ের আঁকা কিছু কাঁচা হাতের ছবিও দেওয়ালে ঠাঁই পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাংগ তৈলচিত্রকে

ফুললতা পাতা ও নানা রঙ্গিন আলোয় সুসজ্জিত করা হয়েছে। ঘরের এক কোন থেকে ষ্টিড়িও রেকর্ড প্লেয়ারে একের পর এক ভাব-গম্ভীর স্বরে রবীন্দ্র গীতি বেজে চলেছে। ঘরময় সুগন্ধী ধূপ, দামী আতর আর ইনটিমেট সেন্টের গন্ধে আমোদিত সমগ্র পরিবেশ। দামী কার্পেট, আর দরজায় কিংখাব মখমলের ঝালরে রাজকীয় সৌন্দর্য্যের আহ্বান। তিনজনার মিলিত প্রয়াসে একটি সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সূচী তৈরী হয়েছে। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ষাট সত্তর জন নিমন্ত্রিত মানুষের সমাগম হয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি করা হয়েছে এ বাড়ির গৃহ কর্ত্তাকে তার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। প্রধান অতিথি স্থানীয় থানার বড় বাবু।

প্রধান বক্তা :—অধ্যাপক দেবাশিষ চ্যাটার্জী
ও প্রেমা দেবী।

দেবীই বটে আজ প্রেমামালিনীকে সত্যিই দেবীর মতই রূপ-লাবণ্যে অনবদ্য মনে হচ্ছে। তার আজকের অভিনব এ রূপ দর্শনে মি. কাপাডিয়া পর্যন্ত মুগ্ধ। বাংগালী বড় খানদানের মহিলা বধূর উৎসব সাজে সুসজ্জিতা প্রেমাকে নিজের স্ত্রী ভাবতে বেশ কষ্ট হয় ত্রিলোকী চাঁদের। নিজের স্ত্রীকে অভিনব এ রূপে বৃহত্তর কোন জনসমাবেশে মি. কাপাডিয়ার পক্ষে চিনে নেওয়া অসম্ভব। আজ তার মনে হচ্ছে জীবন সম্পর্কে যে গর্বান্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে বিকৃত কৃত্রিম ধ্যান-ধারণায় এদের তিনি চালিত করে এসেছেন তাবজন্যে তাকে একদিন অপরাধির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্ত্রী-পুত্রের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে। তাকে আবার এই সভারই সভাপতি করা হয়েছে। তার মানে তাকেও কিছু বলতে হবে। তার গলা শুকিয়ে আসে। হাত পা কাঁপতে থাকে, কোথা থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা এসে তার বুকে কাঁপন জাগিয়ে তুলছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে অভ্যাগতদের সাদর সম্ভাষণ জানান। ঘন ঘন ডানহিল পোড়ে। গোপনে আধ বোতল হুইস্কি দিয়ে গলা ভিজিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কি বলবেন

তিনি। আজ পর্যন্ত তিনি যা জেনে এসেছেন, যাকে জীবনের ধ্রুবজ্ঞানে আঁকড়ে ধরে কতৃত্ব করে গর্ববোধ করেছেন সে অভিজ্ঞানের একটা কানা কড়িও দাম নেই এখানে। সম্পূর্ণ এক অজানা জগৎ সম্পর্কে অহেতুক ভয়ই বা তিনি কেন পাচ্ছেন নিজের কাছে তারও কোন সদুত্তর নেই। এত নিরুপায় এত অসহায় তিনি কোনদিনই বোধ করেন নি। যে বিষয়টি ছিল দিল্লাগীর তা যে এত ভীষণ ভয়াবহ হয়ে উঠবে কে জানতো! তাহলে তো তিনি ভোর বেলাই বাড়ি থেকে কাজের অছিলায় গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতেন।

সভার কাজ সুরু হয়ে যায় দশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে শংখ্য ও উলুধ্বনীর মধ্যে দিয়ে কবি বন্দনা শুরু হয়। কবি প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করানো হয় ছোট্ট রেহানা কাপাড়িয়াকে দিয়ে। কাপাড়িয়াদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের পারিবারিক জীবনে এ পরিবেশ কল্পনাও করতে পারে না। সবার সংগে মুক্তমন নিয়ে মিশতে পেরে ভীষণ খুশি ওরা। নিমন্ত্রিত অতিথিরাও মর্য্যাদা সম্পন্ন এমন প্রাচুর্যময় পরিবেশে সাদরে আমন্ত্রিত হয়ে নিজেদের ওজন সম্পর্কে নিজেদের ভাষা ও গান সম্পর্কে বেশ রীতিমত সচেতন হয়ে উঠেছেন মনে মনে।

কিছু গান ও আবৃত্তির পরে প্রধান বক্তাকে আহ্বান করা হলো! সপ্রতিভ তরুণ-অধ্যাপক বিদগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে চাইলেন নিজের মনে, মনে মনে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেন নিজেকে।—

প্রধান বক্তা:—শ্রীমতী প্রেমাদেবীর নির্ভিক প্রচেষ্টায় এই সুন্দর রাজকীয় পারিবারিক পরিবেশে রবীন্দ্রচর্চ্চার সুযোগ পেয়ে আজ আমি গর্বিত। সেজন্য প্রেমাদেবী ও মি. কাপাড়িয়াকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। জানিনা কোন অবাংগালীর ঘরে এমন করে কোথাও কবি বন্দনা অনুষ্ঠিত হয় কি না। এদেশে রবীন্দ্রনাথ আজও

ব্যর্থ। নিরক্ষরতা, দারিদ্র, ক্ষুধার, অবশান যতদিন না হচ্ছে ততদিন রবীন্দ্রচর্চা--সোনার হরিণের পেছনে দৌড়নোর সামিল। জানি না শ্রীমতী প্রেমা দেবীর এ আনন্দ উচ্ছ্বাস কতখানি সৎ ও আন্তরিক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভালবাসে গান, নাটক, ছবি আঁকা—সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশে কতদিনে এ জিনিষ সম্ভব হবে জানি না। ছোটদের কাছে ধাপ্পা দিয়ে লাভ নেই, গালভরা মিষ্টি কথায় অভিশপ্ত এজীবনকে পাপাষক্ত করা হবে তার বেশী নয়। শ্রীমতী প্রেমার বিদ্যালয় গড়ে তোলার এ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে কথা দিচ্ছি সর্বতোভাবে সাহায্য করার। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

—নমস্কার।

প্রধান অতিথি মাননীয় সুধীর চাকলার, থানার বড় বাবু।

প্রধান অতিথি :—মাননীয় ভদ্রমণ্ডলী ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা। আমি ভাই বক্তা নই। আমাকে এ আসরে যে ভাবে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে তা আমার যোগ্যতার অধিক। জীবনে এই প্রথম হয়তো এই শেষ সুযোগ। চাকরীতে আমি আর বেশীদিন নয়। দুদিন পরে আপনাদের মত আমারও কোন দাম থাকবে না। পুলিস মানেই অপরাধ ও অপরাধ দমনের যন্ত্র। আমরা সবাই যে অসৎ তা নয়। আমাদের তেমন করে ভয় পাবার কিছু নেই। চারদিকে যেমন সমাজবিরোধী বেড়েছে আমাদের কাজও বেড়েছে। এসব রবীন্দ্র-টবিন্দ্র করার সময় আমাদের নেই। ছোট ছেলেরা ছোট থাকতে থাকতে আমি বলি তোমরা রবীন্দ্রনাথের গান. গল্প, ছবি পড়ে নাও যতটা পার। তোমরা বড় হলেই আমাদের চিন্তা। কারণ ইতর, ভদ্র. শিক্ষিত সব ঘরেই মাস্তানের সংখ্যা বাড়ছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তেমন কিছু বলতে পারলাম না—জ্ঞান কম।

সব কিছুই বেশ সুন্দর লাগছে। মিসেস কাপাড়িয়া দরাজ হাতে খরচা করেছেন—সব বেশ পবিত্র। সভা শেষে আপনারা কেউ চলে যাবেন না। শ্রীমতী কাপাড়িয়া প্রত্যেকের জন্যে জলযোগের ব্যবস্থা করেছেন।

—নমস্কার

এইবার এই অনুষ্ঠানের পরিচালিকা শ্রীমতী প্রেমামালিনী।

প্রেমামালিনী :—মহাশয়েরা,

আপনেরা হামার নমস্কার নিবেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তোমরাভি হামার—উসকো কেয়া বোলা যাতা হ্যায় মি· চ্যাটার্জী? —'ভালবাসা'।

ইয়েস ভালবাসা নেবে। হামি ভাল বাংলা জানে না। হামি টেগরের বিশেষ কোন কেতাব পড়ে নি। সেজন্যে হামি বহুৎ সরি। লেকিন হামি বাংলা শিখে সব পড়বে। হামার বিদ্যালয়ে গান, নাচ, ছবি আঁকা ভি শিখাভে। ইংলিশ মিডিয়ামে সব শিখাভে। আপনেরা এসেছেন হামি আপনাদের কাছে—আইমিন বহুৎ ঋণী।

—নমস্কার।

এবার সভাপতির ভাষণ। মি· কাপডিয়া উঠে দাঁড়ালেন। ধুতি চাদর পরা মি· কাপাডিয়ার মুখের চেহারায় একটা বিবর্ণ অপরাধীর অস্পষ্ট ছাপ খুব খুঁটিয়ে না দেখলে ধরা পড়বে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, আদালত কক্ষে বহু মানুষের বহু জোড়া কৌতুহলি চোখের সামনে শেষ বিচারের আশায় বিচারকের সামনে অপরাধীকে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। আত্মপক্ষ সমর্থনে। কেজানে বিচার শেষে কোন স্বাধীন সভ্যদেশে এই ধরণের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে প্রকাশ্য রাজপথে ল্যাম্প্‌পোষ্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয় কিনা!

—নমস্তে।

হামি বাবু আপনাদের মত একঠো ছোটিমোটি আদমি আছে। টেগর সাহাব জরুর এক বহুৎ জবরদস্ত পোয়েট আছেন। কবিতা

ববিতা খুউব ভাল চিজ আছে। লেকিন বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। তাইতো এসব মায়ফিল সম্ভব হচ্ছে। গান্ধীজী বিশ্বোয়াস করতেন আমীরওকো সাথ গরীবওকো হৃদয়ের পরিবর্তন। লেকিন হামি বলি এ বহুৎ গলদ বাত। খুন চুষনে বালে, নাফা বানানে বালে, বড়ি বড়ি মোকাম পর রহেনে বালে লোক ও ইনসানিয়াৎ কি পহেলে নম্বারকা দুষমন। রবীন্দ্রনাথ-টেগর বেংগলী। বাংগালী লোক হিন্দুস্থান মে পহেলে নম্বার কা ইনসান কি পয়দাবার। হামারা ওয়াইফ ঐ ইনসানিয়াৎ কি রাস্তা পর চালনে কো কসিস্ করতা হ্যায়। কা মালুম আখেরিমে উনকো কেয়া নতিজা হোগি? ভাইলোক উনকো সাথ দিজিয়ে এহি হামরা আপসে আপিল হ্যায়।

—নমস্তে

লাসঘর

যত্তো আপোদ ! ঐ আবার একজন এলেন। নিন এখন সামলান। মানিক তাকালো সিষ্টার মিস্ দাসের দিকে। ওয়ার্ড বয় মানিকের দিকে তাকালেন সিস্টার অপরাজিতা। চোখে বিস্ময়, মুখে হতাশা।

পরাশরবাবুকে এর্মাজেন্সির টেবিলে শোয়ানো হলো। সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

'মানিক ডাঃ চ্যাটার্জীকে ডাক তাড়াতাড়ি।'

'থামুন তো। সব জায়গায় মাস্তানী। মরুক, দেবো শালাকে লাস ঘরে পুরে।'

'কি যাতা বলছ ! বুড়ো মানুষ বলা যায় না বেঁচেও যেতে পারে। যাও যাও দেরী করো না।'

কেরোসিনের লাইন সেখানেও ছুরি, বোম, লোহার রড।

বুড়ো মানুষকে নিয়ে কি যা তা বলছ। যাও না প্লিজ্ তাড়াতাড়ি।

'বুড়ো মানুষরাই তো পয়দা করেছে যত চোর, জোচ্চর, গুণ্ডা, বদমাস।'

'তোমার বাবা হলে কি তাই বলতে মানিক ?'

পুলিশ কেশ। বাবার বাবা এলেও ছাড় নেই। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। বাপ যদি ঠিক মত খেতে পরতে দিতো, স্কুল কলেজে ঠিক মত পড়াতে পারতো তাহলে কি আর হাসপাতালে ষ্টেচার বওয়ার কাজ নিতাম—জল, বালতি তুলো, পুঁজ রক্ত, মরা মানুষ, লাস ঘর। তাহলে ডাঃ মানিক চ্যাটার্জী এম, বি, বি, এস।

ডাঃ চ্যাটার্জী সোজা ও. টি. থেকে এমার্জেন্সীতে এসে থমকে দাঁড়ালেন। সংগে একজন পুলিস ইন্সপেক্টর। সবাই চুপচাপ। ডাক্তার রুগীকে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করে হতাশ হলেন। নিঃশব্দে একটা ইনজেকশন্ পুস করলেন। ঘড়ি ধরে পালস্ দেখলেন।

তাকালেন পুলিস অফিসারের দিকে। বললেন—'জ্ঞানফিরলেও করার বিশেষ কিছু নেই। পেসেন্টের বাড়ির লোক কেউ এসেছেন? কেউ নেই? আই অ্যাম সরি। এই নিয়ে সতেরটা কেশ এলো। ঐ লেবুতলা লেনের কেরোসিন তেলের লাইনে মারামারি। এগার জনকে ফাষ্ট এড্ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনজনকে অবসারভেশন ওয়ার্ডে ভর্ত্তিকরা হয়েছে আর লাসঘরে পাঠানো হয়েছে দু'জনকে।

'কিন্তু ডাঃ'—ইন্সপেক্টর বললেন, 'এনাকে যে করেই হোক্ কিছুক্ষণ বাঁচাতেই হবে।

'ব্যাধি সৃষ্টি করবেন আপনারা আর বাঁচাবো আমরা!'

'ফর গড্সেক ডক্টর। একে বাঁচাতে না পারলে আমাদের চাকরী থাকবে না। আপনি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না একটি চোদ্দ পনের বছরের সুন্দরী ভদ্রঘরের মেয়ে কেরোসিনের লাইন থেকে মারামারির সময়ে মিসিং। মেয়েটি লাইনে এই বৃদ্ধের ঠিক সামনে ছিল। কেউ কেউ বলছে মেয়েটি ওনার আত্মীয়।

ডাঃ চ্যাটার্জী আর একটি ইনজেকশন পুশ করলেন বললেন —'আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুণ—জ্ঞান ফিরলে—এখন আপনার লাক। একেই বলে মানুষের জীবন নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি।' ব্যাপারটা সামান্য। এ ধরনের ঘটনা রোজই ঘটে থাকে। নেবুতলা লেনে কেরোসিনের লাইন হয়েছিল বিরাট। শহরে তেল পাওয়া যাচ্ছে না। লোডসেডিংএ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। চুরি ডাকাতি ছিনতাই খুনজখমের সংগে সংগে রেশন, কেরোসিন, চিনি আলু এমন কি ফুটবল খেলা নিয়ে মারামারি, খুন, মানুষ গায়েব আর লাশ গায়েবের ঘটনায় আবার শহর কলকাতা জমজমাট। নৈরাশ্য আর আতংকে আগুন ধরে গেছে মানুষের মনে। আগুন ধরে গেছে বাজারে। মানুষ গায়েব আর লাশ গায়েবের সাথে সাথে বাজার থেকে বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে মাল পত্তর। সুন্দরী রূপসী কলকাতা, উদ্যাননগরী কলকাতা,

সন্ধ্যা এলে কখনও রূপবতী জরতি, কখনও কালনাগিনী। বিষাক্ত নিঃশ্বাসে মানুষের জীবন সমুদ্র মন্থনে উঠছে কেবল গরল। 'Wel-come foreign visitors As a friend as a guest' সাইনবোর্ড পাল্টে গেছে। জাদু একটাই দিনকে রাত, রাতকে দিন করা। তারপর জাহান্নামে যাক দেশ, দেশের মানুষ। আসলি তখত রূপোচাঁদি। আরব দেশের ফ্যারাওরা আজ আর কাউকে তেল দিতে রাজি নয়। এদেশের মুকুটহীন সম্রাটেরা দেশটাকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। মারকিটের হালত খারাব। দেশজুড়ে মানুষ মারমুখী। মারমুখী জনতা-জনতা হাওয়ায় ভেসে গেছে। বলা যায় তলিয়ে যাচ্ছে। নেবু-তলা, কেয়াতলা, কেওড়াতলা চারিদিক নিঃষ্প্রদীপ। অন্ধকারের জীবেরা হাতে স্বর্গ পেয়েছে। সাতাত্তরের পর ওরা আবার ব্যাপক আকারে অন্ধকার গুহার অলিগুলি থেকে বেরিয়ে আসছে। আবার বারুদের গন্ধ, দেওয়ালের গায়ে রক্ত, মড়ার মাথা নিয়ে মিছিল, বাঙ্গালীস্থানের দাবী, দেশী বিদেশী নিয়ে দেশ জোড়া একান্নো না একাত্তরের শর্ত। এইসব অশুভ ধ্বনীতে ঘোষণা করছে দেশের অন্তিমকাল। বিজ্ঞানীরা বলেন কলকাতার বায়ুনাকি দূষিত হয়ে গেছে। লোকে বলে শোষণ করতে করতে গোটা দেশটাই নাকি পুঁতিগন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের মনে শান্তি নেই। পুলিসের চোখে ঘুম নেই। চক্রান্তের জাল পাতা দেশজুড়ে। নরমেদযজ্ঞে তাই মৃতদেহের পাহাড় জমছে এখানে ওখানে। ইন্সপেক্টর অলোক সরকারের মনে নানান চিন্তা। চাকরী বাঁচাতে মান ইজ্জত সবই যেতে বসেছে। পরাশর বাবুর জ্ঞান না আসা পর্যন্ত তার ছুটি নেই। বুড়োটা বেঁচে গেলেও বিপদ, আপদ মরলেও বিপদ। কোথা থেকে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে কে বলতে পারে। ইচ্ছে করে চাকরী বাকরী ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু পালাবে কোথায়? এযেন নিজের জালে নিজেই ঘেরাও হয়ে পড়েছেন। চাকরীতে ঘেন্না।

ডাক্তার চ্যাটার্জী অবশ্য ভাবেন অন্য কথা। হাসপাতালের ডাক্তারের চেয়ে পুলিসের চাকরী অনেক ভালো। এখনও তিন-চার বছর তাকে হাসপাতালে কাটাতে হবে। এতটাকা পয়সা খরচ করে ডাক্তারী পড়ে যদি বাঁধা মাইনের চাকর হয়ে জীবন কাটাতে হয় তার চেয়ে অভিশপ্ত আর কি আছে! একবার যদি বিদেশ থেকে ঘুরে আসা যেত। ইংলণ্ড আমেরিকা ঘুরে আসতে পারলে এদেশে প্রাইভেট্ প্যাকটিশে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। দেশ বটে একটা! পোকা মাকড়ের মত চারিদিকে গিজ গিজ করছে মানুষ। সব কিছুর দাম বাড়ছে মানুষের দাম কমছে। এখানে বুদ্ধি, বিদ্যে বিকাশের সুযোগ কোথায়? ভালো কাজের দাম কে দেবে? টাটা বিড়লার ঘরে জন্মালে এত ভাবতে হতো না। হাসপাতালের কাজে আবার সুনাম। নকশালরা ঠিকই চেয়েছিল বিপ্লব। একটা যুদ্ধ চাই। লোক সংখ্যা কমাতে চাই একটা দেশব্যাপি যুদ্ধ। চাই বিরাট ব্যাপক লোকক্ষয়। জন্মহারের তীব্রতা কমাতে যুদ্ধই একমাত্র বিকল্প। সেইজন্যে বন্দুকের নলই একমাত্র ক্ষমতার উৎস। যে দেশের মানুষ বোঝে না নিজের মংগল, যাদের চেতনার স্তর বলে কিছু নেই। দু'টো টাকা দিলে যাদের কেনা যায়, ক্রীতদাসের জীবনে যারা অভ্যস্ত, মার খেয়ে পাল্টা মার দিতে যারা শেখে না—তাদের সেবা? তাদের মরতে দেওয়াই উচিত, উচ্চাশার অপমৃত্যুকে মেনে নিয়ে এভাবে বেশী দিন চলা যায়? ব্যক্তিগত সততায় আজ আর মানুষের পেট ভরে না? গাড়ি, বাড়ি, টি,ভি, ফ্রিজ ও সুন্দরী রমণীর স্বপ্ন কোন বুদ্ধিজীবি না দেখে। একমাত্র প্রাইভেট প্যাকটিশেই তা সম্ভব। এর জন্যে অবশ্যই তাকে দু'চার বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে। মনের ঘৃণা মনে চেপে এভাবেই কাজ করে যেতে হবে। যত রাজ্যের নোংরা ব্যাপারের মধ্যে জীবনটা ক্রমশঃ জড়িয়ে যাচ্ছে।

এরপর? আমি বলি তবু কলকাতা কল্লোলিত। দুরন্তগতিতে

চলমান। নারকীয় জীবন যন্ত্রণা এখানে দুর্ব্বার। কারু সর্বনাশ কারু পোষমাস। পাঠককে কল্পনা করে নিতে বলি আপনার ব্যস্ত জীবনের পাশা পাশি অতিতুচ্ছ এই মামুলী ঘটনা যা ঘটছে ঘটবে এর মধ্যে থেকে শিক্ষা নেওয়ার মত মন ও রুচি হয়তো আপনার নেই। এ ঘটনা আপনার জীবনে অসামান্য পরিবর্ত্তন কিছু আনবে না। এ কাহিনী রাজ কাহিনী নয়। এতক্ষণের প্রতি-বেদনে ঘটনার আভাষ ইংগিত দেওয়া হলো মাত্র।

একজন রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তারবাবু কোন আশা দিতে পাচ্ছেন না। জ্ঞান না আসা পর্যন্ত পুলিশ অফিসার ভদ্রলোকও হাল ছাড়তে পাচ্ছে না ডাক্তারবাবুর অনেক চেষ্টার পর পরাশর বাবুর জ্ঞান ফিরে আসে। তাই দেখে ওয়ার্ড বয় মাণিকের চক্ষুস্থির। এতক্ষণ সবাই যার মৃত্যু কামনা করছিলেন সেই হেন পরাশর বাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। ইন্সপেক্টর নোটবুক নিয়ে তৈরী হলেন। কারণ অপরাধ বিজ্ঞানের প্রয়োজনে অতিতুচ্ছ ঘটনাও উপেক্ষার নয়। মানুষ মরে, খুন হয়, লাস ঘরে যায়, ফুল চন্দন দিয়ে চিতেয় উঠে-এসবে পুলিসের প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন তথ্যের এবং সুত্রের। কেন কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না, কারা এই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে, কারা মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছে, পুলিস রক্ষক হবে না ভক্ষক এসব বড় বড় কথা নিয়ে ভাবুক রাজনৈতিক নেতারা। রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ পুলিসকে মেনে চলতে হবে। রাজনৈতিক নেতারা নেপথ্যে কার নির্দ্দেশ মেনে চলবে? সে কথা কি পুলিশকে বলে দিতে হবে? ভারতবর্ষের চাকা ঘুরছে, চাকাঘুরছে পশ্চিম বংগের, চাকা ঘুরছে তাদেরও, চক্রবৎ জীবন পরিবর্ত্তনশীল। তা না হলে অতিতুচ্ছ নেবুতলা লেনের কোরোসিনের লাইনে মারা-মারি কি খুনোখুনি হলে তাদের কি আসে যায়। অতিতে হলে কোথায় ছাই গাদায় চাপা পড়ে যেত এসব ঘটনা। দিন পাল্টেছে, পাল্টেছে মানুষের মেজাজ মর্জি। সময় বিশেষে অতি

তুচ্ছ মানুষকেও সম্মান সমীহ করে কথা বলতে হচ্ছে। তুচ্ছ ঘঠনা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। এখন সব কিছুই ছাই চাপা আগুন। কেঁচো খুড়তে কখন যে সাপ বেরয় কে বলতে পারে। মৃত্যুকালিন মানুষের এলোমেলো খেলো কথার মধ্যে থাকে এমন অনেক সত্য, এমন অনেক দুর্বোধ্য অসাধারণ তথ্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুলিশকে তারই জন্যে ওত পেতে থাকতে হয়।

পুলিশের কাছে ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে ইতর বিশেষ কিছু নেই। ঘটনাঁর স্বার্থেই তার মূল্যায়ণ। তা না হলে কানাকড়িও দাম নেই। প্রয়োজনে অনেককেই ব্যবহার করতে হয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। ঐ বুড়ো যে মরবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। ওর মৃত্যুতে ওর পরিবার ছাড়া কারুরই কিছু এসে যাবে না। কেরোসিনের বেপাত্তা ডিলার জামিনে কোট থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে আসবে। সাক্ষীর অভাবে এসব কেস দু'দিনেই খতম হয়ে যাবে। গাড়ি গাড়ি কেরোসিন মাটির তলা থেকে প্রকৃতির বুক থেকে উঠে আসে মহাজনের ঘরে, পৌছবে মানুষের ঘরে অবশ্যই চড়া দামে। কে আর লোকশান করতে ব্যবসা করে। আবার ব্যবসার খাতিরে, অধিক মুনাফারলোভে লোড সেডিংএর সুযোগে কালোরাতের অন্ধকারে গোপন পথে চলে যাবে মাটির তলায়। সে সবের ঠিকানা সবই পুলিসের জানা। পুলিস তো প্রহরী। সব কিছুর ওপর তার নজর রাখতে হয়। উপরী আয়ের এসব ট্রেড সিক্রেট নিয়ে কি আর যত্রতত্র এ আলোচনা চলে। 'সততাই' মূলধন'—এ মূলধনকে সামনে নিয়েই তো খাদ্যদ্রব্যের মত তাদের অনেক কিছু হজম করতে হয়। শুধু চাকরীর খাতিরেই তা করতে হয়। পরাশরবাবু চোখ মেললেন। ডাক্তারবাবু নাড়ি দেখলেন। ইন্স্পেক্টরবাবু ঝুঁকে পড়লেন তার ওপর। পরাশরবাবু ভাববার চেষ্টা করলেন তিনি কোথায়। ইন্সপেক্টর অলোক সরকার তাকে পরম বন্ধুর মত মনে করিয়ে দিলেন অত্যন্ত বিনিত ভাবে,—মাষ্টার মশাই! এখন কেমন মনে হচ্ছে? কোন ভয় নেই আমরা আছি। আপনি এখন রীতিমত সুস্থ। কি বলুন ডাক্তারবাবু?
—'সেতো বটেই।' অবাক ডাক্তার চ্যাটার্জী? বলেন কি ভদ্রলোক? উনি এখন রীতিমত সুস্থ? ভীতিপ্রদ ব্যাপার। ডাক্তার হিসেবে মানুষ সম্পর্কে এও তার জীবনে আর এক অভিজ্ঞান। একটা মৃত্যু

পথযাত্রী মানুষ যে কিনা প্রচণ্ড প্রাণশক্তির জোরে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন! তাও হয়তো সামান্য সময়ের জন্যে। প্রতিটি মিনিটে ঘড়ি দেখতে হচ্ছে কখন ঘন্টা বাজবে, শেষ ছুটির ঘণ্টা, সব দেনা-পাওনা জ্বালা যন্ত্রণা পৃথিবীর এ প্রান্তে ফেলে রেখে যাবে ঘন্টা-ধ্বনীর সংগে সংগে চলে যেতে হবে আর-উনি কিনা বলছেন রীতিমত সুস্থ। লোকটা উম্মাদ না শয়তান। একেই কি বলে পুলিশ। দিনকে রাত, রাতকে দিন বানায়।

দুধ খাবেন স্যার? এই ভাই শোন!

ওয়ার্ডবয় মানিক এগিয়ে আসে। চোখে বিস্ময়, অন্তরে ভয়। বলে কি লোকটা রীতিমত সুস্থ?—'বলুন স্যার'।
'এক গেলাস দুধ নিয়ে এসো তো।'
'দুধ!' মানিকের চোখে রীতিমত চমক। এই রাত বারোটার সময় দুধ। তার চেয়ে যদি বলতো বুড়োটাকে লাস ঘরে টেনে ফেলে দিয়ে আসতে—সে এত অবাক হতো না। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায় সে।

'এত রাতে দুধ পাওয়া যায় না—বাইরে থেকে চা এনে দিতে পারি।'

'তাই নিয়ে এসো। যাও, চটপট।'
'আহা! কি আমার দরদীরে।' মনে মনে বলে। আর কথা বাড়ায় না বেরিয়ে যায়। সার্জিকেল ওয়ার্ডের একটা খালি বেডে গিয়ে সে স্রেফ্ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

এইসব দেখে শুনে সিস্টার অপরাজিতার বড় মায়া হলো। মানুষকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলা এরা খেলছে। তাই ও নিঃশব্দে ওর ফ্ল্যাক্স থেকে গরম চা খানিকটা গেলাসে ঢেলে এগিয়ে দেয় ইন্সপেক্টরের দিকে।

ধন্যবাদ সিস্টার। মাস্টারমশাই এই দুধটুকু খেয়ে নিন।' ফিস-ফিসিয়ে বলেন তিনি। ধীরে ধীরে মাষ্টারমশাইকে চা'টা খাওয়ানো হয়।

'আচ্ছা মাষ্টারমশাই! আপনার কেরোসিনের দরকার বাড়ির কাউকে দিয়ে একবার আমার খবর পাঠালেই পারতেন। রাম-লগন পাড়ে ব্যাটা তো দু'বেলা থানায় এসে আমাদের সেলাম ঠোকে। ওকে বলে দিলেই ও লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতো।'

'দেখুন।' ডাক্তারবাবু বিরক্তি আর চেপে রাখতে পারেন না। আপনি একবার অফিস ঘরে আসুন।
'কিছু বলছেন ডক্টর ?'
'ওঁকে কি এই পরিস্থিতিতে এসব কথা বলে বিরক্ত না করলে নয় ?'
'আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না ডক্টর, কাল সকালের মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে না পারলে আমার চাকরী থাকবে না। বুঝতে পাচ্ছি আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। এটাই আমার কর্ত্তব্য—যন্ত্রনাদায়ক হলেও এটা আমায় করতেই হবে। ওপরওলার নির্দ্দেশ। ফুলের মত ফুটফুটে একটি চোদ্দ পনের বছরের সুন্দরী মেয়ে তেলের লাইন থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। উনি হয়তো আর পাঁচ দশ মিনিট পরেই মারা যাবেন। তবু যতটা পারা যায় ওনার মনে এই অন্তিমকালেও আশা জাগিয়ে তুলতে হবে। ওনার স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রয়োজনে আমাকে অনেক বাজে কথা বলতে হতে পারে। সেজন্য আমায় মাপ করবেন।—মাষ্টারমশাই! মাষ্টারমশাই!
'কে ? কে বাবা তুমি ?'
'আমি অলোক। আপনার ছাত্র। আপনার কোন ভয় নেই। আপনার পেছনে পুলিশ আছে, সরকার আছে। তা ছাড়া আমি—মানে—আপনার কাছে স্কুলে পড়েছি।
'মনে পড়ছে নাতো তোমার মুখটা! ঠিক চিনতে পাচ্ছি না তো! আপনি একটু চেষ্টা করুন মাষ্টারমশাই। নিশ্চয় মনে পড়বে। আমি কেয়াতলা লেনের অলোক সরকার। আপনি আমাদের ইতিহাস পড়াতেন মনে পড়ছে ?'
'ইতিহাস! না তো আমি তো কোনদিন ইতিহাস পড়াই নি। অংক আমার সাবজেক্ট।'
'হ্যা! হ্যা! অংক! অংক'য় আপনি খুব ভাল ছিলেন।' আচ্ছা কেরোসিন তেলের লাইনে সেই যে মেয়েটি কি যেন নাম!
'তুমি নিবেদিতার কথা বলছ ?'
'হ্যাঁ! হ্যাঁ। নিবেদিতা। মনে আছে আপনি আমাদের সিস্টার নিবেদিতার গল্প বলতেন ? সে সব দিনের কথা ভাবলে কত কথাই মনে পড়ে। সেই সব পিথাগোরাস, প্লেটো, জ্যামিতি—ম্যালথ্যাস দেশে লোক অনেক বেড়ে গেছে। জীবনে কিছুই হতে পারলাম

না শেষে পুলিশ হয়েছি। আপনাদের মত আদর্শ মাষ্টারমশাই আজ বিরল। আজকাল সবাই গাড়ি বাড়ির পেছনে দৌড়চ্ছে। মাষ্টারমশাইরা নোট লিখছেন—ছাত্রেরা টুকে পাশ করতে চাইছে —কি লজ্জার কথা ডাক্তার. উকিল হতে চায় টুকে। মাষ্টারমশাই আপনার অংক—প্রতিটি কথাই অংকের মত মনে পড়ছে। যতই মনে পড়ে ততই ভাবি—ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আপনি কি ভালই বাসতেন। বিশেষ করে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে মেয়ে নিবেদিতার মত।'

'ওর কি হলো বলতে পারো? ও যে আমার বড্ড চেনা। অবিকল সাধনার মত দেখতে। ঐ বয়সে সাধনা যেমনটি ছিল।

'বলুন, বলুন, মাষ্টার মশাই।'

'জানলার ধারে বসে বসে রোজ দেখতাম মেয়েটিকে। হয়তো কোন বড় ঘরের মেয়ে। হয় তো বাবা মায়ের একটি মাত্র সন্তান। ভাগ্যের দোষে আজকের ছেলেমেয়েরা দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে, বিপথ-গামী হচ্ছে। এই বয়সে যাদের শুধু পড়াশোনা করার কথা—'

'কষ্ট হচ্ছে মাষ্টারমশাই? থাক তাহলে—

'না না কষ্ট কি!'

'সত্যি মাষ্টারমশাই দেশটা কি ছিল কি হয়ে গেল। আমাদেরও ইচ্ছে ছিল কত বড় হবো। বিলেত যাবো। ইঞ্জিনিয়ার হবো। দেশে ফিরে কলকারখানা গড়ে তুলবো। জীবন হবে স্বাধীন, সুন্দর। সে আর হলো না। চোর চোট্টা, কালোবাজারওলা হওয়া তো আমাদের মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ঘরবাড়ি, মান ইজ্জত, সুখ শান্তি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মহান নেতা হওয়া। কিন্তু আমরা কি জনসেবা করছি না? এই যে নির্দোষ ফুলের মত মেয়েটা কেরোসিনতেলের লাইন থেকে কোথায় গায়েব হয়ে গেল। তাতে আমার কি বলুন? কিন্তু কর্তব্য দেশাত্মবোধ—ঐ টানেই চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি। জালের মত ঘিরে আছি আমরা সহরে—পালিয়ে যাবে কোথায়—ঐ টানেই ছুটে

এলাম হাসপাতালে আপনার কাছে। খবর পেলাম গুণ্ডারা আপনার ওপর তেলেরলাইনে বর্বর ভাবে হামলা করেছে। আপনার সামনে থেকে ওরা মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। দৌড়ে এলাম এখানে। এই যে, ডাঃ চ্যাটার্জী। ইনি তো আপ্রাণ চেষ্টা করে আপনার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছেন। উনি না থাকলে কি যে হতো। আমি তাই ওনাকেও বলছিলাম—মাষ্টারমশাই আমাদের ঋষিতুল্য।'

'তুমি কি বলছ? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আমার যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। মেয়েটির কি হলো বললে? ওঃ! আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না কেন?

'মাপ করবেন মাষ্টারমশাই। মাত্র দু'মিনিট সময়। আমিও অংকে ভালো ছিলাম। অংক ছিল আমার ধ্যান জ্ঞান। ছিল না আমার বাবার হাতে পয়সা—আর সেই জন্য এই পুলিশের চাকরীতে ঢুকে বিশ্বাস করুন আমার সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। আমি এতটুকু মিথ্যে বলছি না। আমি একটা যন্ত্র বিশেষ। শুধুমাত্র চালকের নির্দ্দেশেই কাজ করে থাকি। শুধু একটা ফুলের মত জীবনের জন্যে, গুণ্ডার কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনি নিজের জীবন দিয়ে যা করতে পারেন—আমরা শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কিছুই পারি না। বিশ্বাস করুন 'দেশপ্রেম' কথাটা আজ আমাদের কাছে ধাপ্পাবাজি। আভিজাত্যের মুখোশ এঁটে আমরা ভদ্রলোক সাজার চেষ্টা করছি। আর সেটাই হচ্ছে আমাদের কাল। কত খুন হচ্ছে, কত নারী ধর্ষিত হচ্ছে, কত যুবক চাকরী না পেয়ে চোর, গুণ্ডা, মাস্তান হয়ে যাচ্ছে এ সবই আমরা জানি। আমাদের হাত পা বাঁধা, করার কিছু নেই। তা না হলে গুণ্ডারা আপনার বুক থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আপনার মত বৃদ্ধ একজন সম্ভ্রান্ত মানুষকে বোম, পটকা, লোহার রড মেরে ওরা ড্রেনের ধারে ফেলে দিয়ে যেতে পারলো!

ডাক্তার চ্যাটার্জী এগিয়ে এসে নাড়ী দেখলেন বৃদ্ধের। মুখের কাছে মুখ এনে জিগেস করলেন—'এখন কি রকম বোধ করছেন?

'মনে হচ্ছে এত সহজে মারা যাবো না।' হাসবার চেষ্টা করলেন উনি।

'আপনি একটু বিশ্রাম করুন।'

'ডাঃ চ্যাটার্জী! আমার কিন্তু সময় বড় কম। আর কিছু সময় ওকে বাঁচিয়ে রাখার মত কোন মেডিসিন আপনি ব্যবহার করতে পারেন না?'

ডাঃ চ্যাটার্জীকে দেখে মনে হলো উনি ইন্সপেক্টরের ওপর সত্যিই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ না করে উনি বললেন— 'আপনার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে এতখানি রিস্ক না নেওয়াই ভাল। আপনি ইতিমধ্যে অনেক বেশী বেপরোয়া কথাবার্তা বলেছেন।

'ধন্যবাদ ডক্টর! আমি নিশ্চয় অপেক্ষা করবো। পুলিসের আইনে অপরাধীদের নাম ধাম্ প্রতক্ষদর্শীর কাছ থেকে আমাদের জানতেই হয়। যদিও আমরা জানি অপরাধী কারা কোন্ চক্র এই সব ঘটনার পেছনে কাজ করছে। কেরোসিন ডিলার বেপাত্তা রামলগন বা পাড়ার দু'চারটে মাস্তানকে ধরা পুলিশের কাছে কোন ঘটনা নয়। মামুলি পুলিশকেসে এই ধরনের মামলায় সাক্ষীর অভাবে খুনি অপরাধী খালাস হয়ে যায়। আরও ওপরওলার একটি টেলিফোনে প্রচুর টাকার খেলায় হয়তো প্রশাসনকে কেনা যায়। আমার চাকরী নতুন। জনগণের ঘৃণা ও ক্রোধের কাছে অনেককে মাথা নত করতে হয়। এই কেসের তদন্তের ওপর নির্ভর করছে আমার যোগ্যতা প্রমাণের নজির। সেদিন আর নেই, থানায় এসে বকে ধমকে ছয়কে নয়, নয়কে ছয় করিয়ে পুরো ব্যাপারটাই উড়িয়ে দেওয়া যাবে। অনেক কথা ওঁনাকে বলেছি হয়তো ঘটনার সংগে তার কোন সংগতি নেই। আমি শুধু মূল ঘটনার প্রতি ওঁনার স্মৃতিশক্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্যেই তা বলেছি। একজন বৃদ্ধকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে নিশ্চয় জঘন্ন অপরাধ করেছি। ডক্টর সেজন্যে আমি লজ্জিত। বিশ্বাস করুন আর

নাই করুন এই ইউনিফর্ম্ গায়ে চাপালেই, অফিসের ঐ চেয়ারে বসলেই একটা শক্তির প্রচ্ছন্ন দম্ভ আমাদের পেয়ে বসে। তখন কোন কাজকেই আত্মপক্ষ সমর্থনের পক্ষে কুকর্ম বলে মনে হয় না। তখন নিজের মধ্যে একজন রুচি সম্মত ভদ্র শিক্ষিত মানুষের কথা ভুলে যাই। ন্যায় অন্যায়ের সব পক্ষকেই মনে হয় সমান অপরাধী। আপনিও কি মনে প্রাণে চাননা নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবে মর্য্যাদার সংগে কাজ করে আপনার ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ মেটাতে বলুন আপনি কি তা পারেন? নেবুতলা লেনে কি কেয়াতলা লেনে কেরোসিনের লাইনে এ ধরণের ঘটনা কতইনা ঘটছে। না ঘটাটাই অস্বাভাবিক। এসব ভুলে যেতেও মানুষের বেশী সময় লাগে না। মানুষ সমস্যা নিয়ে জর্জ্জরিত। রুজি রোজগারের সমস্যা, বেঁচে থাকার সমস্যা, নিজের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখার সমস্যা। কিন্তু এদেশে এসব সমস্যার কি কোন স্থায়ী সমাধান আছে? ঐ যে বৃদ্ধ শুয়ে আছে, হয় তো এই তার শেষ চির শয্যা। একটা বুড়ো মরে যাবে, কোথায় একটা বস্তিতে একটা বাচ্চা জন্মাবে এ আর এমন কি? একটা কিশোরী মেয়ে যার জীবন ফুলের মত সুন্দর হতে পারতো, চোরা চালান হয়ে হয়তো এতক্ষণে আশ্রয় নিয়েছে কোন পতিতা লয়ে এ আর এমন কি! কালকেই গোটা দেশটা বন্যায় ডুবে যেতে পারে। গোটা দেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি একসংগে দিনের পর দিন বিকল হয়ে যেতে পারে, হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে গোটা দেশে একটা প্রতি বিপ্লব ঘটিয়ে দেওয়া যেতে পারে এ আর এমন কি। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পর দেখা যাচ্ছে বলতে শোনা যাচ্ছে আসাম যদি অসমিয়াদের জন্যে হয়, তাহলে বিহার-বিহারী-দের জন্যে, বাংলা বাংগালীদের জন্যে। আপনি কিংবা আমি যদি বলে বসি আপনি আপনার জন্যে, আমি আমার জন্যে তাহলে কি অন্যায় হবে? আপনি চাইছেন রুগীটা বাঁচুক, যদি মারা যায় স্বাভাবিক মৃত্যু হোক। আমি চাইছি বুড়োটা ততক্ষণ বাঁচুক যতক্ষণ না মেয়ে বেপাত্তাকারী আসামীদের নামগুলি পাওয়া যায়।

কেন বৃদ্ধকে সামান্য কেরোসিন তেলের জন্যে মরতে হবে ? তেল নিয়ে চোরা চালান কেন বন্ধ হবে না ? মেয়ে পাচারকারীদের, তেলের চোরাকারবারীদের কেন ল্যাম্প পোস্টে ঝোলানো হবে না ? সে প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্ব আমাদের নয়। দেশে সরকার আছে, আছে কোটি কোটি মানুষ তারাই বুঝে নেবে যে যার অধিকার এবং দায়িত্ব।

আমি জানি তেলের জন্যে লাইন দেবার ওনার দরকার ছিল না। একজন কেরানী বা মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই। বৃদ্ধের সংসারের সদস্য সংখ্যা সাত আট জন। উনি ২য় মহাযুদ্ধের সময়কার মানুষ। ওঁরা আমাদের থেকে অনেক বেশী নির্ভেজাল। আমি জানি উনি একজন কৃতি শিক্ষক। মাপ-করবেন ডাক্তার উকিল হবার জন্যে টুকে পাশ করার কথা ওঁরা ভাবতে পারেন না। এই দেখুন সেই মেয়েটির ছবি যার নাম নিবেদিতা। কেরোসিনের লাইন থেকে যে মেয়েটি নিঃখোজ হয়েছে। সুন্দর একটি মেয়ে। নিশ্চয় কোন স্কুলের ছাত্রী। সব ছেলে মেয়েদেরই মাষ্টারমশাইরা ছাত্রছাত্রী মনে করেন। কৃতি-শিক্ষকদের কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি দুর্ব্বলতা থাকাই স্বাভাবিক সেই সূত্রেই মেয়েটিকে ওঁর ভাল লাগে। রোজই মেয়েটি তেল নিতে এসে ঘুরে যায়, রোজই মাষ্টার মশাই ওকে দেখেন। একদিন দুপুরে হঠাৎ রামলগনের দোকানে তেল এলো। প্রচুর লোকের লাইন হলো। লাইনের সামনেটা চলে গেল মাস্তানদের দখলে। নিরীহ সাধারণ নারী পুরুষ বিবাদ চায় না। তারা লাইনদিয়েছে। তেল পাবে না। প্রতারিত হতে হবে জেনেও বহু মানুষ লাইন দিয়েছে। সবভয়ভীতি উপেক্ষা করেই মানুষ মরিয়া হয়ে তার অধিকার কায়েম করতে চায়। ক্রমশঃ ভিড় বেড়েছে। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়েছে। এই সুযোগ—পথে আলোনেই, সহর নিঃস্প্রদীপ। নেবুতলা, কেয়াতলা, কেওড়াতলা সবই অন্ধকারে মিশে গেছে। চুরি ছিনতাই কারীদের পক্ষে,

ডাকাতি চোরাচালানীর পক্ষে এমন কি মেয়ে পাচারকারীদের পক্ষেও এই সুবর্ণ সুযোগ কেউ ছাড়ে? স্মৃতির সংগে মিলে গেলে আসেসম্প্রীতি। স্নেহ ভাজন ব্যক্তিকে কেনা অধিক ভাসবাসে? স্নেহ ভালবাসা এমন অন্ধ অনুভূতি যা মানুষকে অস্বাভাবিক করে তোলে। সেই মন নিয়েই মাষ্টারমশাইও এই সুযোগে মেয়েটির পাশে লাইনে এসে দাঁড়ান। নিজের ছেলেমেয়ে ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে তিনিও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেন নিবেদিতার প্রতি। অসহায় ক্লান্ত মানুষ। দায়গ্রস্থ বিপর্যস্ত মানুষ চায় একটু সহানুভূতি। একটু সহৃদয় আলাপ। এই ভাবেই আলাপ হয় নিবেদিতার সংগে মাষ্টার মশায়ের। ঘটনা উপলক্ষ্য তৈরী করে। মেয়েপাচারকারীদের পূর্ব পরিকল্পনা মত লক্ষ্য ছিল নিবেদিতার ওপর। তারা তেলের লাইনের আশপাশ দখল করে নিঃশব্দে চোখ দেখেছে ওর ওপর! তেলের লাইনে মারামারি উপলক্ষ্য। মেয়েটি মাষ্টার মশায়ের স্নেহজালে আবদ্ধ না হলে হয় তো এত রক্তপাত হতো না, ও এতগুলিতাজা মানুষ মরতোনা। আচমকা হৈচৈ, বোম পটকায় হতচকিত মানুষ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে পড়ে। যে যেদিকে পারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। দুস্কৃতিকারীরা ভাবতে পারেনি মেয়েটিকে নিয়ে পালাতে গেলে বৃদ্ধ প্রাণপণে বাঁধা দেবেন। বাঁধা পেয়ে ক্ষিপ্ত বন্যজন্তুগুলো মরিয়া হয়ে আরও বোমচার্জ করে, চালায় সোডার বোতল, লোহার রড। ষোল সতেরজন মানুষ জখম হয়। ঘটনার অনেক পরে আসে পুলিশ। মারমুখী জনতা ঘিরে ফেলে পুলিশকে। লাল বাজার থেকে এসে পড়ে আরও ওপর ওলার বিরাট বাহিনী। জনতার দাবী অপরাধীদের পুলিশ জানে, তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘটনার সময় আসেনি সেই সব অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। খুঁজে বের করে দিতে হবে নিবেদিতাকে। সময়মত পুলিশ এসে পড়লে হয়তো ঘটনা এত মারাত্মক হতো না। অতএব পুলিশই অপরাধী। এসবক্ষেত্রে পুলিশ

যে সব সময় নির্দোষ এমন কথা প্রমাণিত হয় না। যতক্ষণ না ঘটনা ঘটছে ততক্ষণ পুলিশ সক্রীয় হয় না এটাই ঘটনা।

'কি ব্যাপার সিষ্টার' ?

ডাক্তার এবং ইন্সপেক্টর দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। সিষ্টার উদ্বিগ্ন এবং চঞ্চল। 'মনে হচ্ছে ওঁনার জ্ঞান ফিরে এসেছে। উনি কি সব বলছেন। কিসব প্রাণপণে সরাবো জঞ্জাল।' বারুণ করলেও শুনছেন না।'

'কি বলছেন সিষ্টার ? ঠিক কি বলছেন উনি ?'

'উনি কি সব অংকের কথা বার্তা বলছেন, কি সব জ্যামিতি।

'জ্যামিতি ? আপনি ঠিক মনে করতে পাচ্ছেন সিষ্টার ?

'বলছেন চার্চিল + রুজভেল্ট + ডালেস = পিথাগোরাস + প্লুটো + হেরহিটলার। অংক মানে কেরোসিন মানে আলো + রুটি = জীবন + জীবিকা।'

'পেয়ে গেছি। মিলে গেছে অঙ্কের উত্তর।' লাফিয়ে উঠেন ইন্সপেক্টর। 'মিষ্টার আপনি শীঘ্র ওনার কাছে যান। ওনাকে আরও খানিকটা গরম দুধ দিন। শুনুন উনি কি বলেন। ওঁনার বলার ওপর নির্ভর করছে নিবেদিতাকে খুঁজে পাওয়ার সুত্র। ওনাকে বলতে দিন। প্লিস্ আপনি যান। ওঃ ডক্টর। আপনি একজন ভীষণ ভালো মানুষ। মানে ভীষণ ভালো শ্রোতা। আপনি ওনাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। উনি রীতিমত সুস্থ হয়ে উঠছেন। জীবন + জীবিকা — মানে রোগ কি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মানুষ মরতে চাইবে না। খুন হতে চাইবে না। খুন করতে চাইবে না। প্রতিটি কাজের পেছনে যে বৈজ্ঞানিক সত্য লুকিয়ে আছে আজ জীবনকে সেই আলোকে বিচার করতে হবে। এদেশে কোন মানুষের জীবিকাই সম্মানীয় বা গৌরবের নয়। প্রতিটি পদক্ষেপেই বিপদের ঝুঁকি, গুপ্ত হত্যা খুন সন্ত্রাস প্রলোভন। জীবিকার জন্য মানুষ পশু হয়। পশুরা মানুষকে পণ্য করে। নাফার দুনিয়ায় রোশনাই বয়ে যায়। তার মানে বাঁচার জন্যে মানুষ যেখানে

মরিয়া—সেখানেই খুন সন্ত্রাস। সে লড়বে। শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সে লড়বে। তার পায়ের তলার মাটি যতক্ষণ না কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সে পিছু হটবে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ এটাইতো শেষ কথা। চার্চিল + রুজভেল্ট + ডালেস = পিথাগোরাস + প্লেটো + হেরক্লিটাস।'

'পৃথিবীর ওপর দখলদারী নিয়েই সুরু হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মাষ্টার মশাই ভাল ছাত্র ছিলেন। ইচ্ছে করলে তিনিও ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতেন। টি. ভি. ফ্রিজ গাড়ি, বাড়ি করে তিনিও বালিগঞ্জ অথবা সল্টলেকে গুছিয়ে বসতে পারতেন। কলকাতায় যখন বোম পড়ছে, জাপানী প্লেন বাজপাখীর মত চক্কোর মেরে যাচ্ছে, কলকাতার আকাশে, বাতাসে, সমুদ্রে তখন বারুদের গন্ধ। কলকাতা ছেড়ে মানুষ পালাচ্ছে। সহর ব্ল্যাক আউট। কাপড়, চাল, কেরোসিন বাজার থেকে উধাও। সন্ধ্যের পর চারিদিক অন্ধকার। ব্রিটিশ সৈন্যতে সহর ছেয়ে গেছে। ওদের চাই মেয়ে মানুষ। ঘর ছাড়া ওরা। পেটের দায়ে বন্দুক-ধরা। ওদের চাই মেয়েমানুষ আর মদ। যুদ্ধ, মদ মেয়েমানুষ। সাধারণ সৈনিকদের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে কিনে নিতে এই ছিল বিশ্বজোড়া যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের জনপ্রিয় শ্লোগান। কলকাতা ছেড়ে বড় লোকেরা গ্রামের দিকে পালাচ্ছে। মাষ্টার মশাই তখন ছাত্র। সারারাত সাইরেন, মিলিটারী ভারি বুটের চলা ফেরা। পাড়ায় পাড়ায় দালালেরা ঘুরছে। খুঁজছে দুস্থ দরিদ্র ঘরের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতী বধু বা কন্যা। কে যে কখন হারিয়ে যাবে, বিকিয়ে যাবে, কেউ জানে না। যুদ্ধ থামলো। জাপান শ্বেত পতাকা উড়িয়েও শেষ রক্ষা করতে পারলো না। এটোম বোমার এক আঘাতে হিরোসীমা—নাগাসাকি মুছে গেল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অণু পরমাণুর বিস্ফোরণ। যার বিষে এখনও বিষাক্ত পৃথিবীর আলো হাওয়া বাতাস। যার অভিশাপে নির্দোষ নিষ্পাপ মানুষ আজও পৃথিবীর

প্রান্তে প্রান্তে অভিশপ্ত ব্যাধিগ্রস্থ একটা নোংরা অবক্ষয় কুষ্টরোগে রোগাক্রান্ত। হিটলারের কবরের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ মানুষের কবর রচনা। তার পরেই পনেরই আগষ্টের চমক। গান্ধী আরুইন চুক্তি, অটোহানের কান্না, আইনস্টাইনের বুক ফাটা আর্তনাদ। প্রতিটি সুস্থ সচেতন মানুষের বুকের রক্ত মাংস কুরে কুরে খাচ্ছে সেই পরাজয়ের জ্বালা। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অভিশপ্ত পৃথিবীর বাসিন্দা আমরাও। এসবই মাষ্টার মশাই দেখেছেন এবং জানেন। তার স্মৃতি স্বত্তা থেকে এ ছবি মুছে যাবার নয়। সাধনার সংগে নিবেদিতার, অনুমানের সংগে ঘটনার মিলের মতই সেই সব অতিতের স্মৃতিচারী মন, খুঁজে ফেরে হারানো জীবন। সাধনার লোভনীয় সান্নিধ্যের চেয়ে সচেতন সংবেদনশীল একজন তরুণের কাছে ব্যক্তির চেয়ে দেশ বড়, দেশের চেয়ে মানুষ বড়। মাষ্টার মশাই সেই ধরণের বড় জাতের মানুষ, যার কাছে সাধনার লোভনীয় সন্নিধ্যের চেয়েও জীবন কম আকর্ষণীয় ছিল না। তিনি ছিলেন কৃতিছাত্র। সাধনা তার ছাত্রী। সাধনার সংগে নিবেদিতার দেহগত মিল, একজন বৃদ্ধের মনোলোকের সুপ্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে। সেই প্রেরণা থেকেই জেগে উঠে অন্যায়ের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা। গুণ্ডারা মাষ্টার মশাইকে চিনেছিল। মাষ্টার মশাইও চিনেছিলেন ওদের। গুণ্ডারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়লো নিবেদিতার ওপর, তখন উনিও বেপরোয়া ঝাঁপিয়ে পড়েন গুণ্ডাদের ওপর'।

'মাষ্টার মশাই এখন অনেকখানি সুস্থ তিনি আপনাদের খুঁজছেন'।

'তাই নাকি সিষ্টার! চলুন ডক্টর চ্যাটার্জী।

'কেমন বোধ করছেন মাষ্টার মশাই'। সম্মোহিত ডাক্তার সম্ভ্রমে জিগেস্ করেন।'

'মনে হচ্ছে অনেকটা ভাল। আমার কিছু কথা ছিল আমি কি ওনাকে বলতে পারি।'

'উত্তেজিত না হয়ে বললে ভাল হয়।'

'বলুন মাষ্টার মশাই বলুন আপনি কি জানতে চান?

'তুমি নিবেদিতার কথা কি বলছিলে?'

'মাপ করবেন আপনি সাধনার কথা কি বলছিলেন? ''যদি আপত্তি না থাকে কে এই সাধনা?

'আমার ছাত্র জীবনের কথা বলছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শেষ! আমি তখন কলেজে পড়ি। পড়াশোনার খরচ চালাতে আমায় দু'একটি ছাত্র ছাত্রী পড়াতে হতো। সাধনা ছিল আমার ছাত্রী, বড়লোকের মেয়ে হলেও সাধনা ছিল নম্র দয়াবতী, নির্মল চরিত্রের মেয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ, আবার কলকাতায় মানুষের ভিড় বাড়ছে। যারা প্রাণ ভয়ে ঝড়ের আগেই কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে ছিল সেই সব পরগাছা শ্রেণীর বড় লোকেরা ফিরে আসতে আরম্ভ করছে। বন্দুকওলা ইংরেজ চলে গেলেও সিন্দুকওলা সেই সব প্রভুদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ফিরে গেছে সাগর পারে। পূর্ব বাংলা থেকে দলেদলে 'আসছে বাস্তুত্যাগী মানুষ। নেহেরু-লিয়াকাৎ চুক্তি কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু অংকের হিসেব ভুল হতে পারেনা। চার্চিল + রুজভেল্ট + ডালেস = গোটা পৃথিবী হতে পারে না। পিথাগোরাস + প্লুটো + ম্যালথাস + হিটলার অভিন্ন হৃদয়। তাহলে অংক দাঁড়াচ্ছে চার্চিল + রুজভেল্ট + ডালেস = হিটলার + মুসোলিনী + তোজো। তাহলে বাকি থাকলো পৃথিবীর ১/৩ অংশ। এই অংশটি চলে গেল মেহনতীদের দখলে। হিটলারের পরাজয়ে খুশি পৃথিবীর আশি ভাগ মানুষ। তাদের সংগে আমরাও খুশি। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া দেখে ফিরে এলেন। আমাদের হাতে এলো 'রাশিয়ার চিঠি'। সারারাত জেগে পড়লাম। বার বার পড়লাম। সেকি উত্তেজনা। মনে হলো যেন রবীন্দ্রনাথকে পাশে পেয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ দেশের নিষিদ্ধ কথা বলেছেন। সাধনা আমার ছাত্রী। ফুলের মত চতুর্দশী মেয়ে। ফুল ফুটলে কার না আনন্দ। সাধনা আমার পরিচর্য্যায়, আমার সুনির্মল

অন্তঃকরণের সান্নিধ্যে, আমার বিনম্র স্বপ্রেম ব্যবহারে ফুল হয়ে ফুটেছিল। সাধনা সিষ্টার নিবেদিতা হয়ে উঠুক এই ছিল আমার সাধনা। 'রাশিয়ার চিঠি' পড়ে শোনাচ্ছিলাম সাধনাকে।

—'অবশেষে রাশিয়ায় আসা গেল' তার মানে অনেক ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে অনেক বাধা বিপত্তির পর কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার বন্দরের মাটি ছুঁলেন। রবীন্দ্রনাথ তার শেষ বয়সের জীবন দর্শনে যুগান্তকারী চেতনার সন্ধান পেলেন। মন দিয়ে শুনছিল সাধনা। ওকে কল্পনা করে নিতে বলি স্বাধীনতার পথ, মুক্তির পথ কত পর্ব্বত প্রমাণ বাধার প্রাচীর পার হয়ে যেতে হয়। কি অপরিসীম মুল্য দিতে হয়। একেই বুঝি বলে জীবনবেদ। এমন সময় ঘরে এলেন সাধনার বাবা। -'কি বই পড়ছ তোমরা'?

'রবীন্দ্রনাথ'।

'দেখি, না, এতো রবীন্দ্রনাথ নয়? এতো 'রাশিয়ার চিঠি'।

'আমি ও সাধনা খুব লজ্জিত হয়ে পড়লাম।'

'ছিঃ ছিঃ তুমি না ছাত্র? পড়াশোনা না তোমার সাধনা? তোমার মধ্যে এই ধরণের নীচতা, বিশ্বাসঘাতকতা? রাজনীতি! তুমি আমার নাবালিকা মেয়েকে ফুসলাচ্ছ? বামন হয়ে চাঁদে হাত। চাবগে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব। জাননা তুমি কোথায় হাত দিয়েছ? আগুন নিয়ে খেলা—বাহাদুর।

'বাবা'।

'ঘাড় পাকড়ে নিকাল দো উসকো'।

জীবনের সেই চরমতম অপমান আজও ভুলতে পারিনা। তারপর জীবনটা বহুদিক থেকে জ্বলে, পুড়ে, তেতে—আস্তে আস্তে আবার নিভে গেল। নিভে গেল সব আগুন। জানি না সাধনার মত মেয়ের কি পরিণতি হয়েছিল। কোথায় কত দামে ও বিকিয়ে গেল। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস প্রবঞ্চনা। জীবন যেভাবে শুরু করার কথা ছিল তা আর হলো না। রসাতলে তলিয়ে গেল জীবনে বড় হয়ে উঠার মহৎ স্বপ্ন। কলকাতাকে চিরকাল

ভালবাসি। কলকাতাকে ভালবেসে আজও পরবাসী রয়ে গেলাম নিজ দেশে।

আইনষ্টাইন + রবীন্দ্রনাথ = আমি ও আমরা।

জরা + মৃত্যু + ব্যাধি = আমি ও আমরা।

চাঁদ + বামন = আমি ও আমরা।

রাশিয়ার চিঠি + ভারতবর্ষ = রবীন্দ্রনাথ ও আমরা।

সাধনা ভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট, জাতিচ্যুত হতভাগ্য একজন শিক্ষকের জীবনের এই শেষ অংক। শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি আর পাঁচটি সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়া দেশের জন্যে কোন কর্মটি করলাম। মল মূত্র ত্যাগ ছাড়া তো এ জীবনে ত্যাগ বলে কিছু নেই।

'যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
প্রাণপণে সরাবো জঞ্জাল,
পৃথিবীরে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি
সব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।...

'মাষ্টার মশাই আপনার প্রচুর পড়াশোনা। আপনি দেখছি রবীন্দ্রনাথ গুলে খেয়েছেন। আপনাদের জন্যে তবু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। আমাদের জন্যে আজ আর কেউ রইলো না। 'রবীন্দ্রনাথ ? হু' বিঘে জমির রবীন্দ্রনাথ ? তিনিও ব্যর্থ। তাঁর একমাত্র ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায়—তিনি রবীন্দ্রনাথ হননি; বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, আইনস্টাইন হননি। ১৯৫০—৬০—৭০—৮০তে এসব অর্থহীন চিন্তার জানি কোন দাম নেই। যার বুকে যন্ত্রণা, যে কেবল বার বার হারে, যে কেবল শেষ এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ জয়ের জন্যে লড়াই করে বেঁচে থাকে এ চিন্তা তাদেরই সাজে।

পিথাগোরাস—প্লুটো—এলিমেণ্টস্—জ্যামিতি—আইনষ্টাইন, মার্কস্, রবীন্দ্রনাথ মানে রাশিয়ার চিঠি এসব কথা গল্প কথা।

নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে একদিন নিবেদিতার দেখা পেয়ে গেলাম। দেখা পেলাম অতীত সাধনার। কেরোসিনের বিরাট

লাইন। আলজিরিয়া থেকে আলাস্কা, মস্কো থেকে পণ্ডিচেরী, পয়ষট্টি বছর বয়স আমার। বহু সরকার অদল বদলের প্রত্যক্ষ-দর্শী আমি। আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের শপথ নিয়ে বলছি কোনদিন দল বদল করিনি। তেলের লাইনে দাঁড়িয়ে এই প্রথম আমি নিজের সঠিক জায়গাটি খুঁজে পেলাম। মনের এই অসম্ভব দুর্বার গতিকে থামিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কি সুন্দর ফুলের মত ফুটফুটে পবিত্র কন্যা। ওরও তেল চাই। ক্ষণে ক্ষণে নিষ্প্রদীপ কলকাতার সেও চায় তার প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে।

'কি নাম মা তোমার?'

'নিবেদিতা'।

'বাঃ ভারি সুন্দর।'

'দেখুন না আজ পাঁচ ছ'দিন হলো তেল পাচ্ছি না। ঐ যে গুণ্ডাগুলো সব তেল নিয়ে বেলাক্ করে। মারামারি করে। আমরা এক ফোঁটাও তেল পাই না।'

'আমার যদি মা কোন উপায় থাকতো।

'আপনি বুড়ো মানুষ কোথায় পাবেন।'

'না মা! যে করেই হোক তেল আমায় পেতেই হবে।

'কি ব্যাপার মাষ্টার মশাই আপনি লাইনে?'

'মালটা বেশ খাসারে।'

'চুপ! স্যার চিনতে পাচ্ছেন, আমি আপনার সেই বকুল বাগানের ছাত্তর। আপনার তেল চাই স্যার। পাঁচ লিটার হলে চলবে? আসুন আমার সংগে।'

না না আমি লাইন দিয়েই নেব।

'সে কি! আপনি মাষ্টার মশাই। ওই কুৎসিত ছেলেগুলো আপনার ছাত্র?'

'হয়তো হবে।'

'মাস্টার মশাইরা বুঝি লাইন দেয়?'

'দেয়না বুঝি ?
'আমি তো দেখিনি।'
'সাধনা আমার এত দিনের সাধনা।'

'প্লিজ্! আপনি চুপ করুন। আর নয় আর আপনাকে কথা বলতে দেওয়া যায়না।' ডাঃ চ্যাটার্জী আদেশ দিলেন নার্সকে। 'সিষ্টার! অক্সিজেন রেডি করুন'।

'ডাক্তারবাবু' দয়া করে আমায় শেষ সুযোগটুকু দিন। আর কোনদিন আমি কাউকে কিছু বলতে আসবো না। মাত্র দু'মিনিট সময়। সাধনা! আমার এতদিনের সাধনা। আমার রক্তাক্ত অনুভূতি। একটি লাল গোলাপ শুধু বুজরুকি—আর আত্ম প্রবঞ্চনা। নিবেদিতা আজ তোমার কাছেই আমার আত্মদান। ফুল ফুটুক না ফুটক আজ বসন্ত। আমি পারবো।

'মাষ্টার মশাই ঐ দেখুন মারামারি শুরু হয়ে গেছে।'
'তুমি পালিয়ে যাও মা।'
'মাষ্টার মশাই, এখনও ভাল কথায় বলছি আপনি ভেগে পড়ুন কেটে পড়ুন।'
'তা হয় না।'
'ওঃ মাগো।'
'কি হলো নিবেদিতা ? কিহলো তুমি কোথায় ? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।
নিবেদিতা—আলো! আলো! অন্ধকার হয়ে আসছে কেন সব। পচা ফেলু মঙ্গলা তোরা শেষ পর্যন্ত এটা কি করলি— তোরা তো এমন ছিলিনারে।'
'নোট করুন ইন্সপেক্টর নোট করুন। পচা, ফেলু, মংগলা।
'ডাক্তার। নিবেদিতার ঘরে কি আলো জ্বলেছে ? যত দ্বার, জানলা আছে সব খুলে দাও। আলো আসুক। আমার অংকের নির্ভুল উত্তর আমি পেয়ে গেছি পিথাগোরাস।

অন্ধকার = আলো
আলো = ফুল।

পিথাগোরাস—ফুলগুলোকে—ফুটতে—দাও—

"ভেরি সরি ইন্সপেক্টর। সব শেষ।'

'ধন্যবাদ ডক্টর! আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন' বললেন পুলিশ অফিসার।

'বুড়োটা কেবল অংক নিয়ে বিড় বিড় করে শেষ পর্যন্ত মলো।'

'মালটা কি স্যার এখন লাস ঘরে নিয়ে যাবো?' ঘুম চোখে মানিক কখন নিঃশব্দে সবার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আহা! মানুষটা বড় ভাল ছিলো গো। বড় কষ্ট পেয়ে গেল। মেওলাল— এ মেয়োলাল লাস ঘরকা জলদি চাবি লেয়াও।' মানিক হাঁকতে হাঁকতে বেরিয়ে গেল।

——

জল পড়ে পাতা নড়ে

বিচিত্র নামে ডাকা হয় তাকে। বাড়ির ছোট ছেলে সে। ছোট থেকেই আদরের। আদরে আদরেই কিছুটা বাঁদর তৈরী হয়েছিল সে। যে নামেই ডাক না কেন সে একবার ফিরে তাকাবে। এক নজরে তাকিয়ে বুঝে নেবে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ না আন্তরীকতার ছোঁয়া আছে তার মধ্যে। চক চকে ক্ষুরধার ইস্পাতের উজ্জ্বলতা একবার না একবার ওর দৃষ্টিতে ঝলসে উঠে। সে চাহনী মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠে অনেকের কাছে। বাবা কাকা দাদারা যে যার জগতে ব্যস্ত। কেউ তাকে পাত্তা দেয়না এক মা ছাড়া। মায়ের কাজ মন যোগানো, খাদ্য যোগানো নানান জনের নানান ফাইফরমাস খাটতেই সারাদিনে মা ফুরিয়ে যায়। দশবছরের রিংকুকে যত ছোট মনে হয় ওর মনটা কিন্তু তত ছোট নয়। বই পড়া, স্কুলে যাওয়া, দু বেলা সময়মত খাওয়া, কোনদিন অসুখ না করা এইসব খবর ছাড়া আর কোন খবর রিংকুর কেউ বড় একটা রাখেনা। ছেলে পোষা যেন গোরু পোষার মত হয়ে গেছে। পড়তে বলবে সবাই। না পড়তে বসলে ভাত বন্ধ করে দেবো বলবে, বলবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো। কিন্তু সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয় না কেউ, স্কুলেও তাই পড়া না পারলে কানমলা, মার, বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানো, ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া এই সব কারণেই স্কুলে যেতেই ভয় করে তার, দুবেলা খাওয়াতো নয় যেন গেলা। এর চেয়ে হাসপাতাল অনেক ভালো। ডিম কলা দুধ মাছ পাউরুটি বাড়ি থেকে মিষ্টি আপেল, হাসপাতালে ভারি মজা। কিন্তু অসুখ যে করতে চায় না। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে বেশ হয়। কোন বড়লোকের বাড়ি কাজ

নেবো। বেশ আরামে থাকবে, সন্ধ্যে হলে টি, ভি দেখতে পাবে পড়তে হবে না। নয়তো ট্রেনে ট্রেনে প্রহ্লাদের মত ধুপ বিক্রী করবে। ওতে দু' পয়সা আসে। প্রহ্লাদ এখন ফুলের ব্যবসা করছে। কিন্তু তার তো পালিয়ে যাবারও উপায় নেই।

ঠিক বাবা দাদা খুঁজে নিয়ে আসবে। কেষ্টোর মত মায়ের গয়না নিয়ে সে পালাতে পারবে না। মাকে সে বড় ভালবাসে। তাছাড়া তার মায়ের গয়নাও তো তেমন নেই। যা আছে মা বলে দিদির বিয়েতে লাগবে। রিংকুর মনের অলি গলির এসব খবর কেউ রাখে কি? মনে মনে তাই সে ভীষণ ছটফটে। মন তার ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া, কেবলই ছুটে চলেছে, থামতে চায় না। থামতে জানে না। ভুবন বসুরায়ের ছোট ছেলে টুবলু তাকে একদিন টালিগঞ্জের ঘোড় দৌড়ের মাঠে নিয়ে যাবে বলেছে। টুবলু একদিন তাকে চা খাইয়েছিল। সিগারেট খাওয়া শেখাবে বলে ছিল। রাজি হয় নি রিংকু। টুবলুটা ভয়নক চোর। ওর বাপের মুলি বাঁশের কারবার। ওরা নাকি নমঃশুদ্দুর। দেশ থেকে কলকাতায় এসে ওরা বসু রায় হয়ে গেছে। পর পর দু'বছর ক্লাস ফোরে ফেল করে রিংকুর সংগে পড়ছে। এ সব কথা বাবা যদি জানতে পারে বাড়ি থেকে দুর করে দেবে। রিংকু জানে কোন দিন বাবা এসব জানবে না, জানতে চাইবে না, রিংকু কি ভাবে, সারাদিন কি করে কাদের সংগে মেশে।

বড়দের রাজত্বে ঢুকে পড়ার ছটফটানি তাই তার মনটাকে তাড়া করে নিয়ে চলে ঘর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে ঘরে, কলোনীর অলিগলি, নিষিদ্ধ ফলের লোভনীয় টোপ ঝুলছে তার সামনেই কিন্তু তার নাগাল পেতে গেলে তাকে আর একটু বড় হতে হবে, দাদা বা বাবার মত। সে এখন অনেক দিনের ব্যাপার। ভাল করে বেশ বড় মাঠে ফুটবল খেলতে পারলে, বড় পুকুরে বেশ করে সাঁতার দিতে পারলে নিশ্চয় রিংকু তাড়াতাড়ি লম্বা চওড়া

হয়ে যেত। কিন্তু কোথায় মাঠ, কোথায় পুকুর যে খেলবে সাঁতার দেবে, কে বা শিখিয়ে দেবে? দশ বছরের কচি কচি নরম নরম শরীরটা, ছোট খাটো দেহটা মোটেই তার পছন্দ নয়। পৃথিবীর বড় বড় বিষয়গুলোর ওপর একচেটে অধিকার থাকবে শুধু বড়দের, যত কিছু বাহাদুরী, যত কিছু মজা ওরাই লুটবে আর ছোটরা চিরদিন ছোট হয়ে 'শিশু ভোলানাথ' আর 'আবোল তাবোল' পড়বে এ অবিচার অসহ্য। ভুবনবাবুর মত বাবা যদি চাকরি না করে ব্যবসা করতো মুলি বাঁশের তাহলে এতদিনে তাদের দোতলা কোঠা উঠে যেত। মুলি বাঁশের ব্যবসায় লেখাপড়া শিখতে হয় না, বেশী টাকাও আসে অঢেলা চুরি করলে কেউ টেরও পেতো না। টুবলুর মত—টুবলুর মত কেন, পয়সা থাকলে চম্পা পম্পা আর বাপানদের মত তাকেও সাউথ্ পয়েন্টের গাড়ি এসে স্কুলে নিয়ে যেত। তা না চাকরী করছেন বাবু। হোক ওরা নমঃ তবু ওদের পয়সা আছে। পয়সা থাকলে সব হয়। পয়সা দিয়েই তো টুবলুরা হয়ে গেল বসুরায়। আর ওরা চ্যাটার্জী হয়েই বা কি হলো। বাবা বলে বামুনের ঘরে গোরু হয়ে জন্মেছিস্। কত ছেলে মেয়েরা কেমন স্বপ্ন দেখে। রোজ সকালে উঠে সে কতবার কতভাবে মনে করার চেষ্টা করেছে ঘুমের মধ্যে কোন স্বপ্ন দেখেছে কিনা, কিছুই মনে পড়ে না। রোজ সকালে উঠে যদি কেউ দেখে বাবা একহাতে আনন্দবাজার আর অন্যহাতে আলু, চিংড়ি, মুলো, পালং কুমড়োর থলে নিয়ে বাড়ি ঢুকছে তাহলে কি ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা যায়? ওরা সব ভাল স্কুলে পড়ে, ভাল ভাল বই কিনে দেয় ওদের বাবা মা, তবেই তো ওরা সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখে। রোজ তেতোর ডাল আর চিংড়ি পালং খেলে কি আর ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা যায়? কেন যে সকাল হয় কেন যে ঘুম ভাংগে, কেন যে ভোরের আলো জানালা দিয়ে এসে চোখে পড়ে, ঘুম পাড়ানির দেশে, ঘুম পরীদের সংগে নীল পাহাড়ের ধারে ফুলের বনে প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষ হয়ে জন্মানোর চেয়ে অনেক ভাল।

বাবা বাড়ি ঢুকেই বললে, জান আজ বাজারে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেছি। একাবারে অজ্ঞান।

মা অবাক হয়ে বলে, সেকি !

হ্যাঁ গো।

দিদি বললে, যাঃ ! তাহলে তো তোমার জামা কাপড়ে কাদা লাগতো ?

তুই যাতো। মা মুখ ভেটকে দিদিকে ধমকালো রোজ সেই এক বাজার থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

বাবা হাসতে হাসতে আনন্দবাজার নিয়ে বসলো। মা চা দিয়ে গেল।

বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে —শুয়োরের বাচ্চা।

কি বললে ? মা ঘুরে দাঁড়ালো।

আহা ! তোমায় নয় এই দেশটাকে বলছি। দেশটাই একটা শুয়োরের বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

তা আমি কি করবো। যাও না ড্রামের ওপর উঠে বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে বলগে যাও।

দেখি বাবা একবার খেলার পাতাটা দাও তো।

দেখি বাপি সিনেমার পেজটা একবার।

দাদা দিদি দুজনেই অর্দ্ধেক কাগজ দখল করে নেয়। প্রথম পাতায় মুখ রেখে বাবা চায়ে চুমুক দিচ্ছে। রিংকু আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়ায়।

বাবা।

বলো বাবা।

বাবা ! একটা কথা বলবো ?

এখনও মাইনে পাইনি বাবা।

আমি অন্য কথা বলছি বাবা।

বলো।

দেশটা যদি শুয়োরের বাচ্চা হয় আমরা তাহলে কিসের বাচ্চা

বাবা ? ভেড়ার বাচ্ছা।

মা সামনে এসে হাঁক দিলে—এই যে শুয়োরের বাচ্ছা ভেড়ার বাচ্ছারা যে যার কাজে যাওনা বাবা। দাসী মাগীদের মত খেটে খেটে আর পারিনা যে।

মাগী মানে কি বাবা ?

কি বললি ?

বা রে মা যে বললো।

ফের মুখের ওপর কথা। মাকে মাগী বলা। স্কুলে পড়ছ, তবে রে হারামজাদা। শয়তানের বাচ্ছা। লেখাপড়া করছ।

আহা ! ওকে মারছ কেন ও কি করেছে ? মা এসে বুক দিয়ে আগলায়।

কি ফের প্রশ্রয় ! শুধু তোমার জন্যে, ছেলেটা—

রাম বাবু আছেন নাকি ?

আরে চাকলাদারবাবু, আসুন আসুন।

আরে আসুম কি। শুনছেন নি বাজারে আজ ইলিশ মাছের কিলো চব্বিশ ট্যাকা ইন্দিরা এবার ক্ষমতায় আইতেছে দেখাইবো ওগো দিবো ভাল মত গুতা। আপনারে কইলাম দ্যাখবেন এবার জরুরী অবস্থা নয় ম্যালেটারী নাবাইবো হ কয়েই দিলাম।

চাকলাদার কাকু ?

কও।

এবার 'রাবার' আমাদের কেউ মারতে পারবে না।

যা কইছ। ঐ একখান আছে আমাগো গাভাসকার। মোল্লাগো দিছে টাইট কইরা। কি বৌদি চা হইবো নাকি।

আজকের কাগজটা দেখেছেন ?

কি আর দেখুম ও হালার কাগজ। ও মনা তোমার কাকিমা পাঁচটা ট্যাকা দিছে তিনডা সিনেমার টিকিট আনতে কইছে।

রিংকু পথে বেরিয়ে পড়ে। বাপের কাছে ধমক খেয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। পথে বেরিয়ে মনে হলো কেউ তাকে

ভালবাসে না। সব সময় বকে মারে। পরস্পরকে বকাঝকা করে। সবাই ওরা নিজেদের নিয়ে নিজেরা ব্যস্ত। দেশকে বলে শুয়োরের বাচ্ছা! নিজের দেশকে কেউ কি শুয়োরের বাচ্ছা বলে? এই দেশটা তো কত বড়। কতদিনের পুরানো দেশ। কত পুরানো মন্দির নদ নদী পাহাড় সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। সবুজ মাটি আর নীল আকাশ দিয়ে ভরা। তবু এদেশের মানুষ সুখী নয়। বাবা তো খবরের কাগজ পড়ে। খবরের কাগজে থাকে কত খবর। দেশ বিদেশের কত খবর। খবরের কাগজ হাতে নিলেই বাবার চাই এক কাপ চা। দাদার কাছে খবরের কাগজ মানেই খেলা। দিদির কাছে সিনেমা। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তাজা তাজা খবর পড়তে গিয়ে বাবা চাংগা হয়ে উঠে। বাজার থেকে ফেরার পথে বাবার হাতে একটা আনন্দবাজার থাকা চাই। রিংকু চিনির মুড়কি ভালবাসে বাবা জানে অথচ ভুলেও কোন দিন আনে না। আর আজ চিনির বদলে গুড়ের চা মুখে দিয়েই বাবা তেতে গেল। আনন্দবাজার পড়তে গিয়ে বাবা রোজ তেতে যাবে আর মুখে যা আসে তাই বলবে। কোন দিন বলবে চোর জোচ্চোর। কোন দিন দালাল। আর আজ বললো দেশটাই নাকি শুয়োরের বাচ্ছা হয়ে গেছে। রিংকু তো তাই জানতে চাইলো দেশটাই যদি শুয়োরের বাচ্ছা হয় তাহলে সে কিসের বাচ্ছা? এই কথাটাই রিংকু জানতে চেয়েছিল। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? জানতে না চাইলে বাবা বুঝবে কোন বিষয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। বই না থাকলে যেমন স্কুলে যেতে ভাল লাগে না। আবার সময় মত হাতে টাকা না এলে বই কেনাও যায় না। বই যদি সময় মত ছাপা না হয় বাবাই বা কিনবে কি করে। স্কুল কলেজ দাদা দিদি আর রিংকুর বই মিলিয়ে সে প্রায় এক টেম্পো বই। এত বই এক সংগে কিনতেই বাবার তিন মাসের মাইনে লেগে যাবে। তার জন্যে বছরের প্রথম দিকে বাবাকে দেনা করতে হবে অফিসের পিওনের কাছ থেকে। পিওনরা অফিসের বাবুদের

কাছে সুদে টাকা খাটায়। সুদে আসলে মিলিয়ে মাইনের অর্দ্ধেক চলে যাবে ধার শুধতে। আর সারা মাস তাই রিংকুদের সংসারে চলবে তিতোর ডাল চিংড়ি পালং। মা মুখ ভেটকে বলবে 'খোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি খোড়।' এসব কথা রিংকু মা বাবার আলোচনা থেকেই শুনেছে। শুনে অনেক কথা ভাবতে শিখেছে। আর রিংকু যে এসব কথা এত মনোযোগ দিয়ে ভাবে সে খবর কেউ রাখে না। তার মনের এই সব কথা কেউ জানবে না কোন দিনও। মার জন্যে আজ রিংকু বকুনি খেলো। মার জন্যেই আবার মারের হাত থেকে বেঁচে গেল। কি কথা থেকে কি কথা এসে যাবে তারপর মা বাবা তুজনেই তেতে যাবে। বেধে যাবে ঝগড়া। বাবা রাগ করে না খেয়ে অফিস চলে যাবে। আর মা খেয়ে দেয়ে দিদিকে নিয়ে চাকলাদার কাকুর বৌয়ের সংগে যাবে সিনেমায়। মাঝে মাঝে মার জন্যে রিংকুর ভারি তুঃখ হয়। মা সংসারে সত্যি সারাদিন ঝিয়েদের মত কাজ করে। মা মানেই কি ঝি? বাবা সব সময় বলে—দেখতো বেলা রমা কেমন চাকরীও করছে আবার সংসারও সামলাচ্ছে। আর তোমাদের 'খাতি নাতি বেলা গেল হুতি পারলাম না।' বেলা কাকিমা রমাদি লেখাপড়া শিখেছে। অফিসে চাকরী করে। কেমন সুন্দর করে সেজেগুজে অফিস যায়। দেখে মনে হয় সিনেমায় যাচ্ছে। রান্না করতে হয় না। কাপড় কাচা, সেলাই করা বাসনমাজা ঝিয়েদের এইসব কাজ একা হাতে মাকে সবই করতে হয়। দাদা দিদি তুজনেই কলেজে পড়ছে কবে চাকরী পাবে কে জানে। ওরা চাকরী পেলে রিংকুর জন্যে সন্দেশ আনবে, সময় মত বই কেনা হবে, বাড়িতে কাজের লোক থাকবে, মাকে আর ঝি মাগী—আচ্ছা 'মাগী' কথাটার মানে জিগেস করতে বাবা তার ওপর রেগে গেল কেন? ওটা কি অসভ্য কথা? তাই যদি হবে মা তাহলে বলল কেন? শুয়োরের বাচ্ছা, ভেড়ার বাচ্ছা, হারামজাদা এসব কি সভ্য কথা? সেইটেই তো জানতে চেয়েছিল রিংকু। রিংকু তো বড় হতে চায়।

বড় হতে গেলে জানতে হবে শিখতে হবে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়তে গিয়েই তো জানতে পেরেছিল ছড়াটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে একজন কবির লেখা। কি সুন্দর পীর ফকিরদের মত চেহারা রবীন্দ্রনাথের দেখলে কেমন মায়া হয়। কেমন যেন দুঃখী দুঃখী ভাব। উনি নাকি আবার কবিদের সম্রাট। হঠাংই তার মনে এসেছিল কোন্ সে দেশের সম্রাট রবীন্দ্রনাথ।

মা বলেছিল বাংলাদেশের।

বাংলাদেশের কথাটা শুনেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল রিংকুর। অতো সুন্দর লম্বা চওড়া সম্রাটের মত চেহারা যে কবির সে কিনা বাংলা দেশের লোক। তার মানে কলোনীর চাকলাদার কাকুদের মত তিনিও রিফিউজি হয়ে এসেছিলেন এদেশে? মনের দুঃখে একরকম চুপ করেই গিয়েছিল রিংকু। তারাও বাংলাদেশের লোক বাংলাদেশের লোক হলে তাদের দুঃখ ঘোচে না। রবীন্দ্রনাথও বাংলা দেশের লোক সেইজন্যে ওঁর চেহারায় চোখে মুখে কেমন একটা দুঃখী দুঃখী ভাব। আবার এও হতে পারে মা তো বেশী লেখা পড়া জানে না রিংকুকে ছেলে মানুষ পেয়ে যাহোক একটা কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে। একদিন সে নিশ্চয় বড় হবে। বড় হলে সব কিছুই তো মানুষ সহজে বুঝতে পারে জানতে পারে। বড় হলে কেউ তাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এমন কি খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত নয়। বাবা খবরের কাগজ পড়ে, রিংকুর ধারণা ছিল বাবা অনেক কিছু জানে বোঝে কিন্তু তা সত্যি নয়, ঐ সব ছোট বড় খবরের মধ্যে এমন কিছু আছে যা পড়ে বাবা রেগে যায়। সংসারে বেধে যায় অশান্তি। বাবার রেগে যাওয়াটা অন্যায় নয় রোজ তিতার ডাল আর চিংড়ি পালং খেয়ে অফিস যেতে হলে, সময় মত ছেলেমেয়েদের বই কিনে দিতে না পারলে, মায়ের জন্যে একটা কাজের লোক না রাখতে পারার দুঃখে বাবা দিন দিন রাগী হয়ে উঠছে। মা হয়ে উঠছে খিটখিটে। রিংকুর মত মন নিয়ে বাবা যদি মাকে বোঝার চেষ্টা করতো তাহলে ফাঁকি কোথায় নিশ্চয়

দেখতে পেতো। খবরের কাগজ পড়ে পড়েই বাবার মাথাটা গুলিয়ে গেছে কোন্ কথা কোথায় কিভাবে বলতে হয় বোঝে না।

সাড়ে দশটা বেজে যায় রিংকু এগলি সেগলি ঘুরে এসে দাঁড়ায় বাঁশ গোলার সামনে। চম্পা পম্পা মিঠুন বাপানদের স্কুলের গাড়ি ওদের নিয়ে চলে গেল। সাউথ পয়েন্ট মানে কি? মাকে জিগেস করলে বলতে পারে না। চাকলাদার কাকু দিদিকে পাঁচটা টাকা দিয়ে গেছে। আজ ওরা সিনেমায় যাবে পদ্মশ্রীতে। দিদি কলেজে পড়ছে। খবরের কাগজের সিনেমার পাতা দিদির খুব প্রিয়। সিনেমার নায়ক নায়িকাদের সব খবর দিদির মুখস্ত। টি. ভি. আর রেডিও নিয়ে ব্যস্ত দাদা। পাকিস্থানকে এবার হারাবেই। ভারতকে 'রাবার' পেতেই হবে। চাকলাদার কাকার চিন্তা হয়ে গেছে কাটা পোনা আর ইলিশের কিলো চব্বিশ টাকা।

সাউথ পয়েন্টের গাড়িটা কি সুন্দর। ব্যাচ, নেকটাই, ইউনিফর্ম সব পরে ওরা যখন আনন্দে অস্থির হয়ে গাড়িতে উঠলো তাই দেখে রিংকুরও খুব আনন্দ হয়েছিল। ভীষণ ভালো লেগেছিল। বাঁশ গোলার পাশের গলিটার মোড়ে এসে দাঁড়ায় রিংকু। বটতলার বাস স্টপেজে অফিস যাত্রীদের ভীষণ ভিড়। পাঁচ নম্বর, ছ'নম্বর বাসের জন্যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। শুয়োরের পালের মত মানুষগুলো নারী পুরুষে এখুনি গুতোগুতি করবে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়ার জন্যে। বেলা কাকিমা ও রমাদি দাঁড়িয়ে গেছে। বেলা কাকিমাকে ঠিক কাকিমার মত দেখায় না। কপালে বড় গোল টিপ, রক্ত খাওয়া লাল ঠোঁট, ছোট্ট কালো ব্লাউজ-মেদ মাংসে দেহটা কেমন মাখনের মত, তার পাশে রমাদিকে কি বিশ্রী লাগছে। রোগা লম্বা শুকনো কঞ্চির মত লাল টকটকে শাড়ি পরে যেন পেতনী দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও অফিস যাবে। পাড়ার মাস্তান পল্টুদা আছে ঠিক ওদের তুলে দেবে। পল্টুদার চেহারা দেখলে ভয় করে। মুখের দুপাশ দিয়ে নেবে গেছে আরশুলার মত গোঁফ, কানের শেষ পর্যন্ত মাংসের দোকানের কাস্তানের

মত ঝুলপি, মাদারী খেলার বেদেগুলোর মত মাথার চুল, বুক ভর্ত্তি ভাল্লুকের লোম ; কি ভীষণ রাগী রাগী লাল চোখ, গলায় একছড়া হার তার সংগে সাঁইবাবা লকেট, হাতে পাঞ্জাবী বালা। কালো পাঞ্জাবী সাদা প্যান্ট পরা প্রায় ছ ফুট লম্বা পল্টুদাকে বাঁশ গোলার পানওলা মতিলাল, বেলা কাকিমা, রমাদি এমনকি বাবা পর্যন্ত ভয় করে চলে। বেলাকাকিমা আর রমাদির একদিনও চলবে না পল্টুদা ছাড়া। বেলা কাকিমা বাসষ্ট্যাণ্ডে এসেই খুঁজবে পল্টুদাকে। দেশটাই যদি শুয়োরের বাচ্ছা হয়ে যায় পল্টুদারা তাহলে কিসের বাচ্ছা ?

হাসি পেল রিংকুর। হাসতে গিয়ে ক্ষিদে পেয়ে গেল। সাড়ে দশটা বেজে গেছে কেউ তাকে খুঁজতে এলো না। মনে খুব দুঃখ হলো রিংকুর। মনে হলো সে ওদের কেউ নয় বাড়ির লোকের কাছে সে এক অতিরিক্ত বোঝা। মার জন্যে তার খুব দুঃখ। সে দুঃখের কথা কেউ শুনতে চায় না। চাকলাদার কাকুটাকে ঠিক কিরকম গোরু চোর গোরু চোর দেখতে। কথা শুনলেই রাগ হয়।
—ইন্দিরা এবার ক্ষমতায় আইবো। ওগো দিবো গুতা। এবার আর জরুরী অবস্থা নয় ম্যালেটারী নাবাইব ? কইলাম তোমারে দেখবা।'

বাবা আর বন্ধু খুঁজে পেল না। কোথাকার সব হাওলাদার, পোদ্দার রফাদার দফাদার বাবার বন্ধু, দেখলে ঘেন্না হয়।

বুড়ো বটগাছটার দিকে মুখ তুলে তাকালো রিংকু।

—এই রিংকু আজ স্কুলে যাবি না ? ভুবন বসুরায়ের ছেলে টুবলু তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

অবাক হয়ে বুড়ো বটগাছটার দিকে তাকিয়ে আছে রিংকু। কি সুন্দর ! কত বড় আর কত দিনের এই গাছটা। কত কাক পক্ষী ওর ডালে বাসা বাঁধে। কোন দুঃখ নেই; কষ্ট নেই, নেই কোন ভাবনা চিন্তা। অনেকগুলো ঘুড়ি লটকে আছে ওর ডালে ডালে। রাস্তা চওড়া হলে ওকে কেটে মাটির বুকে শুইয়ে দেবে একদিন।

একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বুড়ো বটের স্মৃতি। আর কোনদিন রাস্তার ধারে মাথা উঁচু করে সবুজ ডালপালা মেলে ঠাণ্ডা ছায়া দিতে ওকে দেখা যাবে না। ভাবতে ভাবতে রিংকু ভুলে যায় ক্ষিদের কথা, পল্টুদা, চাকলাদার কাকুর কথা, তার মনে এখন আর কোন রাগ, কোন দুঃখ নেই।

—এই রিংকু আজ দুপুরে সিনেমায় যাবি?

—তুইতো স্কুলে যাচ্ছিস?

—সিনেমায় যাস যদি তাহলে আর স্কুলে যাবো না।

—বইগুলো কি করবি?

—কেন মতিলালের পাণের দোকানে রেখে দেবো।

ও যদি তোর বাবাকে বলে দেয়।

আমি আট আনা পয়সা দিলে ও কাউকে বলবে না।

না ভাই আমার এখনও খাওয়া হয় নি।

চল্‌না টাকা আছে হোটেলে মাংস ভাত খাওয়াবো। কলগার্ল অমিতাভ বচ্চন নীতু সিং আছে।

তুই কি আমায় শুয়োরের বাচ্ছা পেয়েছিস যে তোর পয়সায় মাংস ভাত খাবো সিনেমায় যাবো ?

কেন, তোর দিদিতো দেখলুম লাইনদিয়ে টিকিট কাটছে।

শালা শয়তানের বাচ্ছা। কি বললি? চোর কোথাকার।

এই খোকা কি হচ্ছে, মারছ কেন ওকে?

তুই আমায় মারলি? দাঁড়া আমি পল্টুদাকে ডাকছি।

কি হয়েছে রে টুবলু?

দেখনা পল্টুদা আমাকে স্কুলে না গিয়ে মতিলালের দোকানে বই রেখে সিনেমায় যেতে বলছে—কলগার্ল।

মিথ্যে কথা।

শালার ছেলেগুলো যা শুয়োরের বাচ্ছা মার্কা হয়েছে না। তুই ওকে মারলি কেন?

ও আমায় বাজে বাজে কথা বলছে কেন?

কি বলেছিস তুই ?

ওর দিদি কলগার্লের টিকিট কাটছিল তাই বলেছি।

টুবলো দিদি সম্পর্কে আর একবার বললে তোর মুখ ভেংগে দেবো বলছি।

চলে আয়! কে কত মায়ের দুধ খেয়েছিস দেখি।

লে মুরগী ঝটা পটি, পল্টুদা দাঁত বের করে হাসলো, হেসে সিগারেট ধরায়। লড়াই সুরু হয়ে যায়। জমে উঠে ভিড়। ভিড় জমতে জমতে পাহাড় হয়। লড়াই চলেছে টুবলুর সংগে রিংকুর। কুৎসিত লড়াই, দুটো শুয়োর যেন মারমুখী হয়ে মরণ কামড় দিয়েছে। অনেকে হাসছে উল্লাস প্রকাশ করছে সিটি মারছে। পল্টুদা বাজি ধরেছে রিংকুর ওপর। রেল লাইনের ওপারের রংবাজ ছোটকা বাজি ধরেছে টুবলুর ওপর। উত্তেজনা বাড়ছে। ছোটকা তো একটা জলন্ত সিগারেট চিবিয়েই খেয়ে ফেলে। তারপর কি হলো বোঝার আগেই লড়াই ছড়িয়ে পড়লো ছোটদের থেকে বড়দের মধ্যে। এপাড়া থেকে ওপাড়ায়। রেল লাইনের এপারের সংগে ওপারের লড়াই সুরু হয়ে যায়। দোকান-পাঠ বাস রিক্সা সব বন্ধ। বোম পটকা বারুদের গন্ধে সারা এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস। সারা এলাকায় এখন জংগলের রাজত্ব। পুলিশে পুলিশে ছয়লাভ। জারি হয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা। মন্ত্রীরা নেতারা ঘুরে যায়। শান্তির আবেদন অগ্রাহ্য হয়। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় দুটি মৃত বালকের ছবি সহ চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হয়।

'শিশু অপরাধের সংখ্যা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে তাতে প্রধান মন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।'

টেলিভিশনের পর্দায় রিংকুর মাকে জিজ্ঞেস করা হলো যদিও আপনি শোকাহত তবুও আপনি কিছু বলুন।

রিংকুর মা বললেন—আমি আর কি বলবো আমার রিংকু বড় হতে চেয়েছিল। আমরা ওকে বড় করতে পারিনি। মানুষ করতে পারিনি বই কিনে দিতে পারিনি। ভালমন্দ কিছু খাওয়াতে পারিনি।

এবার টুবলুর বাবা প্রশ্ন : আপনি টুবলুর বাবা ?

উত্তর : আজ্ঞে।

প্রশ্ন : আপনার নাম ?

উত্তর : আজ্ঞে ভুবন বসুরায় দাস।

প্রশ্ন : ও। এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।

উত্তর : কি আর কমু, আমাগো ছ্যাশ আছিল বরিশাল। কলকাতায় আইলাম সে আপনের পাঁচপায় সনে। ছিলাম মেস্তরী অখন মুলী বাঁশের কারবার করি। ছ'টি ছাওয়াল, তিনডা মাইয়া। ওডা আছিল ছোড পোলা, ছোড লোকগো সংগে মিইশ্যা জহন্নামে গিছিলগা। একে নম্বরের চোর আছিল বেবাক ট্যাকা পয়সা চুরি করতো। ঈশ্বর যা করেন সবই মংগলের জন্য :

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনার স্ত্রী—

উত্তর : অখনও আমার কথাই শেষ হয় নাই তার ইস্ত্রী। ঘটনার কথা কি আর কমু বাবু। আপনেরা তো সবই জানেন। এই দ্যাশডা গ্যাছে গা। চোর চোট্টা চিটিংবাজে ছাইয়া গ্যাছে গা। সব সুখ শান্তি ওপারে থুইয়া আসছি। আমরা কি আর মানুষ আছিবাবু ? ওর মায়ের একটু ফটো নেন বাবুরা বড় কাঁদতেয়াছে।

আক্রান্ত

"ইদানিং কালে একশো বছরের মধ্যে এত বড় বন্যা কেউ দেখেনি তাই না? পশ্চিমবংগের ষোলটি জেলার মধ্যে বারোটি জেলা ভয়াল ভয়ংকর বন্যায় ভেসে গেল। ভেসে গেল মানুষ গবাদি পশু, জলের তলায় তলিয়ে গেল হাজার হাজার ঘর বাড়ি। তিরিশ বছর স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলির প্রতি চরম উদাসীনতা গোটা দেশের মানুষের জীবনে যে অভিশাপ বহন করে নিয়ে এলো আরও কতদিন, কত বছর ধরে যে তার মূল্য দিতে হবে, নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না। স্বৈরাচারী খুন জখম সন্ত্রাসের রাস্তা ছাড়া পরশ্রমজীবিদের (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) অন্য কোন উপায় ছিল না। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান বাণিজ্য বিষয় বলে গণ্য হলো। আজও পথে পথে ভিখারী, ভবঘুরে, সমাজবিরোধী, আর দেহপজীবিনীদের ভিড়ে মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাত্রা—"

"স্যার! এটা বিজ্ঞানের ক্লাস!"

"স্যার! আজকের পড়া The role of Chemistry in modern life' !"

ছাত্রদের হঠাৎ সরব প্রতিবাদে প্রফেসর M. N. C. চেতনা ফিরে পেলেন।

"I am sorry, my boy. সত্যিই তো এটা বিজ্ঞানের ক্লাস! আমি কেন যে একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক! কলেজে ছাত্রদের সামনে শুধু মাত্র পাঠ্যপুস্তক পড়ানোই আমার কাজ। বিজ্ঞানের ক্লাস নিতে এসে Chemistry পড়াতে গিয়ে জীবন, মানবতা, রাজনীতি, দেশ কেমন সব গুলিয়ে যায়। বিজ্ঞানের ক্লাসে রাজনীতি চর্চা নিশ্চয় অর্ব্বাচীনতা। আমি দুঃখিত! অবশ্যই এবার

আমি মনে রাখবো আমি বিজ্ঞানের শিক্ষক।" হেসে উঠেন M. N. C

ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকায় মেয়েরা অধ্যাপকের দিকে।

"কি ব্যাপার! প্রফেসর M. N. C. এই চরম অপমানের পরেও হাসছেন নির্লজ্জ্যের মত! এরপরেও ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন না। প্রিন্সিপ্যালকে ডেকে আনলেন না?"

"মানেটা হচ্ছে আধুনিক জীবনে 'রসায়ণের' ভূমিকা তাই না? বন্য বর্ব্বরতা থেকে আধুনিক সভ্যতা পর্যন্ত মানুষের প্রতিটি সংগ্রামী পদক্ষেপের পেছনে—লক্ষ লক্ষ বছরের ধারাবাহিক বুদ্ধির প্রয়োগ— এই বুদ্ধি মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি—বিজ্ঞান কেন্দ্রিক এই সভ্যতার কাছে সাধারণ মানুষ কি চেয়েছে? রোগ থেকে মুক্তি, অন্ধকার থেকে আলো, যুদ্ধ বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা, ক্ষুধা প্রতারণা থেকে চির মুক্তি। 'রস' কথাটার অর্থ স্বর্ণ বা পারদ। স্বর্ণ—গোল্ড —গোল্ড থেকে গোল্ডরাসের কথাটা মনে পড়ছে কেন? গোল্ডরাস মানেই চার্লিচাপলিন্। ভবঘুরে, নাংগা ফকির, জীবনকে খুঁজছে, মনুষ্যত্বের দাবিদার। জীবন রসিক। ভাইরাস—মানে লুইপাস্তুর—"

ছাত্ররা ভাবে কি বলে চলেছে লোকটা? পাগল নাকি? আর পরীক্ষার ক'দিন বাকী শালা খালি জ্ঞান দিচ্ছে।

প্রতিটি ছেলেমেয়ের চোখের দিকে তাকান প্রফেসর চক্রবর্ত্তী। সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। "শোন! ১৮২২–৯৫, ফ্রান্সের এক অখ্যাত ল্যাবরেটরীতে মাইক্রোসকোপে চোখ দিয়ে বসে আছেন লুই-পাস্তুর। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, পরণে ময়লা পোষাক, চুল উস্কোখুস্কো। একমনে ১২০° ফারেনহিট পানীয়ের মধ্যে খুঁজছেন হাজার হাজার জীবাণু—ভাইরাস।"

রমা, পম্পা, ডলি, বিজন, সুকুমার, অর্নিবান, বিবেক।

রমা ছাপোষা কেরানী ঘরের মেয়ে, পম্পা—সেক্স্ডল-কোন মার্চেন্ট ফার্মের ম্যানেজিং বোর্ডের কেষ্টো বিষ্টুর কন্যা হবে, কেতকী —কেতকী মেয়েটা শেষেরকবিতার লাবণ্যের মত—নন্সেন্স।

ইয়েস্ ডলি—ডলির মধ্যে বেশ একটি বুদ্ধির ছাপ নরম মন—একটা মা মা ভাব মানে—যাকগে।

বিজন, অর্নিবান, বিবেক, রাজনীতির ময়দান, বিজ্ঞানের ক্লাস্, গ্যালিলিও, নিউটন, পাস্তুর, অটোহান, সত্যেন বোস—রাবিশ। Inorganic Chemistry বইটা হাতে নিয়ে সারা ক্লাস দু'বার পায়চারী করেন M. N. C. কোথাও কোন শব্দ নেই।

"এই যে রমেন্দ্র বিজয় ছবি আঁকছ বুঝি ? দেখি।"

লজ্জিত রমেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। এভাবে M· N. C. যে সামনে এসে পড়তে পারেন ভাবেনি সে। ছবি আঁকা শেষ হয়নি। বুক পর্যন্ত এসে থেমে গেছে।

—পম্পার ছবি।

—"স্যার" !

"বসো ! লজ্জার কিছু নেই। তুমি কি হতে চাও ভিন্টসেন্ট ভ্যান্‌গগ, তুঁলুস লোত্রেক্স, না পাবলো পিঁকাশো ? ছবিটি আমি শেষ করি কেমন ?" ডলির ডটপেনটা চেয়ে নিয়ে খাতাটা টেবিলে রেখে ঝুঁকে পড়েন M. N. C.

"স্যার ! আজকের পড়া"। উঠে দাঁড়ায় কেতকী। সুন্দরী পম্পা বুকে ভিসুভিয়স নিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে প্রফেসর চক্রবর্তীর মুখের দিকে। হেলেনের হাসির কাছে পরাজিত জুলিয়াস সির্জার। মার্ক এন্টনী। প্রফেসর M. N. C. প্রাণপণ শক্তিতে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রমেন্দ্রের আঁকা 'হাম্ তুম্ একঠো কামরামে বন্দ হো'র নায়িকার অসমাপ্ত ছবিটিকে নজরুলে রূপান্তর করে তলায় ছোট্ট এক লাইন কবিতা বসিয়ে দেন।

'বন্ধু ! বড় বিষজ্বালা এই বুকে।'

পম্পার চাই সুন্দর সাজানো গোছানো সল্টলেকের ওপর একটি ফ্ল্যাট। চাই টি. ভি, ফ্রিজ, কার চাই একজন ব্রাইট ফিউচার বনিহেল্‌থ ইয়ংম্যান। কারণ—পম্পার বাবা ভদ্রলোক, মেয়েকে সেন্ট টাইপ ইংলিশ মিডিয়াম কনভেন্ট স্কুলে পড়িয়েছেন, হকি.

টেনিস খেলিয়েছেন। সেই পম্পা এখন কলকাতার এক প্রখ্যাত কলেজে সায়েন্স নিয়ে পড়ছে। তার দাম কত!

'স্টুপিড।"

'কে স্যার?'

'না তুমি বসো।'

ছেলেদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ভাবেন প্রফেসর, গ্যালিলিও, লুইপাস্তুর, নিউটন, অটোহানের কথা। M. N. C. নিজেই একটি আস্ত স্টুপিড। তার ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কি আজে বাজে ভাবছেন। পম্পার মত মেয়ে যদি মা হয়, রমেন্দ্রের মত ছেলে যদি হয় বাবা, তাহলে সে কি কোন দিন অটোহান, আইনস্টাইন, জগদীশ বোস হবে?

'বন্ধু বড় বিষ জ্বালা এই বুকে'।—নজরুল। পম্পার ছবি ডটপেনের আঁচড়ে আঁচড়ে M. N. C. র হাতে নজরুল হয়ে উঠে। পাঁকেই তো পদ্ম জন্মায়! তবে কেন আর একজনও ডাঃ মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ জন্মাচ্ছে না? এখনও দেশের সিকস্‌টি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ অক্ষর জ্ঞান শূন্য। এখনও দেশের সেভেন্টি পারসেন্ট মানুষ সাব-হিউম্যান জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। ইস! আবার পলেটিক্স এসে যাচ্ছে।

"নো-মোর ডিসটার্ব। লিসিন্ মাই বয়! আজকের পড়া কি ছিল ইউ সুকুমার?

'স্যার। The role of Chemistry in modern life.'

"আচ্ছা সত্তরের দশকের ভারতবর্ষ সম্পর্কে তোমার কি আইডিয়া বিবেক?"

'ভেরি ব্যাড স্যার! সমগ্র ইণ্ডিয়া এখন একটা ডার্ক কন্টিনেন্ট। এভরি হোয়ার লোডসেডিং—

"নো পলেটিক্স হেয়ার। বলো সর্বাধুনিক যুগে রসায়ণের অবদান ও মৌলিক পরিবর্তন কি কি?"

"স্যার! মৌল গ্যামবর্গের আবিষ্কার।"

"স্যার ! তেজস্ক্রীয়তার আবিস্কার।"
"স্যার ! পারমাণবিক গঠন রহস্য" ।
ডলি উঠে দাঁড়ায়। সবাই তাকায়। ডলির মিষ্টি নম্র মাধুরী মেশানো মা মা মুখ খানা সবার মন কেড়ে নেয়। ডলি সরাসরি M. N· C. র চোখে চোখ রাখে।
'স্যার ! একটা কথা। বিবেক যা বললো সেকথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি।"
"বেশ বলো।"
"ভারতবর্ষ কোনদিনই ডার্ককন্টিনেন্ট নয়। ছিলও না হবেও না কোনদিন। বিদেশের কাছে ভিক্ষে নিয়ে জাতও যায় পেটও ভরে না। দেশকে গড়ে তুলতে চাই ব্যক্তিগত সততা, ত্যাগ। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও লোডসেডিং মানে—
"মাদার ইণ্ডিয়া ! আপনি দয়া করে বসুন।"
"ইউ স্যাটাপ্ সোলে।'
"মাদার ইণ্ডিয়া,
সোলে। সোলে ! সোলে !"
"স্টপ। এটা বিজ্ঞানের ক্লাস। প্রতিটি ঘটনাকেই বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোয় বিচার করতে হবে। আমি M. N. C. কথা বলছি। নো ভালগার প্লিজ্। দুটো পরস্পর শক্তির মিলনে অথবা সংঘর্ষে জন্ম হয় আর একটি তৃতীয় মহাশক্তির তাই না? এই 'আধুনিক' কথাটাই একটা ধাপ্পাবাজি। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এখনও মানুষ যাযাবরের জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। 'বাধ্য হচ্ছে' কথাটা অবশ্যই আমি ব্যবহার করবো। আমি মনে করি একথাটা ব্যবহার করার বার্থ রাইট আমার রয়েছে। কিছু স্বার্থান্বেষী গোটা বিজ্ঞান ব্যবস্থা আর বিজ্ঞানীদের কিনে নিয়ে সম্পদের স্বপ্ন চূড়ায় বসে গোটা জাতটাকে প্রতিদিন ধাপ্পা দিয়ে চলেছে। নগ্ন মিথ্যে কথাগুলোকে রং চং করে সাজিয়ে গুছিয়ে মানুষকে তার পেছনে ছোটাচ্ছে। আর আমরা জীবন সচেতন মানুষ—I am sorry. হ্যাঁ ঠিক সময়টা হচ্ছে ১৯৩০ সাল। এই রকম সময়েই

আর কি যিনি রসায়ণ শাস্ত্রে বিপ্লব আনলেন—মানে বস্তুশক্তির এতবড় আবিষ্কার যিনি করলেন সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান জগতের আচার্য—বলতো কার কথা আমি বলতে চাইছি ?"

'স্যার ! এ্যারিস্টোতল।'

'ছাগল !'

'স্যার ! প্যারাসেলস্।'

'ইডিয়ট।'

'স্যার। ম্যানডেলিফ'।

'সোয়াইন।'

'স্যার। আইকম্যান্।'

'হোয়াট ! রাস্কেল। বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে।'

'স্যার আমি বলবো ?' কেতকী উঠে দাঁড়ায়

'বলো।'

'প্রফেসর অটোহান।'

'রাইট। বসো। ক্রিমিকীটের দল।'

ঘেমে, নেয়ে, রাগে বিরক্তিতে M. N. C. র চোখে জল এসে যায়।

এক সংগে অনেক ছেলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে।

'কি ব্যাপার ?' রহস্যজনক নীরবতা। এরা কারা ? তার ছাত্র তো ? M. N C. কি ভয় পেয়েছেন ? নিজের আত্ম বিশ্বাসের অভাব ? না, নিজের প্রচণ্ড বিশ্বাসের প্রতি এদের বিশ্বাস-ঘাতকতা !

'ক্ষমা চাইতে হবে M. N. C. কে।' ছাত্রদের অনেকেই সোচ্চার।

'তার মানে' ? কার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তোমাদের কাছে না মহামান্য বিজ্ঞানীদের কাছে ? পড়ানো কি ভুল হচ্ছে ?'

'আপনি গালাগাল দিয়েছেন ? আশালীন ভাষা ব্যবহার করেছেন ? এর প্রতিকার চাই।"

সরব প্রতিবাদে মুখর অনেকেই। সারা ক্লাস জুড়ে হৈ চৈ।
"চলবে না, চলবে না,—ছাত্রদের প্রতি অশালীন আচরণ চলবে না। এ অন্যায় মানছি না—মানছি না,মানবো না।"
একি! অবাক M. N. C.! রাগে অপমানে হতবাক। এরা ছাত্র? তিনি একজন বিজ্ঞানের কৃতি শিক্ষক? এরা পেয়েছে কি? কান ফাটা চিৎকার শ্লোগান।
Stop Shouting'
'কি Shouting'—
নারকীয় হিংস্রতার আঘাতে M. N. C. এই প্রথম টের পেলেন পাশবিক চণ্ডরূপের নগ্ন আক্রমণে শুধু তিনি নন গোটা মানবতা, সাংস্কৃতিক দুনিয়া আর একবার আক্রান্ত হলো।
চোখে অন্ধকার দেখেন M. N. C. চশমা ভেংগে কোথায় ছিটকে পড়ে। নাকেতে আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়েছিলেন ঘরের এককোণে। উঠে দাঁড়ালেন, টেবিলটা ধরে কোনরকমে বসলেন। পাঞ্জাবী বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। চোখের কোলে রক্ত জমে কালসিটে পড়েছে।
'খুন। খুন।' মেয়েরা চিৎকার করে, অন্যদিকে এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন জটলা। শ্লোগান, 'জবাব চাই, জবাব চাই, C. I. A. এর দালাল M. N. C. কে চিনে নিন, চিনে নিন।' চারিদিকে হৈচৈ, চেঁচামেচি, মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুপরিকল্পিত ভাবে সাজানো গোছানো সমস্ত লেবরেটরীতে ভাংচুর তছনছ সুরু হয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন আওতার বাইরে। তছনছ হয়ে পড়ে আছে মহামূল্যবান যন্ত্রপাতি; ভাংগা কাঁচ, টেষ্টটিউব, মাইক্রোসকোপ স্প্রিটল্যাম্প, কেমিক্যাল ব্যালেন্স। এসিড ও বিভিন্ন কেমিকেলসের গন্ধে ঘর ময় একটা উৎকট বিধ্বস্ত পরিবেশ। দেওয়ালে টাংগানো রামমোহন, বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ বোসের প্রতিকৃতিও রেহাই পাইনি। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে যে এত বড় একটা ভাংচুর হয়ে যেতে

পারে এটি M. N. C. র কল্পনার বাইরে। তাকে উদ্ধারের জন্যে এখনও কেউ এগিয়ে আসেননি। সমস্ত ক্লাস প্রায় ফাঁকা। শুধু মাত্র কেয়া, কেতকী, সুকুমার, অর্নিবাণ ও বিবেক ছাড়া ক্লাসে কেউ নেই।

খানিক পরে দারোয়ানকে সংগে নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল এলেন। দেখলেন সব। বললেন—'একি! কি করেছে এরা। বাইরের গুণ্ডা মাস্তানরা কেউ এসেছিল নাকি? এসব বরদাস্ত করবো না। কলেজের মধ্যে নোংরা রাজনীতি শক্ত হাতে রুকবো। পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে। যা ঘটেছে অকপটে আপনি পুলিসকে তাই বলবেন।

'পুলিশের কাছে আমার statement দেবার কিছু নেই স্যার।'

'সেকি! এত টাকার property নষ্ট হলো। এত বড় অরাজকতা। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাছাড়া আপনার সর্বাংগে রক্ত—'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না স্যার। তোমরা কি এখন ক্লাস করবে? আমি fit.'

'হ্যাঁ স্যার।'

অধ্যক্ষ চলে গেলেন।

'একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল তাই না? আজকের কি পড়া ছিল যেন? নিউক্লিয়ার স্টাকচার অফ এটমের থিওরীটা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়?'

'স্যার' এখনও আপনার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।'

'পড়ছে নাকি! "you give me blood, I shall give you freedom." কেতকী তুমিই একমাত্র ঠিক বলেছিলে প্রফেসর অটোহান। It requires action কথাটার মানে বোঝ? বাংলা মানে হচ্ছে—কাজে লাগাও। তার মানে কি?—এটমিক্ বিজ্ঞানকে কাজে লাগাও। জার্মানিতে তখন থার্ড্ রাইখ্ জাগছে। তাকে মদত দিচ্ছে বড় বড় ধনকুবেররা। শিল্পপতিদের বাজার

চাই। বন্, বার্লিন, হামবুর্গ, ফ্র্যাংকফুর্ট, নর্টোম্ভামের মত শিল্প নগরীগুলিকে ভীষণ কর্ম চঞ্চল করে তোলা হচ্ছে। বার্লিন রেডিও থেকে পরাজিত বেকার হতাশা গ্রস্ত মেহনতী বুদ্ধিজীবিদের নানা রংয়ের আগামী দিনের সুখী জীবনের স্বপ্নের দিনগুলির কথা দিবা-রাত্রি জাদুকরী ভাষায় জংগী আবেদন জানানো হচ্ছে। দস্যুপায়ের কাঁটা মারা জুতোর তলায় গণতান্ত্রিক চেতনাকে পিষে মারতে নেওয়া হয়েছে সুচতুর পরিকল্পনা। বেকার ভবঘুরে, গুণ্ডা মাস্তান সমাজ বিরোধীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বন্দুক। পথে পথে জাতীয়তাবাদী নাৎসীবাহিনীও ব্ল্যাকসার্টস্ বাহিনীর জবরদোস্ত পাহারাদারী। 'কোন বাদ প্রতিবাদ নয় উৎপাদন বাড়াও রাইখ্ চ্যান্সেলরের কথা শোন। হের হিটলার একদিন গোটা দুনিয়াটাকে জার্মান জাতির পায়ের তলায় এনে দেবে।'

লেখাপড়া যদি করতে হয় মহানায়ক রাইখ মার্শালের 'মেইনক্যাম্প পড়ো।' বিজ্ঞান জগতের মহামনিষীরা তখনও বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ব্যস্ত। অসীমধৈর্য্য আর অধ্যাবসায়ের সংগে বিজ্ঞান চর্চায় মগ্ন। জ্ঞানপীট ইউনিভারসিটির সংলগ্ন কফিবারগুলি সারারাত খোলা থাকতো। বিজ্ঞান জগতের বড় বড় নোবেল লরিয়েট প্রফেসররা কৃতি ছাত্রদের সংগে নিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডে অংক কষে চলেছেন। এটোমিক্ এনার্জির ওপর চলেছে রিসার্চ। কফি-বার মালিকের নির্দেশে ক্যামেরা প্রস্তুত। ব্ল্যাক বোর্ডের অংকগুলি মোছার হুকুম নেই। ব্ল্যাক বোর্ড থেকে ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে অঙ্ক-গুলি ফটো হয়ে বেরিয়ে আসছে। কখন কোন অংক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোন্ কাজে লাগে। আপনভোলা বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সাধনায় নিজেদের জগত নিয়ে মগ্ন। তারা কাজ করে চলেছেন শুধু জার্মান জাতির অগ্রগতি ও নিরাপত্তার জন্যে নয়, গোটা পৃথিবীর মুক্তিকামী সভ্য মানুষের জন্যে, জীবন ও ধন-প্রাণের জন্যে। তাদের মাথায় শুধু অংক, ল্যাবরেটরী, আর গবেষণা। প্রবলেম্ সলিউশান, সলিউশান প্রবলেম্। কখনও

ভোর হতে না হতেই ছুটে আসছেন প্রফেসররা। সেই অংকটা চাই। সেই অসমাপ্ত অংকটা। এগিয়ে এসে সুপ্রভাত জানায় বার মালিক মহামান্য বিজ্ঞানীদের জন্যে দিবারাত্র তার বার খোলা। এঁদের কাছ থেকে রোজগার করে আনন্দ আছে। দুটো পয়সা এরা হাত তুলে দিতে জানেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সুপ্রভাত জানায় বার মালিক।

'হের লোকাম্প! আসুন আসুন।

বিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ, কখনও একশো দুশো মার্কেও বিক্রী হয় অংকের নেগেটিভ স্লিম্। না কখনই না। বিজ্ঞান সাধনার বস্তু। তাকে নিয়ে পণ্যের মত কেনাবেচা কখনই নয়। যারা গেটে. হোমার, সেক্সপিওর, বালজাক পোড়ায়, ইহুদি রক্তে প্রতিদিন স্নান না করলে যাদের রাতের ঘুম ভাল হয় না। কখনই সেই সব জহ্লাদ শাসক শ্রেণীর হাতে নিউক্লিয়ার সায়েন্সের থিওরী, বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক সাফল্যের তত্ত্ব কথা তুলে দিও না। মিউ-নিকের ঐ গুণ্ডাটার কাছে সৃষ্টিশীল বিজ্ঞান সংস্কৃতির কোন দাম নেই। ওটা একটা বিরাট ধাপ্পাবাজ। দীন দুঃখী মানুষদের, শিক্ষিত সজ্জন মানুষদের, বিপদগামী বিভ্রান্ত মানুষদের বিভিন্ন দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যে ভাওতা দিয়ে চলেছে লোকটা। বাঁচতে যদি চাও বিজ্ঞানকে সর্বনাশা যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাতে যদি চাও, নিজের ঘরবাড়ী, সুখসাচ্ছন্দ ছেড়ে জার্মান থেকে পালাও। বিজ্ঞানকে বাঁচাও। কারণ সৎ, সুস্থ, চিন্তাশীল সচেতন নাগরিকদের গেষ্টাপো পুলিস, নাজিবাহিনী আর কালোকুর্তার দল পাড়ায় পাড়ায় ক্রুদ্ধ অস্থিরমতি আধা মাস্তান যুবকদের সংগে নিয়ে অলি গলি বাইলেন, স্কুল কলেজ সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

শুধু কারাগারেই নিক্ষেপ করা নয়। প্রকাশ্য রাজপথে চলেছে হামলা নির্য্যাতন, খুন সন্ত্রাস। ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিল্পী সাহিত্যিক কেউ রেহাই পাবে না। তাকে বাধা দেবার কোন সুসংগঠিত শক্তি নেই দেশের মধ্যে। মানুষ ভয় পেয়েছে।

নিজের অস্তিত্বকে মানুষ ভয় পেয়েছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোন জাত নেই। নিজস্ব স্বদেশ নেই। সমাজ সভ্যতাকে জানিয়ে দাও ঐ ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাটার কথা। জার্মানীর মাটিতে দাঁড়িয়ে রেহাই পাবে না। ঋষিতুল্য বিজ্ঞানী অটোহান, নীলবোর সমেত অনেকেই রাতারাতি জার্মানী থেকে আমেরিকায় পাড়ি দিলেন।

দেখা করলেন প্রফেসর আইনষ্টাইনকে সংগে নিয়ে তৎকালিন বৃটেনের যুদ্ধ বিশারদ প্রধানমন্ত্রী মি. চার্চিলের সংগে।

'বলুন এই অবস্থায় কি করা যায়। বৈজ্ঞানিক আবিস্কার তো কারু কুপমণ্ডুকতা আর চোখ রাংগানীতে থেমে থাকতে পারে না। আমরা বিজ্ঞানী বিশ্বের যে কোন দেশে স্বাধীন পরিবেশে আমরা কাজ করতে চাই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে চাই প্রচুর অর্থ।'

যুদ্ধ বিশারদ মিঃ চার্চ্চিল হেসে বললেন— 'এই পাগলেরা কি বলছেন! ওঁরা জানে না ওরা কি বলছেন। এক কাপ করে কফি খাইয়ে ওদের নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দাও।'

বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা মানুষকে হতাশ হতে শেখায় না। বৈজ্ঞানিকেরা ছুটে গেলেন ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে। দেখা করলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সংগে। 'বলুন মাষ্টার মশাইরা! আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?' সুচতুর বুদ্ধিমান প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সহজেই বুঝে ফেললেন মার্কিন সাম্রাজ্যের মুক্তি সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আজ। বিজ্ঞান ও কারিগরি জগতের এই সব প্রতিভাবান মহাবিজ্ঞানীদের অবদানেই দেশ গড়ে উঠে। গড়ে উঠে সুবিপুল ধন সম্পত্তি। যে কোন মূল্যে কিনে নাও এই সব মহাশক্তিধর বিজ্ঞানীদের। উন্মুক্ত করে দাও ধনাগার। তাঁর আশাতীত আন্তরীকতায় মহাখুশি বিজ্ঞানীরা। বুঝিয়ে বললেন এটোমিক মহাশক্তির সুবিপুল অজেয় সম্ভাবনার কথা। মানবতাবাদী স্বাধীনতার পূজারী আমেরিকার ধনাগার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে। গোপনে-ভীষণ গোপনে শুরু হলো

বিজ্ঞান চর্চা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুকুম দিলেন 'It requires action.' কাজে লাগাও অবশ্য কি কাজে আমেরিকা এই সব সরলমতী বিজ্ঞানীদের লাগিয়েছিল ? কি ছিল তাদের গোপন অভিসন্ধি ? হিটলারের থেকেও এরা যে কতখানি ভয়ংকর সেদিন এই It requires action এর মানে স্বয়ং প্রফেসর আইনষ্টাইনও বুঝতে পারেন নি। হিটলারী জার্মানীর কবরের ওপর ঠিক যে সময় ধোঁয়া বেরুচ্ছে, ইউরোপের মানুষ যখন ভয়াল বিভৎস যুদ্ধাবশানের কথা ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে হিটলারের দোষর পররাজ্য গ্রাসী যুদ্ধবাজ জাপান শ্বেতপতাকা উড়িয়ে আত্ম-সমর্পন করেছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ গোপন নির্দেশ এলো হোয়াইট হাউস থেকে 'It requires action. আধুনিক সভ্য জগৎ থেকে নাগাসাকি ও হিরোসীমা মুছে গেল। বিশ্বের মানুষ চমকে আঁতকে উঠলো হিরোসীমা নাগাসাকির মর্মান্তিক আর্তনাদে। গোপন থাকলো না বেতারে বেতারে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো সে খবর। যেমন পাপ আর পূণ্য দুটোকেই গোপন করা যায় না তার প্রতিক্রীয়া অবধারিত। ফ্রন্টে ফ্রন্টে সৈনিকেরা স্তব্ধ হয়ে শুনলে সেই অসম্ভব ঘোষণাটি। নাগাসাকি হিরোসীমা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। হোয়াইট হাউসের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠে। কে কে সেই ব্যক্তি যিনি যুদ্ধনীতি মানবতা, বিসর্জ্জন দিয়ে অভিশপ্ত এই নির্মম নির্দেশ দিলেন 'It requires action'. আর কেউ নয় আমেরিকার মহান প্রেসি-ডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান ও জন ফষ্টার ডালেস। গত হয়েছেন শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো বিজ্ঞানীদের কথা রাখতেন। আনবিক বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতেন না। এখবর শুনে হাউ হাউ করে কেঁদে ছিলেন প্রফেসর অটোহান নিউইয়র্ক সহরে বসে। একি করলাম! থার্ডরাইখের প্রেত যে আমেরিকাতেও থাকতে পারে এ কথাটাই বুঝতে পারেননি ঋষি অটোহান। এই It requires action কথাটার মানে

অনেক মূল্যদিয়ে আইনষ্টাইন যখন বুঝতে পারলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহ গাঁথার মধ্যে দিয়ে যে কাব্যের আরম্ভ রক্তনদীর মহাসিন্ধুতে শেষ হয়েছে সে কাহিনী।

*   *   *   *

"আপনিই কি অধ্যাপক মানবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী?"

'আজ্ঞে হ্যাঁ।

" প্রফেসর চক্রবর্ত্তী! মহামান্য আদালত আপনার কাছে জানতে চাইছেন সে দিনের ঘটনার প্রকৃত বিবরণ। আপনি শপথ গ্রহণ করে বলুন কেন অকারণে আপনি ছাত্রদের অশ্লীল গালিগালাজ করেছেন?

'মিথ্যে কথা'।

আপনি কি জানেন মহামান্য আদালতের কাছে এমন সব প্রমাণ আছে, যাতে এসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে আপনার স্বশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে? আপনি শুধু ছাত্রদের অহেতুক গালাগালি করেন নি নাবালিকা যুবতী ছাত্রীদের সম্পর্কেও কুৎসিত ইংগিত করেছেন।

মিথ্যা কথা।

আপনি অস্বীকার করতে পারেন ভারতবর্ষের তিরিশ বছরের স্বাধীনতা সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেন নি? আপনি অস্বীকার করতে পারেন আপনারই প্ররোচনায় একদল বেনামদার বহিরাগত গোটা হামলা পরিচালনা করেছে? এবং এইসব কারনেই আপনি পুলিসের কাছে এষ্টেটমেণ্ট পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করেন। মহামান্য আদালতের কাছে সত্য গোপন করা চরম অপরাধ ও দণ্ডনীয়।

'মহামান্য আদালত! উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ?

আমি আদালতের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে এই পরিস্থিতিতে আমার ও আমার স্ত্রী পুত্রের ধন প্রাণ ও পারিবারিক নিরাপত্তার কথা ভেবে আমার সম্পর্কে আনিত এই সব অভিযোগ সত্য বলে মেনে নিয়ে

অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে—একজন অধ্যাপক হিসেবে আইনের ধারা বলে মহামান্য আদালত যে শাস্তি আমার সম্পর্কে প্রয়োগ করবেন তা আমি নত মস্তকে আমার জীবন ও জীবিকার স্বার্থে মেনে নেব। আমি অধ্যাপক মানবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই মর্মে মুচলেখা দিতেও রাজি আছি যে কোন রকম আদেশ ও নির্দেশ আমি আজীবন মেনে নিতে বাধ্য থাকবো।'

* * * *

আচ্ছা অর্নিবান আজকের অর্থাৎ ১৯৭৯র ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগতি তোমার জীবনে কি অবদান রেখে যাচ্ছে? এই যেমন ধরো জরুরী অবস্থা অবসানের পর আইন শৃংখলা এখন স্বাভাবিক। সংবাদপত্র তার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের হাত থেকে শ্রমিক কর্মচারী নিষ্কৃতি পেয়েছে।

ন্যাসবন্দির মত জঘন্য জবরদস্তি আর বাধ্যতামূলক নয়।

অবশ্য তুমি বলতে পারো বাক স্বাধীনতাই সব নয়। সত্যের চেয়ে অসত্য সংবাদ বেশী ছাপা হয়। বলতে পারো বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বন্ধ হয়েছে বটে বাজেট রচনা গরীবদের দিকে তাকিয়ে করা হয়নি। এদেশে প্রতিদিন দ্রুতবেগে দর বাড়ে কমে না কোনদিন।

বন্ধ কলকারখানা খুলছে ঠিক কিন্তু কলকাতা বন্দরকে অচল করে দেবার চক্রান্ত চলছে।

খুন জখম চুরি ডাকাতি ও রাজনৈতিক হত্যা আবার বাড়ানো হচ্ছে।

বিদ্যুৎ নিয়ে নাশকতামূলক চক্রান্ত চলছে।

মরীচঝাঁপি নিয়ে দেশী বিদেশী মুনাফাবাজরা রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা করছে। ভয়াল ভয়ংকর বন্যার ব্যাপারে কখনই পশ্চিম বাংলার জন্যে উদার সাহায্য ও সহানুভূতি দেখানো হয়নি।

এই হচ্ছে ৭৯র ভারতবর্ষের চেহারা।

জান অনির্বাণ, জানো সুকুমার, এখানে আমাদের এই জীবন, বাঁচা মরা, অনিশ্চিত অভিশপ্ত; ভবিষ্যৎ ভাবনার দিন শেষ।

আমরা আক্রান্ত, বিজ্ঞানীরা আক্রান্ত, দুষ্টচক্রের হাতে মানুষ বিভ্রান্ত, সভ্যতা সংস্কৃতি আক্রান্ত, আমাদের মাতৃভাষা শিল্প সাহিত্য অনাদৃত। হয়তো আরও দশ বছর বাদে বিগত দিনের দেশজোড়া মহান ঐতিহ্যের কথা ভাষা, কাব্য গান ভুলিয়ে দেওয়া হবে। বিগত দিনের বহু মূল্য দিয়ে অর্জিত সবকিছু মানবিক মূল্যবোধগুলি স্বযত্নে ধ্বংশ করার সুচতুর অপচেষ্টা সক্রীয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের উদার আদর্শে যে কলকাতা একদিন কল্লোলিত হয়েছে বহুবছর ধরে তাকে ভেংগে গুড়িয়ে ফেলার চক্রান্ত চলেছে।

১৯৭৯র এই স্বাধীন দেশে শিশুবর্ষের প্রচার উৎসব সর্বত্র সোচ্চার। আজ অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে করছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যদি ঘটে হয়তো সে সুযোগ হারিয়ে যাবে। যেমন হারিয়ে গিয়েছিল মহা বিজ্ঞানী অটোহান আইনষ্টাইনের। ভাবিকালের ভারতবর্ষকে ছাত্র শিক্ষক মিলে গড়ে তুলতে না পারলে এ জীবনে বিজ্ঞান চর্চাকে প্রতারিত করা হবে। কিহলো কেতকী তুমি কি কিছু বলবে ?

'বলছিলাম কি স্যার—

জানি তুমি কি বলবে। আজকের তারিখটা দিয়ে তোমার খাতায় একটা সই করে দেবো মানে অটোগ্রাফ এইতো ?

'স্যার ! বলছিলাম—

'ইউ নো মেটামরফসিস্ তার মানে একটা মেটাফিজিক্যাল চেঞ্জ। টুডে অর টুমরো হবেই। আমাদের কারুরই পালিয়ে বাঁচার উপায় নেই।

'আমিও ঠিক সেই কথাটাই বলতে চাইছিলাম স্যার।'

নোটিশ

নোটিশ এসেছে গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে।
ক্ষেত বাদা ঘর বাড়ি সব ছাড়তে হবে। গভর্মেন্টের নোটিশ কোন আর্জ্জি চলবে না। কোর্ট কাছারির দোহাই মানবে না। কয়েক শো বিঘে জমি চাই, তিন মাসের মধ্যে সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে।

এখন উপায়? এই কথাটাই ঘরের দাবায় বসে বসে ভাবছিল সুখদেব মণ্ডল। ঘরের দাবায় বসে বসে সুখদেব মণ্ডল ভাবছিল না, সুখদেবের সময় কোথায়! ঘরের দাবায় বসে গড়গড়া টানতে টানতে ভূত-ভবিষ্যৎ অতো ভাবার। কাজ করছিল সে, হাতে কাজ করার সময় বড় একটা ফুরসুৎ মেলে না। সকালেই পাইকেড়ে আসবে। তিন গাঁটরি পান গুছিয়ে গুনে সাজিয়ে বেঁধে-ছেঁদে রাখতে হবে।

—কি ভাবছ? আসন বুনছিল সুধারাণী, সুখলালের স্ত্রী। দাবার এককোনে বসে বসে আসন বুনতে বুনতে তাকিয়ে দেখছিল সুখদেবের দিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি মনে হলো তাই কথাটা বলে ফেলে।

—কিসের। মুখ তুলে তাকায় সুখদেব। সুধার সংগে চোখা-চোখি হয়। চোখে চোখে দুজনেই একটু হাসে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সুখদেবের ছেলেমেয়েরা গোলা গোয়াল-ঘর আর উঠানের মধ্যে খেলা করছে। পুকুর থেকে উঠে এসে কতকগুলো হাঁস উঠানে দাঁড়িয়ে প্যাঁক প্যাঁক করে চেঁচাচ্ছে। সুখলালের দুই ছেলে এক মেয়ে। দশ, সাত, পাঁচ। দেখতে দেখতে বারো বছর পার হয়ে গেল ওদের বিয়ে হয়েছে। মনে

আছে সেই দিনটা এগারই শ্রাবণ। সারাদিন ঝমঝম বৃষ্টি, অবাক কাণ্ড বিকেল চারটের সময় বৃষ্টি থেমে গেল। রোদ উঠলো, দিনের শেষ রাংগা রোদ, সন্ধ্যেবেলা আকাশে গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদ। এক আকাশ তারা। বনে জংগলে মুঠো মুঠো জোনাকি। ব্যাঙের ডাক, বাড়ি ভর্তি লোক, হ্যাচাকের আলো, টাটকা বেলফুলের মিষ্টি গন্ধ, বাইশ বছরের তাজা যুবক সুখদেবের সেদিন বিয়ে। তিন বোনের পর দুই ভাই হয়ে মারা যায়, তারপর সুখদেব। অনেক ঠাকুর দেবতার দোর ধরে, অনেক তাগা তাবিজ মাদুলি দিয়ে তবেই বেঁচেছে, শুধু বেঁচেছে নয়, ছেলের মত ছেলে হয়েছে, যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব চরিত্র, সুদর্শন স্বাস্থ্য, দেবকান্তি না হলেও সৌম্যকান্তি। লোকে ভাল বলে, ভালবাসে। পছন্দ আছে মা-বাপের, দিদিদেরও। এক-ভাই, ছোট ভাই তার বিয়ে। হোক সুধারাণী পাশের গাঁয়ের মেয়ে কিন্তু মেয়ের মত মেয়ে। দেখলেই বৌ করতে ইচ্ছে করে, ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ভারি মিষ্টি চেহারা। সব সময় কেমন গোছগাছ পরিচ্ছন্ন, প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ মেপে নিঁখুত করে গড়া। অথচ চমক নেই, নেই চালবাজি। বিয়ের আসরেই প্রথম দেখা, ফুল-সজ্জার বাসর ঘরের একান্তে কাছে পাওয়া এবং ভালবাসা। সে ভালবাসা আজও অটুট, অমলিন। সাধারণতঃ এমনটি হয়না। সুখদেবের জীবনে কোনদিনই সুখ স্থায়ী হয়নি। আবার নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখের মালিন্যও কদর্যতার কোন দাগ রেখে যায়নি। সুধার ভালবাসা, সুধার দরদী সহচর্য, কর্তব্য নিষ্ঠা আর বুদ্ধি চাতুর্যে অনেক দুঃখ শোক সে বারে বারে ভুলেছে, বারে বারে অনেক আঘাত আর বাধা বিপত্তি কাটিয়ে পায়ের তলার মাটি খুঁজে পেয়েছে। না, তার আর কিছু চাই না। দশ, সাত আর পাঁচ বছরের এই তিন ছেলেমেয়ে নিয়েই সে সুখী, ওরা বেঁচে থাক, সুখে থাক। ভুল হয়ে গেল। সেই পুরানো ভুল। সব বাবা মায়েরা যা করে থাকে। ওরা বেঁচে থাকবে, কি সুখে থাকবে

সে কথা ভবিষ্যৎ বলতে পারে। কে বলতে পারে কাল যদি সুখদেব মারা যায়। মানুষের তো কত ভাবেই মৃত্যু হতে পারে, কত ভাবেই তো মানুষ আচমকা অন্ধকারে হারিয়ে যায় তলিয়ে যায়। কে বলতে পারে ঐ সুধা, ওদের মা, তার প্রাণাধিক প্রিয়তমা—দুর ছাই কি সব ভাবছে সে।

"—হরি দুখো দাও যে জনারে।"

—কি হলো তোমার?

হেসে উঠে সুখদেব। গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে সুধার পাশে এসে বসে। হাতের হেঁসোটা দিয়ে পিঠ চুলকোয়। নোটিশ এসেছে ভালই হয়েছে, ছেলে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ভাবলে সুখদেব। মেয়েটার মুখটা ঠিক ওর মায়ের মতই হয়েছে সুধা বলে না মোটেই তারমত নয় একাবারে হুবহু বাপের মত। চোখ দুটো ভারি সুন্দর, মুখটা কি মিষ্টি, বাপকে বড্ড ভালবাসে। আবার নাক বিঁধিয়েছে। মায়ের মত নাকছাবি চাই।

"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে
"লেবুর পাতা করমচা..."

—ও বাবু! ঐ দেখ দাদা গাছে উঠছে।

—কি গো! তুমি কিছু বলছ না যে

সত্যি সুধাকে এখনও ভাল লাগে সুখদেবের এখনও অটুট আছে ওর দেহ লাবণ্য। কি করে থাকে ভেবে পায় না সুখদেব। ওমন বৌ না হলেই ছিল ভাল। মোটেই মানায় না তারমত অশিক্ষিত বুনো স্বভাবের গরীবের ঘরে। সুখ কি জিনিষ জানে না সুখদেব। কত দুঃখ মানুষের, কত কদর্য গ্লানিভরা অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করে চলেছে দুঃখী মানুষ। এই মেয়েই রাজার ঘরে গেল রাজরানী। বাপটা মারা যাবার পর তারিনী কাকার কাছে গিয়েছিল সুখদেব।

—কাকা একটা চাকরীদেবে তোমার কারখানায়?

তারিনী মিস্ত্রীর এক কথায় অনেককিছুই হয়। তারিনী কাকা, ছেলে

শালির ছেলে, ভাইপো ও আরও অনেককে কাজ দিয়েছে তার কারখানায়।

—তোর চাকরীর কি দরকার বাবা? চাষার ছেলে, বাপের এক ছেলে জমিজমা যা আছে করে কর্ম্মে খেলে ওতেই চলে যাবে। কলকারখানায় কোন সুখ নেই। কারখানায় যাবি বলছিস, কলজের সব রক্ত শুষে নেবে।

মনে মনে ভাবে সুখদেব তুমিও তো চাষার ছেলে তোমারও তো জমি জমা দু চার বিঘে আছে। তুমিও তো চাষ আবাদ করলে পারতে সুখের মুখ দেখতে আরামে শান্তিতে স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাতে পারতে।

—তা হোক তুমি একটা ব্যবস্থা করো।

—বলছিস্! ভেবে দেখ ভেবে দেখ।

অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সুখদেব। বাপ মারা গেছে, হাতে নেই পয়সা, চাষবাসের অবস্থা অন্তিম, বাপের শ্রাদ্ধের জন্যে দু' হাজার টাকা দেনা, প্রথম ছেলে তখন পেটে, অতল তলে তলিয়ে যেতে বসেছিল সুখদেব। বুড়ো বাপ প্রায় বিনা চিকিৎসায় তার চোখের ওপর মারা গেল। তারই শ্রাদ্ধের জন্যে তাকে শেষ পর্যন্ত জমি বন্দক দিতে হয়েছিল। আত্মীয়-স্বজন গ্রাম প্রতিবেশীতে ভরে গিয়েছিল বাড়ি। শ্মশান যাত্রী জুটেছিল ছেলে বুড়ো জোয়ান মরদ ও মেয়েদের নিয়ে দেড়শো লোক তার ওপর হরিনামের দল। ঘাট খরচ আর চোলাই মদই লেগেছিল চারশো টাকা। নিরুপায় সুখদেব এহেন অবস্থায় প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল পিতৃশোক। এক মাত্র এই সুধাই আশা উৎসাহে তার দুঃখ ভারাক্রান্ত দায়গ্রস্ত অসহায় মনে সাহস ও বুদ্ধি জুগিয়েছে। প্রেরণা দিয়েছে ঘরে বাইরে। চাকরী জুটেছিল তারিনী কাকার কারখানায়।

লোহা কারখানার চাকরী সে এক রক্ত ঝরা তিক্ত অভিজ্ঞতা। সে এক নিঃসহায়ের অপমানিতের অভিশপ্ত কারা জীবন। কারা

প্রাচীরের মধ্যে শত বাঁধনে জর্জরীত সে নিপীড়ন তার মত মুক্তমন মানুষের সহ্য হওয়ার কথা নয়। আজন্মকাল ধরে জলকাঁদা মাটি বুনো ঘাস জংগল কেটে চাষ আবাদ করে এসেছে তার মত মানুষের পক্ষে শ্রমদাসের এ জীবনে হয় তো দুটো পেটের ভাত হতো, তাতে না ভরতো পেট, না ভরতো মন ক্লান্তি, জড়তা। বৈচিত্রহীন দিনগুলোকে বোঝার মত টেনে নিয়ে চলেছে সে পাঁচ বছর ধরে।

তারপর একদিন ভোরবেলা কারখানার গেটে গিয়ে দেখে তালা ঝুলছে। ভিড় লেগে গেছে গেটে, জমেছে তিন সিপ্টের মানুষ চলেছে মিটিং মিছিল শ্লোগান। চারদিকে উত্তপ্ত আবহাওয়া। চারদিক ঘিরে ফিসফাস, গুঞ্জরণ, বিক্ষোভ, বিস্ফোরণ। কারখানা ঘিরে বন্দুকধারী পুলিশের দল, এপারে পুলিস রাস্তার ওপরে তিন তিনটে ইউনিয়নের তিন রকমের ঝাণ্ডার সেকি উত্তাল আওয়াজ। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলো, শুনলো ও বোঝবার চেষ্টা করলো কি করণীয় তার। দেখতে দেখতে বেলা বাড়লো। সুরু হলো লাঠিচার্জ, চললো ইটপাটকেল সোডার বোতল, তারপর বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুয়ে শুয়ে নিরস্ত্র নিরুপায় মানুষ, তার সহকর্মী সংগী সাথীরা ছুটতে আরম্ভ করলো রেল লাইন ধরে। আরও পুলিস এলো। গ্রেপ্তার হলো আরও বহুলোক। সুখদেব ছুটেছিল। জুতো হারিয়েছিল, হারিয়েছিল পয়সাকড়ি সবকিছু, জামা ছিঁড়ে ছিল, পড়ে গিয়ে হাত পা কেটেছিল। সারাদিন পথে পথে ঘুরেছে, ঘুরেছে কারখানার আশপাশ। সমস্ত ব্যাপারটাই তার মনে হয়েছিল সাজানো। শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল সে দেখেনি।

বাড়ি ফিরেছিল অনেক রাত্রে। ঘুমিয়ে পড়েছিল সারা গ্রাম। ঝিঁঝি ডাকছিল, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। নিকষ কালো অন্ধকার রাত, দুহাত দূরের মানুষ দেখা যায় না। দরজা বন্ধ। আগলওলা বাঁশের দরজা ভেতরে থেকে চেন দিয়ে তালা লাগানো বাইরে

থেকে না ডেকে উপায় নেই। কাউকেই ডাকতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া ডাকতে গেলে সুধা বা মাকেই ডাকতে হয়। এই ভাবে ওদের সামনে দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই তার। রাত জেগে বসে বসে ক্লান্ত শরীর মন নিয়ে হয়তো ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। কোন পরাজয় আর নৈরাশ্য বুকে নিয়ে মেয়েদের মুখোমুখি হতে ওর খুব খারাপ লেগেছে, ওদের স্নেহ ভালবাসা আর সান্নিধ্যের সুযোগ নেওয়াটা ওর ঘৃণ্য বলেই মনে হয়।

আমগাছ টপকে উঠানে নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়ে।

—কে ওখানে? ধড় মড়িয়ে উঠে বসে সুধা।

—ভয় নেই। একি তুমি দাবায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে?

লজ্জা পায় সুধা, কাছে এসে বসে সুখদেব।

—ইস! একি অবস্থা তোমার? বলে সুধা।

মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সুখদেব। উঠতে যাচ্ছিল সুধা, ওকে হাত ধরে টেনে বসায় সে। এমন মলিন হতশ্রী ঘর্মাক্ত চেহারা নিয়ে রাত দুপুরে চোরের মত গাছ বেয়ে এর আগে তাকে কোনদিনই বাড়ি ফিরতে হয়নি। দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে তার গা থেকে, ঘামের দুর্গন্ধ। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুধার মনটা ওর জন্য দুঃখ শোকে প্রেম আবেগে থর থর করে কাঁপছিল। মানুষটা বড়ই একা, বড়ই অসহায়! শুধু সে কেন নিশ্চয় তার মত কলকারখানায় সব মানুষেরই বুঝি আজ একই হাল। তার বাবাও যখন সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে সন্ধ্যের সময় ঘরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে খুঁটি ঠেস দিয়ে দাবায় এসে বসতো তার গা দিয়েও এই গন্ধই বেরুতো। এমনই উদভ্রান্ত আর দুর্বোধ্য মনে হতো তাকে।

—অমন করে কি দেখছ? হাসবার চেষ্টা করে সুখদেব। বড়ই করুণ ক্লান্ত দরদ ভরা সে চাহনী। বড় ভাল লাগে সুখদেবের নরম নরম ভীরু চোখে তাকিয়ে থাকা এই মেয়েটাকে। এটাই তার বৌ, তার সাথী, তার সন্তানের জননী। তার অপমানিত লাঞ্ছিত জীবনের বন্ধু। মুখটা ঠিক যেন পানের মত। বরজের ঢলঢলে সবুজ পান।

সুমিষ্ট গন্ধে ভরা মাদকতা জড়ানো লতার মতই সুখদেবের দেহ-মনের সংগে কবে থেকে জড়িয়ে গেছে।

—সারাদিন খাওয়া হয়নি নিশ্চয়? হাত পা ধোও, ছিঁড়ে কুটে এসেছ। কি ব্যাপার বলতো? সবাই ঘরে ফিরলো, কেউ বলতে পারলো না তোমার কথা। বাস রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম। শেষ বাস চলে গেল। ফিরে এলুম। ঘুমতে পাচ্ছি না তুমি নেই কেমন ভয় ভয় লাগছে। অন্ধকারকে ভয়। মনে হচ্ছিল কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছিল ঐ অন্ধকারে বুঝি তোমার বাবা দাঁড়িয়ে বলছেন 'যা বেটি ঘরে যা কোন ভয় নেই, ও ঠিক ফিরে আসবে।' আমি দেখেছি ঠিক অবিকল—দেখ দেখ গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। বলো আর কোন দিন তুমি এত দেরী করবে না?

—স্বপ্ন দেখেছ—নিশ্চয়। ছিঃ কাঁদে না সুধা।

—হ্যাঁগো ও ছাড়া কি অন্য চাকরী তোমার হয় না? কি যে মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দেখ না ভাল লাগে না।

ঝির ঝির বৃষ্টি, গাড়ো অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে থমথমে নীরবতায় ওদের শ্বাস প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। কোন্ অশুভ শক্তির দ্বন্দের পরিণাম তাদের মত এই সব শান্তি প্রিয় পরিবারের সুখ শান্তি, কর্মময় জীবনের সবটুকু আনন্দ কেড়ে নিচ্ছে? ভেংগে দিচ্ছে তাদের জন্ম জন্মান্তরের এ সোনা ফলা মাটির সংগে ঘর বাঁধার মানবিক বন্ধন? শুধু গ্রাসাচ্ছদনের জন্যেই বেঁচে থাকতে হবে। ছিন্নমূল এ জীবনের ভার বহন করে অশ্রদ্ধেয় এজীবনকে টেনে নিয়ে চলতে হবে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে অন্য কোথাও। সে অজানা জনপদে থাকবেনা কোন সামাজিক মানবিক মূল্যবোধ। আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার এ হীন বাধ্যতা মূলক প্রচেষ্টার প্রতি নেই কোন আন্তরিক সমর্থন। আদিম হিংস্র তীব্র এক প্রতিহিংসায় অন্তরের অবরুদ্ধ আবেগে সমস্ত চেতনা চৈতন্য জুড়ে মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে ঝড়

উঠে সুখদেবের। ঠিক তখন মনে পড়ে জীবনের অনেক কথা। ব্যক্তিগত আনন্দবেদনার স্মৃতির সংগে, জীবন জীবিকার ব্যর্থতা আর প্রতিবন্ধকতার প্রতিটি পদক্ষেপের সংগে তখন শুরু হয় বিপুল সংঘাত, ঠিক তখনই মনে পড়ে এই সব কথা। তাদের মত নির্দোষ মানুষের জীবন নিয়ে তামাসার দিন একদিন ফুরাবে নিশ্চয়।

—ও বাবু ঐ দেখ দাদাটা আবার গাছে উঠছে।

—কিগো তুমি কিছু বলছ না যে?

—দেখ দেখ মেয়েটা ঠিক তোমার মতই হয়েছে। ঠিক তোমার মত মিষ্টি চেহারা, তোমার মত চাহনী, তোমার মত—আমার পাগলী মা। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে সুখদেব।

"কানামাছি ভোঃ ভোঃ যারে পাবি তারে ছোঁ।"

—কি হলো গো তোমার?

—জান নুপুরের মা।

—আবার সেই নুপুরের মা! কেন নাম ধরে ডাকতে কি হয়?

—আহা! ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে। আর আমাদেরও বয়স হচ্ছে তো।

—যাওঃ একবারে বুড়ো হয়ে গেছ না? কি এমন বয়স হয়েছে শুনি?

—না, না, তেমন আর বেশী কি? এই ধরো তোমার বাইশ আর আমার আঠাশ। আরে আরে যাও কোথায় বসো বসো। সত্যি! আজও মাইরী তোমায় সকলের সামনে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করে।

—এই কি হচ্ছে। আঃ কি যে করো, ঐ দেখ ওরা দেখছে। ছাড়।

দেখতে দেখতে কটা বছর কেটে গেল। মনে হয় এই সেদিনের ঘটনা। অবশেষে কারখানাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আড়াই হাজার লোক ছাঁটাই হয়েছিল। দুশো লোকের জেল হয়েছিল নানান ধ্বংসাত্মক কাজের অভিযোগে। শহীদ হয়েছিল তিনজন। তারমধ্যে পুলিস মরেছিল একজন। চাকরীর সখ মিটে গিয়েছিল

সুখদেবের। মাঝে মাঝে সেই সব উত্তাল-পাতাল দিনগুলির কথা মনে পড়লে, মনে পড়ে শিবু, রাজু আর তার আদরের নুপুরের কথা। মনে পড়ে নুপুরের মা সুধার কথা আর মনে পড়ে তার অসহায় বিধবা মায়ের মুখ। সংসারের এই সব প্রিয় মুখ সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে ব্যাথা দেয়, আনন্দ দেয়, প্রেরণা হতাশায় তাকে কোরে তোলে উদভ্রান্ত উদ্বেল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো। উঠি উঠি করেও সুখদেবকে ছেড়ে সুধার উঠতে মন চাইছিল না। মাঝে মাঝে তারও বড় কষ্ট হয় সবচেয়ে প্রিয়তম দুর্বোধ্য এই মানুষটির জন্যে। কার সংগে বিয়ে হওয়ার কথা হলো কার সংগে! কে জানে হয়তো একেই বলে ভবিতব্য। আমতলার মুরারী গায়েনের ছেলে রমাপদর সংগে তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। বড় ঘর, অগাধ টাকা পয়সা জমি জায়গা, ছেলে বি. এ. পাশ. সুধাকে দেখে পছন্দ করেছিল মুরারী গায়েন স্বয়ং। তারপর রমাপদ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এসে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। শেষে মুরারী গায়েনের স্ত্রী বেঁকে বসে না, গ্রামের মেয়ে চলবে না। দুচারটে ছেলে মেয়ে হলেই ওসব রূপ যৌবন ধুয়ে মুছে যাবে। শহরের শিক্ষিত মেয়ে চাই। শুধু শাখা সিঁদুর দিয়ে বিয়ে হয়না—হোক সে রূপসী। সুধার বাপ মা মনে বড়ই আঘাত পায়। বিয়ে ভেংগে যায়। এমনি করে একটা বছর পার হয়ে যায়। আর কথা উঠেনি। কেউ সাহস করে নি কথা তুলতে।

— আরে! তুমি তারাপদদার ছেলে সুখদেব না? কোথায় চলেছ বাবা?

—আজ্ঞে দিদির বাড়ি। পথ চলতে থমকে দাঁড়িয়ে-বৃদ্ধের প্রশ্নের সপ্রতিভ উত্তর দেয় সুখদেব।

—কে গো? বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে এক প্রৌঢ়া মহিলা।
—তারাদার ছেলে গো। সুখদেব। দেখতে দেখতে কত বড়

হয়ে গেছে না ?

—ঘরে নিয়ে বসাও না।

—আজ্ঞে আমি যাব অনেকটা পথ। দেরি হয়ে যাবে।

—কেন বাবা আমরা গরীব বলে বলছ !

—কি যে বলেন আচ্ছা চলুন চলুন।

জলের কলসি নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে-পড়েছিল সুধা। বাঃ কি অপূর্ব চেহারা। কি সুন্দর কবির মত চোখ, কি বলিষ্ঠ গড়ন, কি অদ্ভুত স্নিগ্ধ বিনম্র সারল্যে ঝলমল করছে তারুণ্যের যৌবন। কিগো সুন্দরী পছন্দ হয় ? খুউব্। বে করবে ? এক্ষুনি। ওমা ছিঃ ছিঃ এ কি ভাবছে সুধা। সে সহরের মেয়ে না হলেও, কলেজে না পড়লেও পড়াশুনো সে জানে। বংকিম, শরৎ সে পড়েছে। রবীঠাকুর, জীবনানন্দের কবিতা আজও পড়ে। এই গ্রাম জীবনের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সকল সন্ধ্যায় বোলপুরের শান্তি-নিকেতন আর শহর কলকাতা ঝলমলিয়ে উঠে তারও মনে। তারও মন আছে আছে রুচি। কলকাতা তো এমন কয়েকশো মাইল দূরের ব্যাপার নয়। কলকাতায় তো আর সবাই শকুন্তলা আর তিলোত্তমা নয়। মুরারী গায়েন নিজেও গ্রামেরই চাষীর ঘরের ছেলে। কালোবাজারে ধানচাল বেঁচে আর সুদের তেজারতি কারবার করে করেছে দুটো পয়সা। সেই পয়সায় বি. এ. পাশ করিয়েছে তার ছেলেকে। ঐ বি. এ পাশ ছেলে এখন থেকেই তো বাপের কারবার দেখা শোনা করে। কাঁচা পয়সার ব্যাপার যার তার হাতে ছাড়া যায় ? সেই পয়সায় তার গাড়ি বাড়ি নাম যশ। সেই পয়সার ওপর দাঁড়িয়েই তো তার স্ত্রী তাকে খারিজ করেছে। মুরারী গায়েন আর রমাপদর আবার তাকে পছন্দ করা ঐ একই কারণে অভিন্ন। যদিও তার মতামত কি রমাপদ কি সুখদেব কারু বেলাই গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে সুখদেবকে আড়াল থেকে অপলক দৃষ্টি দিয়ে দেখার পর আপন যৌবন গর্বে দোলা লেগে স্তব্ধ বিস্ময়ে চমকে যায় যুবতী মন।

তারপর আসে সেই বৃষ্টিঝরা স্মরণীয় এগারই শ্রাবণ। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য একটি দিন একটি রাত। কার সংগে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল হলো কার সংগে।

—মুখ তো নয় সবুজ বরজের পান।

—কে? কে বললো কথাটা? সুখদেবের বাড়িতে পা দিয়ে এই প্রথম এবং একবার মুখ না তুলে পারেনি সে। নয়া কনের রাংগা মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়েছিল রমনীয় সে লাজুক দৃষ্টিতে।

—আমার মা! প্রনাম করো। চোখে চোখ পড়তে ফিস-ফিসিয়ে বলেছিল সুখদেব। সেই তার প্রথম কথা। কথাটা ভারি মনে লেগেছিল সুধার। তার মুখটা বরজের সবুজ প্রাণ। আজও মনে আছে।

চাকরী যাবার পর অনেক বাধা বিপত্তি সত্বেও বরজ গড়ে তুলেছিল সুখদেব। বাধা দেয়নি সুধা, বাধা দেয়নি সুখদেবের মা। তাছাড়া গাঁয়ের পাঁচজন আত্মিয়-স্বজন অনেকেই ভয় দেখিয়েছিল। দেবতার ভয়, সাপে কাটার ভয় বরজ সবার সহ্য হয় না। সংসারের অকল্যাণ হয়, বংশে বাতি দিতে কেউ থাকে না কোন কথাই শোনেনি সুখদেব। মাটির সংগে সে মাটির মত মিশে গেছে। দিনের পর দিন সে অন্য লোকের বরজে বরজে ঘুরে বেড়িয়েছে। হাটে গেছে বাজারে গেছে। মাটি চিনেছে, চিনেছে পাতার শত্রু পোকা মাকড়। নিজে হাতে মাটি তৈরী করেছে রাত জেগে। রাত জেগে পাহারা দিয়েছে। মাটি তো মায়ের সমান। তার মা যখন বাধা দেয়নি তখন কিসের ভয়। মাকে সে ভালবাসে ভক্তি করে। মাটিকেও সে ভালবাসে, মাটি অন্নদাতা, প্রাণপণ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে সে বরজ গড়ে তোলে। এই বরজই তার দেনা শোধ করেছে। জুগিয়ে চলেছে এতগুলো লোকের মুখের অন্নজল। এতগুলো মানুষের আস্তি দিয়ে গড়া এই সবুজ প্রাণবন্ত বরজ মরা মানুষ বাঁচিয়ে তুলেছে। না এখনও তার পরিবারে ক্ষয় ক্ষতি হয় নি। এখনও মায়ের কোল শূন্য করে তার ঘরে কান্নার হাহাকার

উঠেনি। তার জীবনের সৎ প্রচেষ্টা তার সংগে বেইমানী করেনি।
—সুখদেব আছ না কি?
ধক করে উঠে সুখদেবের বুকটা। সুধা সুখদেব পরস্পরের দিকে তাকায়। নিঃশব্দে উঠে সুধা ঘরে চলে যায়। তারিনী খুড়ো প্রবেশ করে।
—এসো কাকা। সন্ধ্যে বেলায় কি মনে করে?
তারিনী খুড়ো চোরের মত এদিক ওদিক তাকায়।
—বৌমা নেই তো?
পচা চোলায়ের গন্ধে বমি উঠে আসে। গন্ধ নাকে আসে সুধারও পান খাওয়া কালো দাঁতগুলো ভেংগে মিশিয়ে গেছে মাড়ির সংগে।
—এই সামান্য একটু টেনেছি। ঐ আঁটখুড়ির ব্যটা গোবিন্দটা যাক বাবা তুই লুটিশ পেয়েছিস তো?
—কি ব্যাপার বলতো কাকা?
—শুনলুম এখানে একটা বিরাট হাসপাতাল হবে। কেউ বলছে মিলিটারী ক্যাম্প হবে। আবার কেউ কেউ বলছে বিড়লা নাকি একটা বিরাট কারখানা করবে। কি হবে বলদিকি? কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না
—এখানে কি হবে জান কাকা?
—কি হবে বলদিকি বাবা।
—আমি যা শুনলুম তা একাবাবে পাকা খবর। ওসব হাসপাতালও হবে না। কারখানাও হবে না। এখানে বিরাট একটা কবরখানা হবে। দেশে মানুষ খুব বেশী হয়ে গেছে। স্বাধীন দেশে কুকুর বেড়ালের মত এত মানুষ জন্মালে কি কিছু করা যায়! তাই কর্তারা ঠিক করেছে আমাদের তিন তিনটে গ্রাম দখল করে নিয়ে বিরাট এক গর্ত খোলা হবে। তারপর জ্যান্ত মানুষগুলোর হাত পা বেঁধে টেনে ফেলে দেওয়া হবে ঐ কবরে। তারপর মাটি চাপা দেওয়া হবে।

—আরে রামো রামো। চুপ চুপ। কি আজে বাজে বকিস না তুই তুইও কি টেনেছিস আমার মত? তোর আর কি বরজ করে হাতে দুটো কাঁচা পয়সা করেছিস একদেশ ছেড়ে অন্যদেশে গিয়ে জমিয়ে বসতে পারবি। আমাদের মত লোকের কি অবস্থা হবে বল দেখি?

—সেই জন্যেই তো নিজের কথা ভাবিনা। কেবল তোমাদের কথাই ভাবছি। সত্যি তোমাদের মত চোর, জুয়াচোর দালাল ধাপ্পাবাজদের কি হবে! মাটি আমাদের মা যেখানে যাবো দুটো অন্ন জুটিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু যারা মানুষ বিক্রী করে, রক্তের পয়সায় শহরে মোকাম তোলে, ধান জমির ওপর কলকারখানা গড়ে, তাদের কি হবে? যারা সেবাদাসের মত সারা জীবন খেটে গেল আমি ভাবি তাদের কি হবে?

—তুই আমায় গালাগাল দিচ্ছিস সুখদেব? শুয়োরের বাচ্চা বললি, দালাল বললি? ঠিক আছে আমি তোকে দেখে নেবো। শালা বেইমান দুটো পয়সা হয়েছে না? একসময় তোকে আমার কারখানায় চাকরী দিয়েছিলুম। আজ বরজ করে পয়সা হয়েছে তোর। এই ভর সন্ধ্যে বেলা তোর ভিটেবসে বলে যাচ্ছি তোর বংশে বাতিদিতে কেউ থাকবে না। আমিও মরবো তুইও মরবি। তারিনী খুড়ো হনহনিয়ে বেরিয়ে যায়।

—এ তুমি কি করলে? একটা বুড়ো মানুষের মনে এভাবে আঘাত দিলে ছিঃ ছিঃ!

সুধা ওর সামনে এসে বসে পড়ে। ছেলে মেয়েগুলো অবাক হয়ে ওদের বাবা মাকে ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের বাবাকে কোন দিন ওরা রাগতে দেখেনি। কথাগুলো একচটকায় বলে ফেলে সুখদেব নিজেও কম অবাক হয় নি। তার মত লোক যে ঐ ভাবে বলতে পারে এই সে প্রথম দেখছে। সত্যিই তো দিনকাল খারাপ এই সব কথা পাঁচ কান হলে তার সমূহ বিপদ। কোথা দিয়ে কি হয় কিছুই বলা যায় না। যদি খুড়ো অঞ্চল প্রধানের

কাছে যায়। অঞ্চল প্রধান যদি কথাটা জেলা হাকিমের কানে তোলে, জেলা হাকিম যদি কথাটা মন্ত্রী অথবা পুলিসের কানে তুলে দেয় তাহলে নিশ্চয় তার জেল হবে।
সরকারকে অবমাননার দায়ে সুখদেব মণ্ডল নামক জনৈক্য চাষীর দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

দশ বছর পর ফিরে এসে সুখদেব মণ্ডল দেখবে, তারগ্রাম বলতে কিছু নেই। ধু ধু করছে মাঠ। সবুজের একটুকু চিহ্ন নেই কোথাও। একটা জনপ্রাণী নেই যে বলতে পারে কোথায় তার ছেলে বৌ, মা, কোথায়ই বা গেল তারিণী খুড়োরা। পাথরের মত শক্ত হয়ে নিশ্চুপ বসে রইলো সুখদেব। তার চোখের ওপর সূর্যঝরা সাদা আগুনের কালো কুয়াশায় একটা ছোট্ট কাগজ হাওয়ায় উড়তে উড়তে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে আছে ধু ধু করা শূন্য কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা একটি বিরাট প্রান্তরের সামনে। সেখানে একটা সাইন বোর্ড ঝুলছে।

নোটিশ
এই জমি থেকে সরকারী দখল দাবী
নোটিশ
প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো।
জমির পূর্বতন মালিকেরা কাগজ
পত্র সহ ....

তারপর অক্ষরগুলো কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে। বোঝা যায় না। আর পড়া যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট। কলিকাতার অফিস পাড়ার একটি রাস্তার নাম। কাজ খুঁজতে খুঁজতে অনেকেই এপাড়ায় এসে পড়ে। আমাদের অমলও এসে পড়েছিল। অমল কি নাগরিক? একটি স্বাধীন দেশের? ব্রিটিশের উপনিবেশ ভারতবর্ষ এখন একটা স্বাধীন দেশ। ইউনিয়ন জ্যাক যেদিন ঐ রাজভবনের মাথায়, রাইটাস বিল্ডিংয়ের ওপরে জি.পি.ও-র চূড়ায় উড়তো অমল গল্প শুনেছে বাপ কাকার কাছে তখন পরাধীন থেকেও আমরা অনেক ভাল ছিলাম রে। তোদের মত পথে পথে আমাদের বছরের পর বছর কাজ খুঁজতে হতো না। ইয়েস স্যার, নো স্যার আইসন, মাইসন স্যার। বলতে পারলেই ব্যস তোমার দশটা পাঁচটার চাকরী বাঁধা। ঘণ্টা বাজিযে তখন এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট থেকেই লোককে ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিত।

রেল, ডক-পোর্ট, কল-কারখানায়, খনি বাগিচায় ঘণ্টা বাজিয়ে, ঢেঁড়া পিটিয়ে লোককে ডেকে কাজ দেওয়া হতো। তখন গোটা ভারতবর্ষটা ছিল ইংরেজের উপনিবেশ। আমরা ছিলাম পরাধীন দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আর এখন? অমল ভাবে সত্যিই সে কি নাগরিক? ভারতবর্ষের মত একটি স্বাধীন দেশের? দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ পঁচিশ বছর?
আজও পথে পথে কলে-কারখানায় ক্ষেতে বাগিচায় লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ খুঁজছে। এই ভারতবর্ষে একদিন ছিল কাজ মানুষকে খুঁজতো।

আর আজ?

টাটা, বিড়লা, গোয়েংকা, সিংহানিয়া, ডালমিয়া, বাজাজদের কত কল-কারখানা, অফিস।

আমাদের বাপ দাদারা শোষণের বিরুদ্ধে, সমস্ত রকমের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে পরাজিত বিতাড়িত করেছে। এখন জি. পি.ও রাইটার্স, রাজভবনে উড়ছে ত্রিবর্ণ অশোক চক্র (সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পতাকা) পতাকা।

সেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে দাঁড়িয়ে অমলের মনে পড়ে বাপ-কাকার মুখ থেকে শোনা সেই সব কথা। ভেবে পায় না একজন স্বাধীন দেশের কাজ না পাওয়া শিক্ষিত মানুষ জন্মগত ভোটাধিকার যে অর্জন করেছে সে কোন শ্রেণীর নাগরিক?

সাতচল্লিশ থেকে বাহাত্তর এই পঁচিশ বছরে এদেশ একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ। বয়েস তারও পঁচিশ। লক্ষ কোটি শ্রমশীল মানুষের গ্রাম ও শহরে আজও কাজ খোঁজার কাজ শেষ হলো না। কাজ না পেলে না খেয়ে থাকতে হয়, মানুষ বিপথ-গামী হয়, নারী দেহজীবিনী হয়। আসে আত্ম প্রতারণা, আত্ম হত্যার প্রবণতা।

প্রতিবাদ?

না প্রতিবাদ করতে নেই। অপরের ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের দিকে চোখ তুলে তাকাতে নেই। ধনীকে, পুঁজিপতিকে, চোরা কারবারী কালোবাজারীকে দোষী করতে নেই। অমল তুমি পথ হারিয়েছ? জীবনে বিশ্বাস হারিয়েছ? তুমি কি ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শের কথা বিস্মৃত হয়েছ? এই পঁচিশ বছর ধরে দেশব্যাপী এত যে বাণী বেতারে, কাগজে, পত্রে সিনেমায়, মাঠে ময়দানে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে লোক সভায়, বিধান সভায় সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে, পরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুরাষ্ট্র আজ স্বাবলম্বী হতে চলেছে তুমি কি এসব মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয়? অতীব আফশোষের কথা।

আমাদের পাড়ার অমলকে আপনারা সবাই চেনেন। আমরাও

চিনি। ঠিক কথা অমল পঁচিশ বছরের তাজা যুবক। সে নাকি এখনও বেকার! দেখি সে ঘুরে বেড়ায় কাজ খোঁজে কাজ পায় না। কি জানি কেন পায় না। এত ব্যাঙ্ক, কল-কারখানা, অফিস—এ কেমন কথা অমল চাকরী পায় না? অমলের মা আমাদের মাসিমা অমলকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতেন। ছেলে লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরী করবে। সুন্দরী সৎ পাত্রী দেখে ছেলের বিয়ে দেবেন। রোগটা কি জানা যায়নি—মাসিমা সেই রোগেই মারা গেলেন। স্বপ্ন রাজ্য ছেড়ে মাসিমা স্বর্গরাজ্যে চলে গেলেন। রোগ মাত্রই—চিকিৎসা আছে—ছিল না অমলের বাবা মশাইয়ের হাতে পয়সা। পয়সার অভাব মানেই অপমৃত্যু। মৃত্যু—মানেই মুক্তি।

এই পশ্চিম বাংলার কোন মায়ের সন্তানকে ঘিরে সোনার স্বপ্ন সফল হওয়ার কথা অমলের জানা নেই। বোধ করি অমলের মাও জানতেন না একজন যুবকের চাকরী পাওয়া রীতিমত স্বপ্ন। স্বপ্ন মানেই অবাস্তব। বাস্তব বড় কঠিন জিনিষ। যেমন এখনও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না আমরা স্বাধীন। এখনও আমরা ভুলতে পারিনা পরাধীন ছিলাম।

যেমন আজও আমরা অভ্যাসবসে বলি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ানষ্ট্রীট। মানুষের জীবনে জটিলতা এত বেড়েছে—যেখানে স্বপ্নের মত মনোরম ললিতকলার কোন ঠাঁই নেই। অমল অবশ্য স্বপ্ন দেখতো না। সব সভ্য স্বাধীন দেশের নাগরিক যদি মোটামুটি শিক্ষিত হয়—যে রকম পরিকল্পনা করে অমলও সেই রকম ভেবেছিল জীবনটা পড়াশোনা আর সাংস্কৃতিক গবেষণা নিয়ে কাটিয়ে দেবে।

আজ স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পর অর্থাৎ বাহাত্তর সালে শহর কলকাতায় বসে এই জাতীয় কল্পনার কথা কেউ যদি ভাবে তা হবে বিজাতীয় ব্যাপার। অচল।

একজন লেখাপড়া জানা ছেলের চাকরী হয় না—সম্পূর্ণ বাজে কথা ছাড়া কি? স্রেফ্ অপ প্রচার। হয় না মানে? হওয়া তো

বন্ধ হয়ে যায়নি? ভাবুনতো লোকসংখ্যার কথা। ভাবুন তো পর্বত প্রমান সমস্যার কথা! তাছাড়া লেখাপড়া শিখলে চাকরী পেতেই হবে এমন কি কথা আছে। লেখাপড়া মানে পড়াশোনা সেতো সম্পূর্ণ রুচির প্রশ্ন—দেশ সেবার মত দেশকে নিরক্ষর মুক্ত করা। তার সংগে রুজি রোজগারকে জড়াতে হবে? তাকে তো কেউ বাধ্য করেনি লেখাপড়া শিখতে? পরিবার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে লোক সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার যে লোকশিক্ষা তা কি মানুষ শুনছে? মেনে চলছে? সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার ডাকে যে দেশের মানুষ সাড়া দেয় না—তাদের ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখদুর্দ্দশার জন্যে তারাই দায়ী। কত লোক তো লেখা পড়া শিখছে না চাকরী পাচ্ছেনা, কি হয়েছে তাতে? এসব যুক্তিগ্রাহ্য কথা অমলের উর্ব্বর মস্তিষ্কে ঢোকে না। অমলের শুধু এক কথা একটা কাজ চাই। সে কাজ কল-কারখানা হোক, বা ক্ষেতে-খামারে যেখানে হোক। এছাড়া অন্য অনেক কথাই সে মনে রাখে নি। সেগুলি যদি অমল মনে রাখতো কাজ না পাওয়ার নৈরাশ্য, ক্ষোভ, হতাশা থেকে রেহাই পেতো। চাকরীর এপ্লিকেশনের 'রজত জয়ন্তী' হয়ে গেছে অমলের।

কারখানায় কারখানায় আজকাল আর ভিড় নেই।

কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে ভিড় নেই।

'নো ভেকেন্সি'—লটকে দেওয়া ।

বেলিলিয়াস রোড থেকে হাইডরোড, বেহালা—থেকে নৈহাটির কলকারখানায় হয়ে গেছে কতশতবার লে অফ, লক্ আউট, ছাঁটাই। সেই সব ওয়েলডার, মোল্ডার, ফিটার, টার্ণার, কেউ ফেরিওলা, কেউ হকার বেকার।

কলকাতার কফি হাউস, রেষ্টুরেন্ট চায়ের দোকান—সব সময় গরম। প্রায় পঁচিশের যুগে এক কথা। বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কোন দাম নেই।

মানে পশ্চিম বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা বুর্জোয়া? মানে বুর্জোয়া

শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে সরকার? কি অসম্ভব কথা?
নিরক্ষর মানুষের, দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে না?
সত্তরের দশকের প্রচণ্ড অস্থিরতায় উদ্বেলিত বিভ্রান্ত যুবক মন।
পথ চায় সে। এগিয়ে চলার পথ। চায় পায়ের তলায় শক্ত মাটি।
আশাবাদি অন্তরে অদম্য দুর্ব্বার প্রাণের আবেগ।
তাকে বিপথগামী করতে কোন মতাদর্শের প্রয়োজন আছে কি?
রক্তের রং লাল, মৃত্যুর-নীল; ফসলের—সবুজ।
শহর শহরতলীতে হিপিদের ভিড় বাড়ছে।
মিছিলের নগরী কলকাতায় বড় একটা গোনা যায় না
কলে মজুর, ক্ষেতে কৃষান জোট বাঁধে।

দুরদুরান্ত থেকে মেহনতী মানুষের দুর্ব্বার মিছিল দেখা যায় না।
নিউইয়র্ক থেকে ছুটে আসছে কাঁধে ক্যামেরা লম্বাচুল হিপির দল
অর্দ্ধ উম্মাদ, মদ্যপ, জীবনের মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত। অবক্ষয়
রোগ পুষ্ট নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এগিয়ে চলুক নৈতিক অপমৃত্যুর দিকে।
মানুষের দাম কমছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ছে।
অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছে, ছুটে আসছে দিল্লী থেকে পাঞ্জাব,
হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার বরাকর নদী পার হয়ে পশ্চিম
বাংলার দিকে। দিল্লীর গ্রীণরুম থেকে লাল বাজার কন্টোল রুম
পর্যন্ত হটলাইনে নিরবিচ্ছিন্ন ঘন ঘন গোপন নির্দেশ আসে।
সত্তরের দশক—মুক্তির দশক।

অনেক তাজাবুকের রক্তদিয়ে, অনেক যুবকের অমূল্য জীবনের
বিনিময়ে শোষণের স্বৈরাচারের ভিত গড়ার কাজ চলছে।
এসব কথা অমল বুঝতে চায় না। অমল যদি বিশেষ বিশেষ
দাদাদের লোক হতো তার চাকরী কে মারে। চেয়ার দখলের
ওভারটাইম কমাওয়ের আন্দোলনে যোগ দিয়ে সবুজ বিপ্লবের
ডাকে যারা সাড়া দেয়না তারা অবাধ্য দুর্বিনীত—লাল সন্ত্রাসবাদী।
নিশ্চয় অমল লাল সন্ত্রাসবাদী। তা নাহলে অমলের চাকরী হয়
না। আর যদিও বা চাকরী পায় এইসব ছেলেরা তারা যে কলে

কারখানায় লাল ঝাণ্ডা করবে না কি গ্যারান্টি আছে ? এদের চাকরী দিয়ে ফের যদি এখানে ফ্রন্ট সরকার ফিরে আসে ? বিপ্লব। বিপ্লব যদি করতে হয় মুক্তিসূর্যের নেতৃত্বে সবুজ বিপ্লব গড়ে তোলো। উৎপাদন বাড়াওয়ের আন্দোলনে যোগ দাও। এসব অমল বোঝে না। বোঝে না চাকরী পাবার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে এসবের মূল্য কত। অমল ছেলে ভাল লেখা পড়া জানে এটাই কি তার যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। আসলে অমল ভয় পায় এসব কথা না বোঝাই ভাল। বুঝলে বিপদ আছে। যে কোন দিন যে কোন জায়গায় তার লাশ পড়ে যেতে পারে। পথে ঘাটে শহরে বুক বেঁধে এসব কথা বলার আজ কত বিপদ কে না জানে।

নকশাল বাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও।
পথে পথে আজ আর লেখা হয় না। দেওয়ালে দেওয়ালে চিয়ারম্যান মাও যুগযুগ জিও লেখা হয় না।

লাল আলো নিভে গিয়ে সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে।

এশিয়ার মুক্তি সূর্য যুগ যুগ জিও।

বাহাত্তরের কলকাতায় সার্থক ভাবে সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। আর কোন সমস্যা থাকবে না। দম বন্ধ করা খুন জখম সন্ত্রাসের অবশান হয়েছে। তাকিয়ে দেখ মহানগরীর দিকে দিকে শান্তি শৃংখলা, চারিদিকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। সকল সন্ধ্যায় রীজ, গ্রাণ্ড, গ্রেটইষ্টার্ণের নিয়ন আলোয় কত শত দুধেলা শরীর আরামে উলংগ তলপেট জড়িয়ে ধরার স্বাধীনতা পেয়েছে। ক্ষরা লাগা গ্রাম বাংলার সোনার ফসলের সবুজ লাবণ্যে কতশত রক্ত লোভীরা ছুরিতে শান দেওয়ার স্বাধীনতা পেয়েছে। এই বাংলা সোনার বাংলা হবে। এই শহর হবে উদ্যান নগরী। গ্রামে গ্রামে জ্বলবে বিজলী বাতি। এই বাহাত্তরেই এক লক্ষ বেকার কাজ পাবে। তাকিয়ে দেখ ভবিষ্যৎ কথা বলছে ক্রুশ্চেভের মুখে। বেয়াদপ কৃষক মজুর, বেয়াদপ সরকারী কর্মচারীর দল, অলিগলি বস্তির বেজন্মা অবাধ্য সর্বহারা দেখছনা—কলকাতার

হৃদপিণ্ড চিরে পাতাল রেল হচ্ছে ? দেখছ না গরিবী হটাও ফিরে গেছে গ্রামে।

কোথাকার কে অমল চাকরী পাচ্ছে না বলে গল্প লেখা হচ্ছে। কেন তার চেয়ে প্রেমের কবিতা লেখ। 'লাল গোলাপ কে' নিয়ে কবিতা লেখা হয় নি ! লেখা হচ্ছে না যুবতী অংগ নিয়ে বিমুগ্ধ যৌবনের ভালবাসার ব্লো-হট নাটক ? এতে অর্থ আছে, সাচ্ছন্দ্য আছে, আছে নগদ মূল্যে মোটা পুরস্কার।

ব্যাপারটা কি অমল চাকরী চায় এইত ?

নিয়োগ কর্তাকে খুসি করার মত যোগ্যতা যদি অমলের থাকে আমি বলছি নিশ্চয় সে চাকরী পাবে।

—কি অমল তুমি রাজি ?

—রাজি। যে কোন জায়গায় যে কোন নিয়োগ কর্তার সামনে ইন্টার ভিউ দিতে রাজি।

—বেশ আমি লিখে দিচ্ছি চলে যাও। আমি মন্ত্রী আমি লিখে দিচ্ছি বলে নয় ঐ ফার্মে লোক দরকার। বহুরাজ্য থেকে এখানে মানুষ চাকরী করতে আসে। ভারতের বহু উদীয়মান শিল্পপতি এই পশ্চিম বাংলায় ব্যবসা করে ফেঁপে ফুলে গেছে— পশ্চিম বাংলার একটা সুনাম আছে। বাণিজ্য লক্ষ্মী এখানে বাঁধা। আশা করি তুমি যোগ্য পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হলে ওরা অবশ্যই তোমায় নিয়োগ করবে।

—আসুন, আসুন, মি· মজুমদার ! আপনার নামইতো অমলেন্দু মজুমদার তাই না ? আপনি তো মি· রায়ের রেফারেন্সে আসছেন ?

—ইয়েস স্যার।

এতদিনে মনেহচ্ছে অমলের একটা চাকরী হলো। বহু কষ্টে আপ্রাণ চেষ্টায় সে স্বয়ংমন্ত্রীর সু-নজরে এসেছে। এমন সৌভাগ্য কল্পনার হয়। এখন মনে হচ্ছে সত্যিই দেশ এগুচ্ছে। তা নাহলে একজন রাশভারী চেহারার কোম্পানীর হোমরা চোমরা নিয়োগকর্তা এত তোয়াজ করে আন্তরিকতার সংগে বসতে বলছেন। হেসে কথা

বলছেন। অমল ভাল ভাবে চেয়ারে বসে। রুমাল দিয়ে মুখ থেকে মুছে ফেলে অবহেলা আর ক্লান্তির দাগ।

আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এবার কণ্ডিশন রুমের প্রতিটা জিনিষের দিকে তাকায়। হ্যাঁ অফিস বটে একটা। এই রকম অফিসে কাজ করে সত্যি সুখ আছে। জানপ্রাণ দিয়ে সে খেটে বুঝিয়ে দেবে সে কর্মী হিসেবে কত বিশ্বস্ত ও যোগ্য। আধুনিক জগতের শিল্পপতিদের এ উদারতার তুলনা লণ্ডন, নিউইয়র্কের সংগেই করা চলে। মনে হচ্ছে সে খোদ লণ্ডন অথবা নিউইয়র্কে এসে পড়েছে। না, তা নয় এটা ভারতবর্ষ। ঐ তো মহাত্মা গান্ধীর ফটো ঝুলছে, তারপর মুক্তিসূর্য, তারপর ভারতবর্ষের মানচিত্র। ঐ দেখা যায় বংগোপসাগরের নীল জলরাশি। লাল বর্ডার দিয়ে চিহ্নিত পশ্চিমবংগ। বাংলাদেশকে এখনও ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হয় নি।

ভারিশিল্পের পাশাপাশি এই ভাগীরথী তীরে গড়ে উঠেছে হালকা শিল্প। একচেটিয়া পুঁজির নেতৃত্বে মাঝারি ছোট ক্ষুদেশিল্প মালিকেরা বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে প্রতিযোগিতায়। এই দেশ বাংলাদেশ পশ্চিম বাংলায় ক্রমবর্দ্ধমান কাজ চাই মানুষের ভিড়। অবুঝ বিস্ময়ে চোখ হারিয়ে যায় সবুজ অরণ্যে। অন্ধমন অদৃষ্ট হাতড়ায়। সম্পদের পাহাড়ের নীচে জমেছে ভুখামানুষ! চারিদিকে পুলিশ ভ্যানের সদা জাগ্রত দৃষ্টি।

—'কোন কথা নয়, কাজ করো, উৎপাদন বাড়াও—নাহলে ধ্বংস হও। জীবনকে ভোগ করো। ভাল চাকরীতে ভাল মাইনে, গাড়ি, ফ্রিজ, সুন্দরী বৌ। সিনেমা দেখ। রংগীণ ছবিতে আছে আদুল-প্রেম মহব্বৎ। টি. ভি. দেখ; রেডিও শোন। শূন্য বুক ভরে নাও সুরের তরল ফেনায়। ভারতবাসী এক সনাতন জাত। তার আছে বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী। ঐ সেই গান্ধীজির ফটো।

আমার জীবনই আমার বাণী।

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র নিজস্ব রীতিতে বিকশিত হচ্ছে।

মুক্তি সূর্যের নেতৃত্বে দেখছ না এসিয়া জাগছে ?

—আচ্ছা মি. মজুমদার ! আপনি কোন পার্টি করেন ? মানে কোন পার্টি আপনি পচ্ছন্দ করেন ?

—মাপ করবেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—না, না, চাকরী আপনার হবে। সে সব আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি মি. রায়ের রেফারেন্সে এসেছেন বাই দি বাই আপনার সংগে একটু ওপেনহার্ট আলাপ করতে চাই। বলুন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ? পৃথিবীর কোন দেশ আপনার বেশী ভাল লাগে ?

—পৃথিবীর সব দেশই আমার ভাল লাগে। তবে রাশিয়া আমেরিকা—

—রাশিয়া কেন ভাল লাগে ?

—ওদেশে টলষ্টয় আছে, আছে গোর্কি, চেকভ, পুশকিন—।

—আমেরিকা ?

—আমেরিকায় ও'হেনরী আছে, আছে পলরবসন, চার্লি-চাপলিন, ফিসার।

—চমৎকার। চার্লির কি ছবি আপনি দেখেছেন ?

—গ্রেট্‌ ডিক্‌টেট্‌র, গোল্ডরাশ, দি কিড্‌।

—নাইস। আচ্ছা বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি কি মনে করেন মি. মজুমদার এই সরকার স্থায়ী হবে ?

—আমি স্যার রাজনীতি করি না। আমি সাহিত্যের ছাত্র।

—সেকি ! আজকের দিনের যুবক রাজনীতির বাইরে থাকবে এটা হয় নাকি ? সাহিত্য, সংবাদ পত্র, টি. ভি. ফ্লিম্‌ এ সব তো রাজনীতি প্রচারের বিরাট মাধ্যম। আমিও ট্রেডইউনিয়ন করা এনকারেজ করি। ইউনিয়ন গড়ে তুলতে ছেলেদের উৎসাহ দিই। দেশে এখনও যথেষ্ট দুঃখ আছে, দারিদ্র আছে, একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা চোরাকারবার করছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়াচ্ছে। দু'নম্বরী টাকায় বাজার ছেয়ে গেছে। এম. এল. এ

কেনা বেচার মত মানুষের সমস্ত মূল্য বোধকে যেন-তেন মূল্যে কেনা বেচা চলছে। বাড়ছে খুন সন্ত্রাস। আর আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ চাকরী চাইছেন অথচ এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে রাজনীতি বোঝেন না ?

—আমি এক গেলাস পানীয় জল পেতে পারি মি. জয়সোয়াল।

—সিওর। যাক্, এর মধ্যে কি ছবি দেখলেন তাই বলুন হিন্দী অথবা বাংলা ?

—স্যার।

—'কলকাতা একাত্তর' দেখেছেন! বোল্ড স্টেপিং তাই না। মৃণাল সেন আমাকে ম্যাড করে দিয়েছে। আচ্ছা সত্যজিৎ, তপন সিনা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?

—আমার ঋত্বিক ঘটককে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে মানিক ব্যানার্জী।

—এবারের ছাব্বিশে নভেম্বরে ময়দানের সমাবেশে গিয়েছিলেন 'বেকারী বিরোধী সমাবেশে ? তা প্রায় চার পাঁচ লোক হয়েছিল কি বলেন ? হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তব্য কি রকম লাগলো ?

—দারুণ স্যার।

—আপনি কি মনে করেন মি. মজুমদার এ নির্বাচনের কোন মূল্য আছে ? অবশ্য আমার মত এ আধা—ফ্যাসীবাদী সরকার বেশী-দিন টিকবে না। এরা জালিয়াতি করে ক্ষমতায় এসেছে। ব্যালট না বুলেট জানি না বিপ্লব ছাড়া কোন রাস্তা দেখছি না। দেখবেন এসব কথা বাইরে লিক না হয়।

—আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন স্যার। এখনও সেদিন আসেনি স্যার। এখনও শাসক শ্রেণী যথেষ্ট শক্তিশালী। এখনও ভেংগে পড়েনি—তার অর্থনৈতিক সামরিক ব্যবস্থা। এখনই জনগণ তৈরী নয় এ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে।

—কিন্তু দেখুন, বলিভিয়া, এ্যাংগোলা, চিলি, লাওস, বাংলাদেশ—আসুন।

—ধন্যবাদ স্যার! আমি স্মোক করি না। দেখুন মি. জয়সোয়াল বাংলাদেশের বিপ্লবের পেছনে মি. আই. এর হাত আছে। অনেকে তাই বলে। ওদেশের মানুষের সর্বাত্মক মুক্তি সংগ্রাম এ নয়। যেমন এখানে অনেক ব্যাপারেই কে. জি. বির হাত আছে।

—আপনি তো মশাই অনেক খবর রাখেন। আপনি কি মশাই পলেটিক্যাল সায়েন্স অথবা অর্থনীতি নিয়ে এম. এ. পড়ছেন নাকি? আপনি দেখছি খুবই ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট। এ চাকরী কি আপনাকে স্যুট করবে?

—আপনি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না। স্যার! একটা যে কোন কাজ চাই। সংসারের অবস্থা ভীষণ খারাপ। স্যার।

—আর বলতে হবে না।

—আপনি কিন্তু স্যার চমৎকার বাংলা বলেন।

—ধন্যবাদ। আপনার সংগে পরে আলাপ হবে।

—স্যার, আমার ইন্টারভিউর কি হবে?

—কেন? এই যে এতক্ষণ ধরে আপনার ইন্টারভিউ হলো।

—স্যার কাজের কথা—

—এইটাই তো আসল কাজের কথা। আমাদের কোম্পানীর এটাই নতুন টেকনিক। এভাবেই আমরা উপযুক্ত লোক বাছাই করি। আমাদের নিয়োগ পত্র পেতে হলে এ পরীক্ষায় পাশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আচ্ছা মি. মজুমদার আপনি এখন আসুন।

—স্যার।

—নেকষ্ট ওয়ান।

মাথা হেট করে বেরিয়ে আসে অমলেন্দু। কি যে হয়ে গেল নিজেই বুঝতে পারে না। এরা দেবতা না শয়তান? মানুষ না পশু? তার স্বাধীন মতামতের কি কোন মূল্য নেই? এই সব মি. জয় সোয়ালদের বেড়াজাল টপকে কোনদিন কি তারা জীবনে সৎভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে না? বাইরে আসতেই দু'চার জন ছেনো পটলার মুখোমুখি হতে হয়।

—কি স্যার চাকরী হবে বলে মনে হয়? যা নেকটাই মেকটাই খেঁচে এসেছেন।

—ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

—বুঝতে পারবেন না। এই জয়সোয়াল শুয়োরের বাচ্ছা বহুৎ হারামী। এই তো সেই হিন্দ্ মোটরে ছিল, ছিল দুর্গাপুর, উষায়, কেশোরামে। আমাদের সংগে বেইমানী করলে এবারে সিনায় হাত ভরে দেব হঁ্যা। তৈরী হয়ে এসেছি।

কি অমলেন্দু! চাকরী হবে? এদের দেখে কি মনে হয়?

শিক্ষিত, সৎ, রুচিসম্পন্ন ভালমানুষের যুগ এটা নয়। কৃষক মজুরদের মত নকল আভিজাত্য ঝেড়ে ফেলে জীবনকে বেপরোয়া লড়ে নেবার চেষ্টা করো দেখি।

এ জমানা পাল্টাতে গেলে আরও জংগী হতে হবে। ধাক্কা খেতে খেতে তো বে-অব-বেংগলের মধ্যে এসে পড়েছ বাঙ্গালী। এবার ধাক্কা দেবার জন্যে একটু তৈরী হও।

—আরে অমলেন্দু যে। অনেক দিন দেখা নেই। কি খবর সেই যে গিয়েছিলে চাকরী বাকরী হলো?

হেসে থমকে দাঁড়ায় অমল। সামনেই কাকাবাবু স্বয়ং ঝকঝকে এ্যম্বাসাডারে বসে ধুতি পাঞ্জাবী পরা যেন হিরো উত্তমকুমার। সামনে পাইলট মটোর সাইকেল, পেছনে ভ্যান ও সিকিউরিটি কার। পাশে ন্যাপা বসে আছে।

কি সৌভাগ্য কাকাবাবুর দেখাপাওয়া—আবার ডেকে কথা বলা! অমল হেসে বলে,—হ্যা কাকাবাবু। এবার মনে হচ্ছে চাকরী একটা হবে।

—কি করতে হবে?

—খুব সোজা কাজ কাকাবাবু এ কাজের জন্যে লেখাপড়ার দরকার হয় না। দরকার হয় না কোন সোরসের, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোন কম্পারেটিভ পরীক্ষাও দিতে হয় না।

—সে কি হে!

—হ্যা কাকাবাবু। সবুজ বিপ্লবের যুগে এটাই হচ্ছে নতুন টেকনিক। কাজ পেতে হলে কলকারখানা, অফিস, স্কুল কলেজ থেকে লাল সন্ত্রাসবাদীদের টেনে বের করতে হবে ছুরি চালাতে

হবে, সিনায় হাত ভরে দিতে হবে, চলে যাবেন না, কাকাবাবু শুনুন, শুনুন, সবুজ বিপ্লবের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না—

এই দেশ, বাংলা দেশ, পশ্চিম বাংলায়, অমল, অমলেন্দু মজুমদার বাহাত্তরের নভেম্বরে পঁচিশে পা দিয়েছে। প্রচণ্ড দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির দাবদাহে অভিশপ্ত বেকারীর জ্বালা বুকে নিয়ে জন্মেছে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। তবুও এ অমল জীবনের বহুমুখী বিপর্যয়কে পেছনে ফেলে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে শিল্পশালার দুয়ারে দুয়ারে। তাকে ঘিরে প্রতারণার জাল, তাকে ঘিরে জঘন্য সন্ত্রাস, ব্যাভিচার নিত্য প্রলোভন। যারা কলকারখানা, অফিস আদালতে কাজ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা সম্পদের পাহাড় গড়ে, জীবনকে লড়ে নিতে যারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ঝড় তোলে –তাদের সংগে নেই তার কোন বিরোধ। এ অমল রবীন্দ্র নাথের অমল নয়, শরৎ চাটুজ্যের দেবদাস নয়, এ অমল কানুবাবু চারু বাবুদের অমল নয়, কোন দাদার রক্ত মাখা কলংকিত হাত এ অমলকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এ অমল উনিশো বাহাত্তরের এই বাংলার অজেয় ভবিষ্যৎ। চটকল, সুতোকল, লোহাকারখানা আর খনি শ্রমিকের, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, আর সোনারপুরের ভাগচাষী ঘরের ছেলে। এ অমল দুর্গাপুরের শিক্ষক মশাই বিমল দাসগুপ্তের ছাত্র, অসীমা পোদ্দার, গীতা চ্যাটার্জীর ভাই। পশ্চিম বাংলার ইস্পাত দৃঢ় সংগ্রামী চেতনায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ অমল সুকান্ত সহোদর। জলন্ত চুল্লির পাশে পাশে, অন্ধকূপ কয়লা খাদে, এ অমল পথ খুঁজে খুঁজে একদিন আলো হয়ে জ্বলে উঠে। এ অমলকে ঘিরে আছে সবুজ ক্ষেত বাগিচা, আর ইস্পাত নগরীর অগুনতি মেহনতীর পোড় খাওয়া কলেজের বুকভরা ভালবাসা। এদেরই হাতে পথে প্রান্তরে মিটিংএ, মিছিলে, লক্ষ সমাবেশ, এদেরই দাবির পাশে পাশে, এদেরি বুকের লোহিত শোনিতে প্রতিদিন রচিত হয় তার জীবণের ভবিষ্যৎ ইস্তাহার। এদেরই সংগ্রামী আঘাতে আঘাতে এমনি করেই শেষ হবে তার গ্লানিময়, কলংকলিপ্ত অভিশপ্ত জীবন।

ডিরোজিও একাডেমী

এই সব সরলমতি অস্থির, চঞ্চল ছেলেদের মুখের দিকে অন্তর্মুখীন দৃষ্টি দিয়ে তাকালে নিজের জীবনের অনেক কথাই মনে পড়ে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে মনে হয় আরও কত কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। ফুরিয়ে যাবার সেই দিনটির ঘণ্টাধ্বনী অতি দ্রুততালে বেজে চলেছে। ক্লান্ত দেহ ঘিরে বার্ধক্যের স্থবিরতা বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছে এখানেই সব শেষ নয়, তোমাতেই সব কিছুর সমাপ্তি নয়, ইতিহাসের গতিপথে প্রতিটি বস্তু আর প্রাণীর ভূমিকা হেয় নয়, এই বিরাট বিশ্বের সুরু আর শেষ কোথায় একথা কেউ বলতে পারে না। নানা সূত্রে গবেষণা আর অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করছে, আপন অস্তিত্বের উদ্ধত বাসনায় প্রচণ্ড স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলে ধ্বংশের করাল ছায়া যাবতীয় সুন্দর, যাবতীয় গৌরবের, সাধনার, সব কিছু নির্মম হাতে ধ্বংশ করছে। পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের মত মুছে যাচ্ছে, আবার আসছে নতুন মানুষ নতুন মূল্যায়ণে গড়ে উঠছে পৃথিবী, রূপে রসে শ্যামলে সবুজে কানায় কানায় নানা সুরে ছন্দে গানে জীবন হয়ে উঠছে কবিতা। কোথায় সেই অখণ্ড অবকাশ, কোথায় সেই চাঁদের আলো, ফুল পাখি, কোথায় সেই সচ্ছতোয়া বেগবতী নদী, শ্যামল সবুজ শষ্যক্ষেত, সুন্দর সুপুরুষ স্বাস্থ্যের নিস্পাপ মানুষ, শান্তি প্রিয় কর্মী মানুষ! বড় কষ্ট হয়, মনে বড় ব্যাথা লাগে, এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে হয় এখনও সময় আছে আরও, আরও সঠিক পথে জীবনকে নিয়ে যেতে পারলে, না না, এখনও সে সময় আসেনি। হয় তো, তিনি চলে যাবেন, সারা জীবন ধরে যা চেয়ে এসেছেন নিরলস ভাবে, তিলে তিলে যার জন্যে নিজের

ব্যক্তি সুখ দুঃখের দিকে না তাকিয়ে জীবনকে ঢেলে দিয়েছেন, তা হয়তো দেখে যেতে পারবেন না। কিন্তু এই সব ছেলেরা, এই সব সরলমতি অস্থির চঞ্চল ছেলেরা, এরাতো থাকবে, সত্যিকারের মানুষের মত নিজে হাতে সমস্ত প্রতি বন্ধকতা দূর করে এরা অবশ্যই জীবনকে গড়ে তুলবে, কিন্তু ওরা যদি প্রচারিত হয়, ভুল পথে চালিত হয়, ওরা যদি মানুষ না হয়, না না তা হতে পারে না। ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ছে। অন্যান্য ক্লাসের ছুটি হয়ে গেল। ক্লাস টেন-য়ের ছেলেদের এটাই শেষ প্রিয়ড। ইতিহাসের প্রিয়ড্। সত্তর বছরের বৃদ্ধ শিক্ষক অঘোর বাবুর ক্লাস এটা। বৃদ্ধ মাষ্টার মশাইয়ের ক্লাসটাই ছেলেদের সবচেয়ে আনন্দদায়ক। উনি কখনও কাউকে মারধোর করেন না, ছোট করেন না, ওনার কাছে সবাই প্রিয়। বিশেষ করে ওনার গল্প ছাত্র শিক্ষক সবাইকে খুব আনন্দ দেয়, অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে ফেলে এক পারিবারিক সূত্রে।

—শোন! আজ তোমাদের একটা খুব সুন্দর গল্প বলবো।

—কিসের গল্প মাষ্টারমশাই ?

বৃদ্ধ অঘোর বাবু সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রহস্য ভরা হাসি হাসেন। ছেলেদের চোখে একটা রোমঞ্চকর উদ্বেলতা।

—বলো কিসের গল্প শুনতে চাও ?

—বেশ ভাল একটা গল্প। বেশ জমকালো, মনে রাখার মত।

—স্যার! রোমাঞ্চকর, বেশ ভয় থাকবে, থাকবে খুন জখম যুদ্ধ, অন্ধকার রাত, গভীর জংগল, চাবুকের মার,—তারপর রাজার পলায়ণ, তারপর সেই কৃষক বালক ঠিক যিশুর মত—

—বিষন্ন স্নিগ্ধ হাসিতে বৃদ্ধের চোখ মুখে ফুটে উঠে প্রাণবন্ত সলজ্জ্য জিজ্ঞাসা ;—কিন্তু সে রকম গল্প কি আমি বলতে পারবো ?

—কেন পারবেন না মাষ্টার মশাই ? আপনি তো কত দেখেছেন, কত পড়েছেন ?

—দেখেছি বটে। পড়েছিও কিছু কিছু, যুদ্ধ দেখেছি, গভীর

জংগলও দেখেছি, চাবুকের মারও খেয়েছি, কত রাজা মন্ত্রী এলো গেল, আমরা রইলাম যে তিমিরে সেই তিমিরে। যিশুর ফটো দেখেছি, দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, আমাদের ঘিরে এখনও গভীর অন্ধকার রাত, জংগলের রাজত্ব, তোমরা তা এখনও দেখতে পাচ্ছ না, বুঝতে পাচ্ছ না।

— স্যার ?

—বলো। এই বয়সের বৃদ্ধের কাছে সব বয়সের মানুষই সব কথাই মন খুলে বলতে পারে।

ছাত্রেরা এ ওর মুখের দিকে পরস্পর তাকায়। সবাই নড়েচড়ে বসে। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। অঘোর মাষ্টার মশাই জানলার বাইরে থেকে দৃষ্টি ফেরালেন ছাত্রদের দিকে। মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়, এ এক অব্যক্ত কষ্ট যা শুধু আপন অন্তরের মধ্যে গোপন থাকে, যার বোঝা নীরবে একা একাই বহে চলেছেন, এ কথা তাই নানা কাজে, হাসি গল্পে সব কাছাকাছির মানুষ জনকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। আজকের দিনের এই সব ছেলে-দের কত কিছু পাওয়ার কথা ছিল, এদের কত কিছু দেবার দায়িত্ব ছিল. কিছুই হলো না, চারিদিকে দেশ জোড়া রিক্ততা, কিশোর মন রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে চায়, শুনতে চায় খুন, জখম, ভয় ভীতির গল্প, অলৌকিক, অধিভৌতিক রূপকথার গল্প। দোষ নেই ওদের এই সবই তো চিরকাল শুনে এসেছে। এতেই ওরা আনন্দ পায়। এতেই ওদের মনকে জয় করে নেওয়া যায়।

ঘরের মধ্যেটা চুপচাপ। একটি রুদ্ধশ্বাস প্রতিক্ষায় ওরা নিশ্চুপ। স্থিরদৃষ্টি বহু জোড়া চোখের অপলক কৌতুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কথার ফুলঝুরি দিয়ে এদের তিনি বহু আলো অন্ধকার পথে পথে বহুদিন ঘুরিয়েছেন। পৌঁছে দিয়েছেন প্রেত লোকে, সুরলোকে, স্বর্গের নন্দন কাননে। অনেক নদনদী পর্বতমালা পার হয়ে পৌঁছে দিয়েছেন কল্পনার ইন্দ্রলোকে কিন্তু আজ আর সেই অলীক অলৌকিক ইন্দ্রজাল রচনায় মন সায় দিচ্ছে না। আজকের

গল্প জ্ঞান বিজ্ঞানের গল্প নয়, কোন বীরগাঁথা নয়, নয় কোন দুঃখ শোকের গল্প। আজ গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে হবে এই জীবনকে, এই সত্তর বছরের বহু বিচিত্র ঘটনার অকথিত সেই কাহিনী' যে কাহিনীর ভিত্তি ভূমির ওপর তিনি নিজে দাঁড়িয়ে আছেন, 'দাঁড়িয়ে আছে তার আশা আদর্শ বহু ঘাত প্রতিঘাতের উর্দ্ধে,--যে জীবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডিরোজিও একাডেমী।

মুখে মৃদু হাসি শান্ত ধীর পায়ে প্রতিটি ছাত্রের সামনে দিয়ে তিনি এগুচ্ছেন। শুভ্রকেশ, আবক্ষ বিস্তৃত দাঁড়ি, ভ্রুজোড়া কোঁচকানো, একটু ঝুঁকে হাঁটেন, গভীর চিন্তার আলোছায়া খেলা করে বেড়ায় সবার মধ্যে, সবার মধ্যে উন্মুখ প্রতীক্ষা। মাষ্টার মশাই তৈরী হচ্ছেন গল্প বলার জন্যে। সমগ্র পরিবেশ তৈরী হয়ে আছে গল্প শোনার জন্যে। এতটুকু ধৈর্য্যচ্যুতি নেই কোথাও। মনে হচ্ছে কোন এক অজানা বৃদ্ধ যাদুকর তার ঐন্দ্রজালিক জাদুদণ্ড দিয়ে এতগুলি প্রাণ-বন্ত বালকদের মন-প্রাণ হরণ করে নিয়েছেন। মনে হচ্ছে কত যুগ পার হয়ে অচেনা অতীত এক বৃদ্ধ ফকিরের বেশে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রহস্যময় এক ঝোলা কাঁধে নিয়ে।

স্কুলের নাম ডিরোজিও একাডেমী। গ্রাম রূপনগর। জেলা চব্বিশ পরগণা! এক অখ্যাত গ্রামের বিদ্যায়তনের নাম ডিরোজিও একাডেমী, অবশ্যই বলতে হবে খুবই আধুনিক নামকরণ। গ্রাম রূপনগর আজ বিশবছর ধরে গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ জনপদ বিবর্জিত এক জলা ভূমির ওপর। এ এক নতুন জনপদ। দেশ ভাগের পর পরিকল্পনাহীন, মাটির সংগে মানবিক বন্ধন শূন্য এমনি বহু জনপদ, জনপদের পাশাপাশি কলকারখানা স্কুল কলেজ গড়ে উঠছে প্রতিদিন। চারিদিকে নিত্য নতুন মানুষের আনাগোনা, প্রতিদিন সেই সব পরিচিত মানুষেরা জীবনের হালে পানি না পেয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ উঠে আসছে সমাজের তলদেশ থেকে, আশাতিরিক্ত সাফল্য নিয়ে। কেউ আর পেছনের দিকে তাকাতে

রাজি নয়, অতীত থেকে শিক্ষা নিতে রাজি নয়, আশেপাশের পেছিয়ে পড়া মানুষের কথা ভাবতে রাজি নয়, সময় কোথায় দেশ, জাতি, বা পৃথিবীর তাবৎ মানুষের আগাগোড়া অতো তলিয়ে ভাবার। নিজের কথা ভাবতে দিন ফুরোয়। তার আগেই নিজেকে সহায় সম্পদে ভরিয়ে নিতে হবে, গুছিয়ে বসতে হবে। এবং একবার গুছিয়ে বসতে পারলে অফুরন্ত এক আত্মস্ফীতিতে সব চিন্তা ভাবনাকে আত্মসাৎ করে আপন অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ করে তোলার নামই জীবন এই জীবনের ধ্যান ধারণা নিয়েইগ্রাম সহর হচ্ছে, সহর নরক হচ্ছে, সারাদেশ জুড়ে চলেছে এক জংগলের রাজত্ব। এই সব কিছুর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে এই বিদ্যায়তন। গ্রামের নাম করা ধনী কৃষক দুর্যোধন মণ্ডলের প্রচেষ্টায়, তারই প্রদত্ত জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই স্কুল। প্রায় একশো বিঘে জায়গা নিয়ে পাকা রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছে সুরম্য বিরাট এক স্কুল বাড়ি। শিক্ষক মশাইদের আবাসিক গৃহ, খেলার মাঠ, সাঁতারের পুকুর, ডিসপেন-সারী, নানান ফলের গাছ, বাংলাদেশের রকমারী ফুলের ঝোপ ঝাড়। বিরাট লাইব্রেরী, দেশ বিদেশের বিরাট বিরাট মানচিত্র, এই সবে মিলে পূর্ণাংগ এক মহৎ ভবিষ্যতের আদর্শ কর্মসূচী দুর্যোধন মণ্ডলের একক প্রচেষ্টায় কেমন করে এই শিক্ষায়তন গড়ে উঠলো,—সমগ্র বিষয়টাই গবেষণার ব্যাপার।

বীরভূমের লাভপুর অঞ্চল থেকে রানী ভিক্টোরিয়ার আমলে শহর কলকাতায় এসে উঠেছিল দুর্যোধন মণ্ডলের প্রপিতামহ উনিশ বছর বয়সে। বীরভূম থেকে কাটোয়ার মধ্যেদিয়ে কখনও পায়ে হাঁটা পথে, কখনও নদীপথ ধরে কবিগান গাইতে গাইতে কলকাতায় এসে উঠেছিল সেই মানুষটি। তারপর থেকে ওদের পরিবারের অনেকেই অনেক রকমের চাকরী আর ব্যবসা করে এসেছে। কেউ ছিল পালকি বাহক, কেউ বাতিওলা, ডাক পিওন, সিপাহী, স্টিম জাহাজের নাবিক, বাঁশিওলা, তারপর ফুলের দোকান, বইয়ের দোকান তার পর—তারপরের খবর কেউ জানে

না। কেউ জানে না কবে কি করে একটা মানুষ থেকে বেড়ে সেই বিরাট মণ্ডল পরিবার কলকাতা থেকে সরতে সরতে চলে এসেছিল এই অজ পাড়া গাঁয়ে। দুর্যোধন মণ্ডলেরা বাংগালী কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কেউ বলে ওরা লখনৌয়ের কৃষক, কেউ বলে দিল্লীর বাদশাহের বাগিচায় মালী ছিল ওর প্রপিতামহ। কেউ বলে সে ছিল কলকাতার এক নামকরা বিখ্যাত জমিদারের পোষা নর্তকীর ছেলে। আজও রহস্যময় দুর্যোধন মণ্ডল পরিবারের বংশ পরম্পরায় সে কাহিনী। ওরা হিন্দু কি মুসলমান যাই হোক না কেন ওরা ছিল গ্রামের জাতকৃষক। ওরা গ্রাম থেকে তাই কেউ ফিরে যায়নি শহরে কলে কারখানায়। শহর থকে ওরা ফিরে এসেছিল গ্রামে। কাস্তে কোদাল হাতে নিয়ে নেমে গিয়ে ছিল মাঠে। ওদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটা গোটা পাড়া। মণ্ডল পাড়া, কাহার পাড়া, বাগদী পাড়া, বামুন কায়েৎ পাড়ার মত মণ্ডলদের নাম হাঁকডাক ছড়িয়ে গিয়েছিল দশ গাঁয়ে। মণ্ডল পাড়ার দুর্যোধন মণ্ডল ছিল নাম করা লোক। তার ছিল অনেক রকমের ব্যবসা। ছিল গোলা ভরা ধান সিন্দুক ভরা টাকা, জায়গাজমি, তার সংগেই বলা যায় দৈব্য ক্রমে দেখা হয়ে গিয়েছিল অঘোর চাটুজ্যে মশায়ের আজ থেকে তিরিশ পঁয়তিরিশ বছর আগে। সেদিনের সেই জেল পলাতক কলেজের তরুন অধ্যাপক অনিলাভ চাটুজ্যে পুলিশের হুলিয়া মাথায় নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে ছিল দুর্যোধন মণ্ডলের কাছে। দুর্যোধন মণ্ডল বেইমানী করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়নি অনিলাভকে।

দশ গাঁয়ের মানুষ জেনেছিল অঘোর চাটুজ্যে ওনার গুরুপুত্র। গুরুদেবের শেষ ইচ্ছে নিয়ে গুরুপুত্র সুদূর বারাণসীধাম থেকে পায়ে হেঁটে অনেক খুঁজে তার কাছে এসেছেন। গুরুর আশীর্বাদেই তার বাড় বাড়ন্ত, পয়সা কড়ি বিষয় বৈভব। তাঁরই সেবায় তাঁর শেষ নির্দেশ পালনে শিষ্য তাই গুরু পুত্রকে নিয়ে নেবে পড়লেন। নিজের পৈতৃক ভিটে ছেড়ে এই বিরাট একশো বিঘে

জলাজমির ওপর গড়ে তুললেন বাগান পুকুর, তারপর হলো ঘর বাড়ি, ধীরে ধীরে ইঁটের পাঁজা পুঁড়িয়ে, প্ল্যানার, কনট্রাকটর, রাজমিস্ত্রী দিয়ে গড়ে উঠেছিল এই বিরাট স্কুল বাড়ি।

কতলোকে কত কি ভেবেছে। গরীবেরা ভেবেছে পয়সা থাকলে ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়, শিক্ষিতেরা ভেবেছে চাষার মরণ কোন্ ফেরেববাজের পাল্লায় পড়ে এবার বিষয় সম্পত্তি ব্যবসা পত্তর উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে, পয়সাওলা লোকেরা ভেবেছে ওসব ধর্ম না বুজরুকি ব্যাটা কোন নতুন ব্যবসা ফাঁদার ধান্দায় আছে, বাড়ির লোকেরা ভেবেছে গুরুপুত্তুর না ছাই, অলুক্ষণে ঐ ভবঘুরে বামুনের পাল্লায় পড়েই লোকটা এবার সব হারাবে। কি যে করতে চায় কেউ বুঝতে পারেনি, কেউ ভাবতেই পারেনি, ঐ চাষীবাসী মুখ্যুসুখ্যু মানুষটার মনে ছিল এইসব। দেশ স্বাধীন হয়েছে, অনেকেই অনেক কিছু করে নিয়েছে, ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব হয়েছে গরীব। অনেক কেরানী কর্মচারী স্কুল মাষ্টার আখেরগুছিয়ে বড় বড় নেতা হয়েছে, হয়েছে এম. এল. এ, এম্, পি, জজ্ ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ব্যবসাদার তারাও হয়েছে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী। পয়সা থাকলে অনেকেই অনেক কিছু হতে পারে। তবে সব থেকে বড় কঠিন বোধ হয় মানুষের মত মানুষ হওয়া বিশেষ করে সর্বত্যাগী আদর্শমানুষ। দুর্যোধন মণ্ডলের সবই ছিল। পয়সা দিয়ে দুর্যোধন মণ্ডল, চৌরাস্তার মোড়ে নিজের সোনার মুর্ত্তি গড়ে দিতে পারতো, পারতো গুরুদেবের নামে মন্দির হাসপাতাল করতে। মন্ত্রী, পুলিশ, আইন আদালত তার হাতের লোক। চাঁদির জুতো মেরে অনেকের লাশ হজম করে দিয়েছে একসময়ে। ওপরওলা সরকারী আমলা অফিসারদের মুঠো মুঠো টাকা খাইয়ে মাইলের পর মাইল জলাজমি মাছচাষের ভেড়ি বানিয়ে রেখেছে সে বছরের পর বছর। এইসব করেই অনেকের মত দুর্যোধন মণ্ডল ও এই দেশে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। ওপর মহল থেকে নিচের মহল শিক্ষিত থেকে নিরক্ষর সবাই তাকে মেনে নিয়েছিল শ্বাশত

সত্যের মত। সেই দুর্যোধন মণ্ডলের একি কীর্তি! কত দুষ্কৃতির নায়ক, কত অপকর্মের কর্ণধার, কত রক্তাক্ত কলংকের বেপরোয়া আসামী, এমন সার্থক কৃতিপুরুষের একি পরিবর্তন! লোকে ভাবতেই পারে না; এই কি সেই মানুষ! মানুষ না অতি-মানুষ? বিনা স্বার্থে আজকের দিনে এমন সর্বত্যাগী সমাজসেবী বড় একটা দেখা যায় না। এই ভাবেই আর একজন আদর্শ বিপ্লবীর পলাতক জীবন সবার চেতনার আড়ালে এই দীর্ঘ অজ্ঞাত বাসে ধীরে ধীরে মুছে যায়। বৃটিশের কালো খাতায় লাল অক্ষরে লেখা রহস্যজনক সেই নাম ডাঃ অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় আজও রহস্য হয়েই রয়ে গেল। লর্ডসিনা রোডের আই বি. গোয়েন্দার চোখ ফাঁকি দিয়ে ডাক্তার, না অনিলাভ ডাক্তার কোন দিন ছিল না, পুলিসের খাতায় নাম ছিল ডাক্তার. পুরানো বিপ্লবীদের গোপন ফাইল ঘেঁটে এই নামই উদ্ধার করেছিল পুলিস। মহাফেজখানার নথিপত্রেও ছিল ঐ একই নাম। আজও পুলিস এই গভীর সংকট আর সন্ত্রাসের দিনে পুরানো নামের তালিকায় রহস্যময় ঐ নামটির তলায় বার বার লাল পেন্সিলের দাগ টানে। জিজ্ঞাসার চিহ্ন আঁকে।

কলকাতা থেকে চন্দন নগর, বীরভূম থেকে তেলেংগানা, কাকদ্বীপ, তঁরাই থেকে বোম্বাই বিশটা বছর ধরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি সেই ব্যক্তিকে। মৃত কিংবা জীবিত কোন হদিশই মেলেনা। সনাক্তকরণের জন্যে প্রতিটি রেল ষ্টেশন, প্রতিটি জেলা সীমান্ত পুলিস ফাঁড়ি, প্রতিটি কলেজ স্কুলের শিক্ষকের নামের তালিকা, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, শ্মশানঘাটের রেজিষ্ট্রী বই, তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায় নি। স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ড, লর্ডসিনা রোডের বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা, পুরো ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট কোন দিনই পাত্তা পাবে না, বেপাত্তা এই মানুষটির। দুর্যোধন মণ্ডলের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নবজন্ম নিয়েছে অঘোর চ্যাটার্জী। কে এই অঘোর চ্যাটার্জী একথা আজ আর কারু মনে আসে নি। সত্যি,

দুর্যোধন মণ্ডলের কোন গুরুদেব আদৌ বারানসীতে ছিলেন কিনা এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি।

দুর্যোধন মণ্ডল আজ আর বেঁচে নেই রূপ নগর গ্রামে। ভিরোজিও একাডেমীর ইতিহাসের শিক্ষক, এই বিদ্যায়তনের অন্যতম ট্রাস্টী সত্তর বছর বয়সের এই অঘোর চ্যাটার্জী মশাইকে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে সবাই জেনে এসেছে মেনে এসেছে শ্রদ্ধা করে এসেছে। ভবিষ্যৎ জানবে না দুর্যোধন মণ্ডল বলে কেউ ছিল, ভবিষ্যৎ জানবে না অধ্যাপক অনিলাভ চ্যাটার্জীই অঘোর চ্যাটার্জী। ইউরোপ, আফ্রিকা, এসিয়ার তিন খানা বড় বড় মানচিত্র দেওয়ালের গায়ে নিজে হাতে ঝুলিয়ে দিলেন মাষ্টার মশাই।
বাইরে মেঘলা আকাশ। মনে হয় সন্ধ্যে হয়ে আসছে, মনে হয় সবে ভোর হচ্ছে। এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে চলেছে দল বেঁধে, আশ পাশের প্রান্তরের কোন বনঝোপ থেকে দোয়েল পাখির মৃদু-মিষ্টি ডাক শোনা যাচ্ছে। আজও সহর গাঁয়ের অনেক মানুষই চেনে না অনেক পাখী, জানে না অনেক ফুলের নাম, কোন আগ্রহই নেই চেনা জানার। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনের সামগ্রী ছাড়া কে আর কবে এই অতিরিক্ত পৃথিবীর বৃক্ষলতা পশুপাখীর নামধাম পরিচয় মনে রাখে। ভিরোজিও একাডেমীর ছেলে মেয়েদের বাংলাদেশের পাখী, লতাপাতা, আর রকমারী ফুল চিনিয়ে দিতে হয় না। বলে দিতে হয় না কোন্ ফুল বছরের কোন্ কোন্ সময় ফোঁটে, ওরা ভুলে যায় না কোন্ নদী কোন্ পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। মিলেছে কোন্ উৎস জল ধারায়। আউল, বাউল, সাঁই, টুসু, পীর ফকিরের গান কোন বাংলার, কোন জেলার ?
—এই সেই ইউরোপ। এতক্ষণে কথা বললেন মাষ্টার মশাই। ধীরে ধীরে বহু প্রতিক্ষার পর যবনিকা উত্তোলিত হলো।
–এই সেই সেক্সপিওরের ইউরোপ, বেটোফেন, পিঁকাশো, মাইকেল এঞ্জোলার ইউরোপ, বাঁলজাঁক, রোঁমা রোঁলা, আইনষ্টাইন, অটো

হান; নীল বহরের ইউরোপ। এই ইউরোপেই জন্মে ছিলেন সমাজ বিজ্ঞানী বিপ্লবী দার্শনিক কালমার্কস্, ফেডরিক এঙ্গেল। হাঁ, এই ইউরোপকেই আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, স্মরণ করি। কতশত মহামনিষীর অস্তি দিয়ে গড়া, কতশত মেহনতীর বুকের রক্ত দিয়ে সৃষ্টি এই ইউরোপের সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান। গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মান; ইতালী, গ্রীসের কাছে ঋণী সমগ্র পৃথিবী। সমগ্র পৃথিবীর শিল্প রসিক মানুষ, মুক্তিকামী মানুষ, মনুষ্যত্বের দাবীদার চেতনাশীল মানুষ মনে রেখেছে ভালবেসেছে, প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে মহান সৃজনীশীল, এই সব ঐশ্বর্যরাশি।

অবাক বিস্ময়ে ছাত্রেরা তন্ময় হয়ে তাকিয়ে শোনে, শুনে ভাবে, স্যার কি সুন্দর বলতে পারেন। স্যারের চোখ দুটো এই বৃদ্ধ বয়সেও কি অপূর্ব জ্বলজ্বলে, কি শান্ত সৌম্য মুখখানি। কি স্নেহ কোমল কণ্ঠস্বর।

না, না, না, এইসব সরলমতি, বালকদের সামনে নেই কোন সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যৎ, এরা জানে না কি এক অনিশ্চিত ভয়াবহ অন্ধকার ভবিষ্যৎ ওদের মনুষ্যত্বকে বধ করবার জন্যে ওত পেতে আছে। বৃদ্ধ মনে মনে ভাবলেন দুঃখিত অন্তরে, কি হবে এই সব বড় কথা বলে. হয়তো কিছু বুঝবে কিছু বুঝবে না, কিছু মনে রাখবে কিছু মনে রাখবে না। আজকের এই শিক্ষা এই আদর্শ বোধ, এ স্বপ্ন কালকের নিষ্ঠুর লোভী অভিশপ্ত পৃথিবীর পায়ের চাপে গুড়িয়ে ধূলো হয়ে যাবে। জীবনের সংগে কোন সংগতিই থাকবে না এই সব মানবিক মূল্য বোধের। অনেক আশা উৎসাহ নিয়ে সমস্ত জীবন দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এই বিদ্যায়তন। কত নাম ডিরোজিও একাডেমীর, কত জ্ঞানীগুনী মানুষের নিত্য প্রশংসা। তা সত্বেও মনে হয়, মাঝে মাঝে কেন যে এমন মনে হয়, কি হবে এই সব ভেবে। বৃদ্ধ বয়সে যে কটা দিন বাঁচা যায়, যে কটা দিন এই সব ছেলেদের মধ্যে থেকে আনন্দ পাওয়া যায় মনপ্রাণ খুলে নিজেকে উজাড় করে ওদের কাছে বলে যেতে হবে।

বৃদ্ধ শিক্ষক মশাই নীরবে পদচারণা করে চলেছেন। ছেলেদের ভীষণ ভালো লাগে মাষ্টার মশায়ের গল্প শুনতে। মানচিত্র দেখে যে গল্প বলা যায় এই প্রথম তারা শুনছে। উদাত্ত ঐ কণ্ঠস্বরের মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর এক অজানা রহস্য।

—এই সেই ইউরোপের মানচিত্র। আমরা সুদূর প্রাচ্যের মানুষেরা ভূগোল পড়ে ইউরোপের কতটুকু চিনি, কতটুকু জানি। তোমরা ছাত্রেরা—কি হলো আমার কথা বুঝতে পারছ তো ?

—হ্যাঁ স্যার।

—ভাল লাগছে ?

—ভীষণ ভালো লাগছে স্যার।

মনে মনে হাসলেন অঘোরবাবু। এই বয়সে সব কিছুই তাড়াতাড়ি ভালো লেগে যায়। ভাললাগা ব্যাপারটাই খুব অগভীর। এর স্থায়ীত্ব ও ক্ষণকালের।

—মহা জ্ঞানীগুনী শিল্পী বিজ্ঞানী সত্ত্বেও এই ইউরোপেরও একটা কলংক জনক দিক আছে। সেইদিকটা বড়ই ঘৃণ্য আর নোংরা। এশিয়া আর আফ্রিকায় এরাই বার বার যুদ্ধ, ধ্বংস, আর অহেতুক রক্তপাত ঘটিয়েছে। এক সময় ওরা সমগ্র এশিয়া আর আফ্রিকাকে গ্রাস করে নিয়েছিল। এশিয়া, আফ্রিকার মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়েছিল। এশিয়া আফ্রিকার অফুরন্ত ভৌগলিক সম্পদ ওরা জোর করে লুট করে নিয়ে গেছে ওদের দেশে। আজও যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখ এই সেই আফ্রিকার মানচিত্র। আফ্রিকার মাটির তলায় থাকে থাকে সাজানো আছে সোনা, মণিমুক্ত, লোহা দস্তা, ম্যাংগানিজ, আফ্রিকার খরস্রোতা নদ নদীতে আছে প্রচুর জল-বিদ্যুৎ। অরণ্যে বনে জংগলে ছড়ানো আছে অঢেল সম্পদ। চাবুক আর বন্দুক হাতে ইউরোপের সমগ্র যন্ত্র সভ্যতা লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন থেকে ছুটে এসেছিল। সংগে এনেছিল বড় বড় জাহাজ গ্লাসগো, লিভারপুল, ফ্র্যাংকফুর্ট, মিউনিক, নটোড্রাম থেকে। আফ্রিকা এশিয়ার সমস্ত জল পথ ওরা দখল করে নিয়েছিল।

আলজিরিয়া থেকে মোজাম্বিক, এ্যাংগোলা থেকে কায়রো, কংগো. সুদান, টাংগানাইকা, কেনিয়া, ইথিওপিয়ার হত লাঞ্ছিত মানুষের মধ্যে ভয়, ঘেন্না ছাড়া ইউরোপের প্রতি জানাবার আর কিছু নেই। নানান রোগের জীবাণু. মদ, কোকেন, গাঁজা, পতিতালয়, ক্যাবারে, শুঁড়িখানায় ওরা ছেয়ে দিয়েছিল গোটা দেশটা। গোটা দেশ-টার মনুষ্যত্বকে পদদলিত করতে এমন কোন ঘৃণ্য রাস্তা ছিল না যা ওরা নেয়নি। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষকে ওরা পশুর মত মেরেছে, চাবকেছে, বুটের তলায় পিষে মেরেছে আফ্রিকার মুক্ত আত্মাকে। কি ছিল না আফ্রিকার ? সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ঘরে ঘরে হাসি, আনন্দ, গানে ভরিয়ে দেবার মত অঢেল ঐশ্বর্য সম্পদে পরিপূর্ণ আফ্রিকা রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে গেল ! রক্ত আর চোখের জলে দেশের সোনাফলা মাটি বিষিয়ে উঠলো। গীর্জায় গীর্জায় ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষের ভীড় জমতে লাগল। কালো মানুষের বুক ভাংগা কান্না আর হাহাকারে ভেংগে চুরমার হয়ে গেল পৃথিবীর শিল্প, সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানের সাধনা। আফ্রিকা আজও পরাধীন বিভ্রান্ত এক মৃতপ্রায় জাতি।

তারপর হাজার হাজার মাইল জলপথ আর আকাশ পথে হিংস্র হায়নার মত ওরা ছুটে এলো এশিয়ার বুকে।

—তাকিয়ে দেখো এই সেই এশিয়া। দেখতে পাচ্ছ এশিয়ার প্রতিটি দেশ এখনও তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুরস্ক, ইরাক, সিরিয়া সৌদিআরব, চীন, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, ইন্দো-নেশিয়ার সবুজ শ্যামল মাটি, ধূসর মরুভূমি, অতন্দ্র হিমালয়. সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো শ্বেত বিভীষিকা। আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের বুক জুড়ে সুরু হলো ভয়াবহ আলোড়ন। বারুদের গন্ধে আর মানুষের আর্ত চিৎকারে কেঁপে উঠলো এশিয়ার মর্মস্থল। গংগা, পদ্মা, হোয়াংহো, টংকিনের মুক্ত জল-ধারা হলো রক্তাক্ত, এই সেই এশিয়া। কনফুসিয়স, রবীন্দ্রনাথ ও ডিরোজিওর এশিয়া।

—তাকিয়ে দেখ দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার দেশগুলির দিকে। ভালো করে তাকিয়ে দেখ এ তোমার এ আমার দেশ। কি অপূর্ব সবুজে শ্যামলে নদী পাহাড়ে ঘেরা আলো ঝলমলে এই দেশগুলি।

এইবার থামলেন বৃদ্ধ মাষ্টার মশাই। সমস্ত ঘরটা জুড়ে আছে একটা গভীর গমগমে কণ্ঠস্বর, মাস্টার মশাই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। ইলেকট্রন, প্রোটন নিউট্রনের অনুপরমাণুর সংগে মিশে গিয়ে এক মহাশক্তিমান শক্তিপ্রবাহ মাষ্টার মশায়ের কথা-গুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমস্ত বিশ্বময়। ঘরময় নীরব নিস্তব্ধতার মাঝে প্রতিটি বালকের বুকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর চেহারাটা অব্যক্ত এক ঝড়ের দোলায় দুলতে লাগলো। সকলের স্থির দৃষ্টি জটিল সূক্ষ্ম রেখাবৃত নানা রংয়ে চিহ্নিত ছোট ছোট অক্ষরে লেখা মানচিত্রের ওপর।

কেউ কোন কথা বলছে না। ছাত্রেরা কেউ কারু দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। আবার ধীর শান্ত পায়ে মাস্টার মশাই উঠে দাঁড়ালেন। এখন আর তাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছেনা। ঢোলা পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিয়ে বের করলেন কয়েক টুকরো হরিতুকি। মুখে ফেলে আবার ফিরে তাকালেন ম্যাপের দিকে। চশমাটা চোখে লাগিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আংগুল রাখলেন ছোট্ট অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটা জায়গায়। ডাস্টার আর চক খড়ি হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে।

—বলো তো, এটা কোন দেশের মানচিত্র আঁকা হলো? কি হলো? সব চুপচাপ কেন? শোন।

—তার আগে দু'একটা কথা আমি তোমাদের বলে নিতে চাই, বিশ্বাস করো, আমার ইচ্ছে ছিল না—এই রকম একটা বিষয়ে আলোচনা। বড় গুরু গম্ভীর বিষয় তাই না? আমি জানতাম হয়তো এ গল্প তোমাদের ভাল লাগবে না। এ গল্প বড় দুর্গম, বড় জটিল। তাই এতদিন তোমাদের ছেলে ভোলানো অলৌকিক রূপকথার গল্প বলে এসেছি। চায়নি সত্যিকারের

পৃথিবীর কথা তোমাদের শোনাতে! সত্যিকারের ভূগোল আর ইতিহাস তোমাদের সামনে থেকে আড়াল করার চেষ্টা যারা করেছে,—আমি তাদের ঘৃণা করি, তোমরাও করবে। জানি তোমরা কেন লেখাপড়া শিখতে এসেছ, লেখাপড়া শিখে তোমরা চাকরী পাবে, অনেক বড় হতে পারবে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে তোমাদের অন্ন মারে কে। ব্যবসাদার দোকানদার হতে গেলেও কিছু লেখাপড়া জানা দরকার। শিল্পী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের জীবিকায় স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটির শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু সত্যিকারের মনুষ্যত্বের শিক্ষা পেতে গেলে দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ, জীবন সংগ্রামের সে কাহিনী তোমাদের শুনতেই হবে। তোমাদের জানতেই হবে পৃথিবীর এই ভূ-পৃষ্ঠে কোন সে শক্তি-মান, মানুষের সুখ শান্তি স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে। কারা যুদ্ধ রক্তপাত ও আতংক ছড়াচ্ছে মানুষের মধ্যে। বলতে পারলে না তো এই ম্যাপটা কোন দেশের? অথচ এই ছোট্ট দেশটাই পৃথিবীর সংবাদ শিরোনামার মূল কেন্দ্রবিন্দু। জান, কেন এই স্কুলের নাম ডিরোজিও একাডেমী করা হলো? কেন হলো না জহরলাল নেহেরু বিদ্যা স্মৃতি, বা রবীন্দ্র শিক্ষা মন্দির অথবা দুর্যোধন মণ্ডল বিদ্যাতীর্থ? তোমরা মনে প্রাণে ডিরোজিও হয়ে উঠো এটাই আমি আজীবন কাল চেয়েছি। আমিও হতে চেয়েছিলাম পারিনি। যাক সে কথা, এই যে ম্যাপ ঠিক একটা হাংগরের ল্যাজ তাই না? ছোট্ট একটা দেশ। যদিও আজ আর এসিয়ার বুক কাঁপিয়ে জার্মানী, বৃটিশ, আমেরিকার বিমান বহর কলকাতা, কলম্বো, টোকিও, সাংহাই, মনিপুর ইম্ফলের ওপর আতংক ছড়িয়ে যায় না। তবুও ইংরেজ আমেরিকার যৌথ নৌবহর আজও ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিকের সুনীল জলরাশি তোলপাড় করে খুঁজে বেড়ায় নিত্য নতুন শিকার। আজাদহিন্দ ফৌজের ভয়ে যদিও গোয়েন্দা পুলিশ,

মিলিটারী অফিসারেরা আতংক গ্রস্ত নয় তবুও মানুষের চলা-ফেরা কথা বলার ওপর চলছে গোপন পাহারাদারি। রক্ত, আগুন, আর ধ্বংশ যারা ছড়ায় দেশে দেশে, তারা নিজেদের মৃত্যু ভয়ে দিশেহারা হয়েই এই সব জঘন্য কাজ করে।

—এই সেই ছোট্ট দেশ। এশিয়া অফ্রিকার জীবিত আর মৃত সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের শক্তি আর আশীর্বাদ নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে যে নতুন রক্তাক্ত ইতিহাস তৈরী করেছে—বলো তো এটা কোন দেশের মানচিত্র ?

সবাই নীরব। কিন্তু সবাই উঠে দাঁড়ায়।

—কি হলো কেউ কোন কথা বলছ না যে ?

শেষ সারির শেষতম ছেলেটি এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায় চোখে মুখে তার দীপ্ত বিজয়ী ভংগি। স্থির অচঞ্চল ভংগিমায় সে বলে—আমরা জানি স্যার। ও দেশের সব খুঁটিনাটি কথাই আমরা জেনেছি, তবুও আমরা বলবো না। আপনি স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেও আমরা বলবো না। মেরে ফেললেও বলবো না। আমরা আজ আপনার মুখ দিয়েই আর একবার নতুন করে শুনতে চাই ? আপনি বলুন আমরা শুনি,

এই প্রথম এত দিনের শিক্ষকতার জীবনে নতুন করে তিনি আর একটি শিক্ষা লাভ করলেন। এই প্রথম মনে প্রাণে অনুভব করলেন তার স্কুলের নাম ডিরোজিও একাডেমী রাখার সার্থকতা। এরা শুধু নিজের কথাই ভাবেনা, নিজের দেশের কথাই ভাবে না, ভাবে প্রতিবেশী দেশের কথা, পৃথিবীর কথা। সুতীব্র চেতনা প্রবাহে কেঁপে উঠে বৃদ্ধের অপ্রস্তুত অন্তরাত্মা। নীরবে চোখ দিয়ে নেবে আসে ক' ফোঁটা চোখের জল। আনন্দে সকলের সামনে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে তিনি শিশুর মত কেঁদে ফেলেন।

চমক

অরুণকে দেখে বেশ ভালো লাগলো। কতদিন পর অরুণকে দেখলো পবিত্র। এই সেই অরুণ। প্রাণোচ্ছলতায় ভরপুর। সুগঠিত পুরুষালী বলিষ্ঠ দেহ। বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেলেও অরুণ এখনও যুবক। যে কোন যুবকের চেয়েও আধুনিক। অবাক হলো সে অরুণ আজও তাকে ভোলেনি। ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। তারমত একজন অজ্ঞাত অখ্যাত যুবককে অরুণের মত বুদ্ধি দীপ্ত উচ্চ শিক্ষিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষের পক্ষে মনে রাখার কথা নয়। তবে অরুণ তাকে চিনতে ভুল করেনি। আপনজনের মত সহানুভূতির সংগে কথা বলেছে অকপটে। শুনতে ভাল লেগেছে। সব থেকে খারাপ লেগেছে নিজের সংগে মিলিয়ে নিতে গিয়ে। না, তাদের দুজনের কোথাও কোন মিল নেই। ছিলও না কোন-দিন। ভবিষ্যতে হবেও না। অরুণের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থক-তার পথে নেই কোন বাধা। ধাপে ধাপে সে অনেক ওপরে উঠেছে। আরও উঠবে। অনিশ্চিত জীবনের পথে পথে নিজের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে তার মত ওকে দিন যাবন করতে হবে না ভেবে ভাল লাগল। নিজের এ জীবন বৃত্তান্তের পাঁকে অরুণের নেবে আসার কথা নয়। তবু অরুণ বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে তাকে চমকে দিয়ে দেবদূতের মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কিরে চিনতে পারিস ?

ততক্ষণে ওকে তার খুঁটিয়ে দেখা শেষ হয়। বুঝে নিতে সময় লাগে না। ভেবে নেয় কিভাবে কথা আরম্ভ করা যায়। অভিজাত বিত্তবান শ্রেণীর ও একজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি। অনেক কিছু বাঁচিয়ে, গোপন করে, গুছিয়ে মেপে কথা বলতে হবে।

—তারপর কেমন আছিস বল? সে ওকে দেখে চমকে যায়নি, ওকে দেখে আতিশয্যে বিগলিত হয়নি, ধন্য মনে করেনি, এতে ও খুশি হলো কিনা কে জানে।

—তোকে এদিকে এ নিষিদ্ধ এলাকায় দেখবো আশা করিনি। এই পার্কষ্ট্রীটে ভর সন্ধেবেলা তোর মত বাংগালী ধুতি পাঞ্জাবী পরা তা গিয়েছিলি কোথায়?

সে ওর দিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়েছিল ওর দীর্ঘ জুলপী আর বড় বড় রুক্ষ চুলের দিকে। চুল আর দীর্ঘ জুলপীতে চাপা পড়ে গেছে সেই পরিচিত মুখ। কথা হচ্ছিল ঠিক পার্ক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে। তার ছোট্ট মরিশ গাড়িটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল অরুণ। দারোয়ানের সেলাম দেওয়া দেখে বুঝলো ওর এখানে যাতায়াত অনেক দিনের। লক্ষ্য করেনি কখন তাকে ছেড়ে ওর দৃষ্টি অন্যত্রগামী হয়েছে।

এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সংগে এক অতি আধুনিক তন্বী যুবতী মহিলা। মহিলাকে হয়তো সুন্দরী বলা যায়। উগ্র যৌবন গ্রাস করেছে মহিলার রূপ মাধুর্য! লোভী পুরুষ তীব্র আকর্ষণ অনুভব না করে পারে না। পুরুষেরই পাশবিক প্রয়োজনে এ নগ্ন সৌন্দর্য আজ লুন্ঠিত সর্বত্র। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক অতিমাত্রায় সজাগ বলদর্পী চলাফেরায় আর এই নারী রত্নের মালিকানার বিষয়ে। যুবতী উদাসীন। উদাসীনতা ছড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে, উচ্ছল খুসিতে উদ্বেলিত তার দেহ সমুদ্র। রং বাহার পার্কষ্ট্রীট সন্ধ্যা এলে মাতাল হয়ে উঠে। মুখের ওপর এঁটে নেয় সে রংগীন মুখোশ। ঝলমলে আলোয় খুলে ফেলে সে মামুলী ভদ্রতার খোলশ। পার্ক হোটেলের আলো অন্ধকার টেবিলের কোণে কোণে ফেনায়িত হয় মদির কামনা। আরক্তিম চোখ নির্লজ্জ পুলকে টলমল। মনের মধ্যে আদিম রক্তস্রোতে নেচে উঠে আদিম চাওয়া পাওয়া। নারীর দেহ-সমুদ্র ঘিরে যৌবনের গোপন রহস্য উদ্দাম ঝড় তোলে পুরুষের বেআব্রু আচরণে। এই সব বিত্তবান সম্ভ্রান্ত বেসামাল নারী

পুরুষকে পার্ক হোটেল প্রতিটি সন্ধ্যায় প্রলুব্ধ করে। দরজা খুলে রাখে সারারাত। পেতে দেয় আরামের শয্যাতল। হাতে তুলে দেয় পানপাত্র। তারপর—

—তারপর পবিত্র কেমন আছিস বল?

—ভালোই।

—চাকরী বাকরী করছিস? বিয়ে থা করেছিস?

– না:।

—খুব ভালো। আমি কিন্তু—চল না, এক পাত্র করে কফি খাওয়া যাক।

—তাড়া আছে?

—কিসের তাড়া?

—চল তবে।

সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আর ভদ্র মহিলার পাশের টেবিলে তাকে নিয়ে বসালো অরুণ। নিজেও জাঁকিয়ে বসলো। ভীষণ খুশি খুশি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যা চাইছিল পেয়ে গেছে। ভীষণ খুশি খুশি অপরিচিতা উদাসিনী অদূরের তন্বী মহিলাটিও। একরাশ বিরিয়াণী সামনে নিয়ে গোগ্রাসে গিলছে সেই ভদ্রলোক। কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই। সামনে ঠাণ্ডা বিয়ারের গেলাস নিয়ে ছলনাময়ী নারী ক্রমশঃ আরক্তিম হয়ে উঠছে। তবুও অরুণ ছাড়বে না। কোন উপায় নেই পবিত্রর এখান থেকে পালাবার।

—সত্যি কতদিন পর তোকে দেখলাম! তুই সেই আগের মতই আছিস।

ঘামছে অরুণ, প্রচণ্ড রেগে জোরে সিগারেট টানছে। তার মরিয়া দৃষ্টিতে উগ্র আবিলতায় গুলিয়ে উঠছে পবিত্রর ভেতরটা উপায় নেই।

—কোথায় চাকরী করছিস অরুণ? কে জানে অরুণ ওর কথা শুনতে পেল কিনা। মনে হচ্ছে ও আর ওর মধ্যে নেই।

—অ্যাঁ! চাকরী? চাকরী কোথায়? বাজার বড়ই ডাল। পরে

এক সময় দেখা করিস্। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে অরুণ। ভীষণ লজ্জা পেয়ে যায় পবিত্র। দুচারজন ঘুরে তাকায় ওদের দিকে।

—কোথায় আছিস আজকাল ?

—সেখানেই, বেশ আছি। ভারি চমৎকার জায়গা। বিরাট ফ্ল্যাট।

একটা পুরো ডিস শেষ, তারপর এলো আরও দুটো ডিস। একটা ডিসে আস্ত একটা ঝলসানো মশলা মোরগ আর একটা ডিসে ওটা কি হতে পারে ভেবে পেল না পবিত্র। অবাক হয়ে সে শুধু তাকিয়ে রইলো—লোকটা কি রাক্ষস! মেয়েটি তখনও শেষ করতে পারেনি গ্লাসটা 'ফিস ফিসিয়ে মিষ্টি হেসে কথা বলছে' আরও মিষ্টি করে চোরা চোখে চঞ্চলতা ফুটিয়ে আলতো করে চোখ মেলাচ্ছে অরুণের সংগে। উত্তেজিত অরুণ। শীত শীত করছে পবিত্রর। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। এয়ারকণ্ডিশনিং সিষ্টেম, কে জানতো অরুণ এত উচুঁতে উঠেছে। কি কুক্ষণে ওর সংগে পবিত্রর দেখা। অরুণ সৌভাগ্যবান। বিরাট চাকরী করে। বহু লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওর কলমের একটা খোঁচায় পবিত্রর মত অনেককে অনেক ওপরে তুলতে পারে, আবার নীচুতেও টেনে ফেলতে পারে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তির দাপট আশমান জমিন কাঁপিয়ে তোলে। তার নিজস্ব গাড়ি থাকাটা এমন কিছু নয়, কলকাতার সব থেকে সেরা জায়গায় অতি আধুনিক ফ্ল্যাট থাকা অস্বাভাবিক নয়। সত্যি কি সুন্দর আরামদায়ক ফ্ল্যাট সে দেখে এসেছে। ঘুম এসে যায় পবিত্রর। শরীরটা বড়ই ক্লান্ত। সারাদিন ঘুরে ঘুরে কেটেছে, বিরিয়ানী মশলা মোরগ, বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা বিয়ার, আলো অন্ধকার স্বপ্নিল পরিবেশ, প্রচণ্ড ক্ষিদে পায় তার।

—দেখছিস ?

—কিরে ? অরুণের দিকে তাকায় পবিত্র। অরুণ তাকিয়ে আছে মহিলাটির দিকে। মহিলাটির ডুবে ডুবে জল খাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

—সাতলি না ; কি খাবি বল ? একাবারে গাছপাকা কাশ্মীরী আপেল তাইনা ?

সত্যি আজকাল কত পাল্টে গেছে এই কলকাতা। রূপসী কলকাতা। সর্বঅংগে চমক। সর্বদেহে নগ্ন বিজ্ঞাপন এঁটে কেবলই চমকে দিচ্ছে মানুষকে। অরুনের এ পরিবর্ত্তন সব সমালোচনার উর্দ্ধে। নিরুত্তাপ পবিত্রর জীবনে নেই কোন বেপরোয়া ঝড়। অরুণরা উদ্দাম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। পবিত্ররা কেবলই পেছুচ্ছে। ছিল কালিঘাটে, এখন চলে গেছে বেহালায়, এরপব হয়তো চলে যেতে হবে ক্যানিং। অরুণরা ছিল মেমারীতে. এলো কালিঘাট, এখন পার্কস্ট্রীট। এই নিয়ম, কারু বাজার দর বাড়ে, কারু কমে। এরপর

—জানিস পবিত্র এই ভদ্রলোক কে ? একজন বিরাট বিজনেস্ ম্যাগনেট। আর এই মহিলা হচ্ছে ওনার যাকে বলে ইয়ে। গত সপ্তাহে একই প্লেনে আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরেছি। ইচ্ছে করছে আলাপ করি এই মেয়েটার সংগে সাহস হচ্ছে না। লোকটা ভারি অমিশুক মনে হচ্ছে। মেয়েটা ঠিক তা নয়। ও হচ্ছে অন্ধকারের জোনাকী। ভদ্রলোকের আমায় চিনতে পারা উচিত ছিল ওরা এই রকমই হয়। যাক, ওনাকে একদিন না একদিন আমার কাছে আসতে হবে। তারপর—

পবিত্র অবাক হলো এই সেই অরুণ ? মেমারীর অরুণ, কালি-ঘাটের অরুণ। এক কালের বন্ধু। কলেজের সহপাটী। মানুষ কত বদলে যায়। একদিন এই দুনিয়াটাও হয় তো এমনি করে বদলে যাবে।

—সবাইকে চেনা যায় বুঝলি। চেনা যায় না কাদের জানিস ? সুন্দরী বিবাহিতা এই সব মহিলাদের। নে কফি খা। তুই কি ভাবছিস বলতো ?

—ভাবছি বেহালার জায়গা জমি বিক্রী করে চলে যাবো ক্যানিং-এর দিকে।

—মন্দ নয়। ক্যানিং জায়গাটা বেশ ভালোই। ওখান থেকে

পাকে চেপে সুন্দরবন যাওয়া যায়। সুন্দরবনে শিকার করতে যাবার ইচ্ছে আছে। বোস, এক মিনিট, কিছু মনে করিস না।
পবিত্র তাকিয়ে রইলো অরুণের দিকে, অরুণ তাকিয়ে রইলো সেই মহিলাটির দিকে, মহিলাটি তাকিয়ে রইলো সেই পাঞ্জাবী ভদ্র-লোকের হোটেলের ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিকে। অরুণ এতটুকু দেরি করলো না চটপট উঠে গেল। একাবারে ভদ্রমহিলার সামনা সামনি ফিস ফিসিয়ে দুজনের কি কথা হলো, ফিরে এলো অরুণ। কফির কাপে চুমুক দিলো। ভীষন ভয় করছিল পবিত্রর, একটু পরেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এলো টেবিলে। ভদ্রমহিলা হেঁট মুখে বিয়ারে চুমুক দিচ্ছেন। নির্লিপ্ত উদাসীন দৃষ্টিতে খুসির ঝলক। ঘটনাটা ঘটে যেতে এক থেকে দু মিনিটের বেশী সময় লাগেনি।
—কিরে তুই যেন ঘামছিস মনে হচ্ছে, ভাবছিস হয়তো, অরুণটা একটা চরিত্রহীন তাই না? আসলে কি জানিস আত্মাকে উপবাসে রাখতে নেই।
—পিয়াসী এ সব পছন্দ করে? মানে তোর বৌ?
অরুণ অবাক হয়ে তার দিকে অকালো। তাকিয়ে হেসে উঠে। —পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। কারু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা আমাদের উচিত নয়, কারু স্বরচিত জগতে সব সময়ই প্রবেশ নিষেধ! ফ্যামেলী মানে হচ্ছে পাটনারশিপ বিজনেস-মেনেচলো মানিয়ে চলো। আমার দায়িত্ব রোজগার করা, সঞ্চয় করা। জীবনের ধর্ম চুটিয়ে ভোগ করা। পিয়াসীর বেলাও তাই। এ এমন দোষের কি?
কিছুই বুঝতে পারছিল তা না। সব কথাগুলিই নতুন। অথবা রং চং এ। সব কথাতেই শানিত চমক। অনেক চেষ্টা করেও পিয়াসীর মুখটা আনতে পারছেনা পবিত্র। যতবার মনে আনার চেষ্টা করে, ততই সামনে এসে দাঁড়ায় পাঞ্জাবী মহিলাটি। কামনাময়ী যৌবনবতী এই মহিলাটির পাশে পিয়াসীকে কিছুতেই

মেলাতে পাচ্ছে না। পিয়াসীর সংগে অরুণকে কিছুতেই এক করতে পারছে না। অরুণকে গ্রাস করে নিতে দেখছে মহিলাটিকে। আজকের কলকাতায় পবিত্রদের পথে পথে ঘুরতে হবে। ঘুরতে ঘুরতে এভাবেই কখনও পিয়াসী কখনও অরুণদের সংগে মুখোমুখি হতে হবে। তারপর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত স্মৃতি বুকে নিয়ে অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের গহ্বরে আলো খুঁজবে। আলো ঝলমলে কলকাতা তার জন্যে নয়। তবে কার জন্যে? অরুণের জন্যে? তার বন্ধু অরুণের জন্যে? কে বলে অরুণ তার বন্ধু? হয়তো ছিল এককালে। আজ আর নয়। হঠাৎ দেখায় তাকে ভাল-লাগাটা সাময়িক মোহ মাত্র। তার বহু লাঞ্ছিত ব্যক্তিগত জীবনে পীড়িত মনের সংগে অরুণের কোন সম্পর্ক নেই। অরুণ তার রক্তের দোসর হলেও নয়। নিজের সংগে লড়াও যা ছায়ার সংগে লড়াও তাই। বিরাট একটা দৈত্যের সংগে একা লড়তে হলে পরাজয় আছেই। এই সব কথা মনে এলেই মনে পড়ে পিয়াসীকে। পিয়াসীকে মনে পড়লে করুণা জাগে অরুণের জন্যে। অরুণ এক দম দেওয়া কলের পুতুল। একদিন ওরা ফুরিয়ে যাবেই। অরুণ চেয়েছে টাকা। অরুণের ওপরওলা চেয়েছে অফুরন্ত সম্পদ। সম্পদের স্বপ্ন চূড়ায় বসে আছে মিঃ মেহেরা—ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নচূড়ায় বিচরণশীল এই সব লোকেদের দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকালে অবাক হতে হয়। কার বোঝা কে বয়। এইতো সেদিন নিউমার্কেটের সামনে পিয়াসীর সংগে তার হঠাৎ দেখা। ঠিক আজ যেমন দেখা হলো অরুণের সংগে। অরুণকে সে কথা বলা যায়না। পিয়াসীও নিশ্চয় ওকে বলেনি।

—আরে পবিত্রদা না?

—কি ব্যাপার পিয়াসী তুমি? কেমন আছ বলো?

—আমার কথা বলছেন? খুব ভালো। তারপর আপনার কি খবর বলুন?

—আমার খবর প্রতিদিন কাগজে ছাপা হচ্ছে দেখনি ?

দুজনেই হেসে উঠেছে। ভাল লেগেছে তার। ভাললাগা জিনিষটা সব কিছুই কেমন হালকা করে। নিজের বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত মনকে হালকা করার মত কোন কিছুই পবিত্রর নেই।

—সবাই পাল্টালো, আপনি কিন্তু সেই একই রকম আছেন পবিত্রদা। কতদিন পর আপনাকে দেখলাম।

—আমিও।

—খুব বিশেষ কিছু কাজ আছে আপনার ?

—কেন বলতো ?

—তাহলে আপনাকে নিয়ে যেতাম একজায়গায়।

—এই মরেছে শেষ বেলা আমাকে নিয়ে যাবে ? কোথায় নিয়ে যাবে স্বর্গে না নরকে ? পরস্ত্রীর সংগে কোথাও যাওয়া তো বিপজ্জনক।

—ভয় নেই, আমার সংগে গেলে আপনার চরিত্র নষ্ট হবে না।

—বেশ চলো। অরুণের খবর কি বলো ?

—অরুণ এখন আমেরিকায়। বিজনেস টুরে গেছে। সামনে সপ্তাহে আসবে। ভালোই আছে।

—বিরাট ব্যাপার কি বলো ?

—বলতে পারেন। আচ্ছা পবিত্রদা আপনাকে 'তুমি' বললে কিছু মনে করবেন ? কলেজে তো আমরা একসংগে পড়েছি। প্রায় বন্ধুর মত বলা যায়।

—তুমি খুব সুন্দর ড্রাইভ করো তো। চমৎকার হাত। গাড়িটা কি তোমার ?

—না অরুণের। আমিও তো অরুণের সম্পত্তি। আমার সব কিছুর মধ্যে মিশে আছে অরুণ। যেখানেই থাকি না কেন অরুণের নাগালের বাইরে যাবার উপায় নেই।

—বাঃ তুমি তো বেশ চমৎকার কথা বলো। তোমার কথা শুনে খিদে পেয়ে যাচ্ছে।

—আমাদের কলেজ জীবনটাই বেশ ছিল তাই না ?

—ঠিক তাই। তুমি তখন বেশ রোগা ছিলে। কম কথা বলতে।

—এখন বেশ মুটিয়ে গেছি না ? সব সময় ভালো মন্দ খাচ্ছি। আরামে আছি। ভাবনা চিন্তা নেই।

—আগের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী হয়েছ দেখছি।

হেসে উঠে পিয়াসী। মুখ ঘুরিয়ে তাকায় ওর দিকে। কত পরিচিত ছিল এই মেয়েটি এক সময়। একসময় কলেজ জীবনে নিত্যকার আড্ডার সংগী। কাল বৈশাখীর মত উদ্দাম ছিল সে সব দামাল বেপরোয়া দিনগুলো। তারপর আরও উদ্দাম ঝড় এসে ওদের দুজনকে কোথায় ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল।

—সত্যি সেসব দিনের কথা ভাবলে কত কথাই মনে পড়ে তাই না পবিত্রদা ?

—অরুণ বেশ বড়োদরের চাকরীই করছে কি বলো পিয়াসী ?

—তুমি আজকাল কি করছ পবিত্রদা ? এখনও সেরকম রাজনীতি করো ?

—সত্যি পিয়াসী কিছু না করেই জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল।

—আচ্ছা তুমি আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ বলতো ?

—পাতালে।

—কেন ?

—পরস্ত্রীর এক্তিয়ারের অধিকার সব জায়গায়ই সীমাবদ্ধ শুধু ওখানে নয়। তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাতো বললে না ?

—আমার কিন্তু ভয় করছে পিয়াসী।

—কেন ? অরুণ তো এখন কলকাতায় নেই। তাছাড়া আমি তো তোমার সংগে পালিয়ে যাচ্ছিনা। সুন্দরী মেয়েদের এত ভয় ? কেন ওরা রাজনীতি করে না বলে ? হাসালে—

আজও কত সুন্দর করে হাসে পিয়াসী। কত আপন করে কথা কয়। কোন যুবতী নারীর এত নিকট সান্নিধ্যে এর আগে আসেনি পবিত্র। ভয় কি সেই জন্যে ? ভাগ্যবান অরুণের সৌভাগ্যে তার

মনে ঈর্ষা জাগছে না কেন? অথচ বঞ্চনার, বিদ্বেষের আগুনে তার অসহায় মন বিষিয়ে যাওয়াই তো উচিত। কলেজে পড়ার সময় পিয়াসীর সংগে অরুণের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল পবিত্র। খুশি হয়নি পিয়াসী। অভিযোগ করেছে ছেলেটি বড় গায়ে পড়া। সে কথায় কান দেয়নি পবিত্র। এ ধরণের অভিযোগ বারান্তরে কোনদিন শোনেনি পিয়াসীর কাছ থেকে। লক্ষ্য করেছে অরুণের সংগে পিয়াসীর গোপন সান্নিধ্য। পরিণামে হয়েছে প্রেম, বিবাহ। সে শুধু জেলখানার বন্দি ঘরে বসে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। নিজের ব্যক্তি জীবনের চাওয়া পাওয়ার ঐখানেই তার পূর্ণচ্ছেদ। এই ভাবেই জীবনের অনেক নৈরাশ্য, ব্যর্থতা, হীন মন্যতা সে কাটিয়ে উঠেছে। কোনদিন অভিযুক্ত করেনি পিয়াসীকে। কোনদিনই বিশ্বাস ঘাতক মনে হয়নি অরুণকে। ওদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় আর ফিরে আসেনি তার জীবনে। কতদিন পর পিয়াসী তাকে আবিষ্কার করেছে। এই চলার পথেই অরুণের সংগে দেখা হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে করলে অরুণ তাকে এড়িয়ে যেতে পারতো। কিন্তু করেনি কেন? অরুণ কি তার ঐশ্বর্য প্রাচুর্য্যের খরতাপে তাকে ঝলসে দিতে চেয়েছে? কিন্তু পবিত্র তো আ আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। পবিত্রকে অনেক পেছনে ফেলে সে এগিয়ে গেছে। পবিত্র এখনতো এক কক্ষ-চ্যুত গ্রহ। ওরা হচ্ছে সূর্যচন্দ্র। নিজেদের আলোয় ওরা আলোকিত।

—কি ভাবছ পবিত্রদা? এসো, নেবে এসো।

— এ কোথায় এলাম?

—পাম এভিনিউ, এখানেই আমাদের ফ্ল্যাট। মনে আছে তুমিই আমায় অরুণের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে?

—পুরানো কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

—সেই ভাল। এখন সব কিছুই নতুন; আমরা কেউই পুরানো নয়। ভাবতে পারিনি তোমার সংগে এতদিন পরে দেখা হবে। আমাদের কোন বার্ধক্য নেই, না পবিত্রদা?

পায়ে পায়ে ওরা উঠে আসে অতি আধুনিক বিরাট সুরম্য বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে, একজোড়া মেম সাহেব নেবে গেল। কয়েক জোড়া দামী ও সুদৃশ্য মটোর গাড়ি সামনের বণে দাঁড় করানো রয়েছে। এক স্থুলাংগিনী মহিলা লিফট্ ম্যানকে শ্রেফ বাঁচা খিস্তি করতে করতে বহু কষ্টে ওপরে উঠছেন, সাইন বোর্ড ঝুলছে 'লিফট্ আউট অব অর্ডার'। মেরামতির কাজ করছে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা। পিয়াসী স্বচ্ছন্দ্যে উঠে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ওকে অনুসরণ করছে পবিত্র। কেমন সব চুপ চাপ। কোথায় যেন পিয়ানো বাজছে মিষ্টি সুরে। পবিত্র ভাবছে এ কোথায় সে এলো আরে অবাক কাণ্ড মিঃ জে. এল. এডভানি —কোথায় কোন অফিসে এই নাম সে দেখেছে নেম প্লেটে। জেনারেল ম্যানেজার। নামটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। হঠাৎ দরজাটা খুলে যাওয়ায় কোম্পানীর নামটা সে পড়তে পারে না। পিয়াসী তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। নিজের আনাড়ী পণার জন্যে আর একটু হলেই হোঁচট খেয়ে পড়ছিল পবিত্র। যোগ্যতার মানদণ্ড বিচার করলে অরুণ অবশ্যই সার্থক পুরুষ। অনেক ওপরে উঠতে তাকে অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হয়েছে। ভবিষ্যতে অরুণের সংগে দেখা হলে কে জানে সে তাকে কি ভাবে নেবে। এ ভাবে তারই অনুপস্থিতিতে তারই ফ্ল্যাটে তারই স্ত্রীর সংগে সে এসেছে।

—এসো পবিত্রদা। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে যায়। সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাট।

—বাঃ ভারি চমৎকার!

—কি পবিত্রদা?

—তোমাদের ফ্ল্যাটটা।

—এছাড়াও আরও তিন চার খানা রুম আছে। আছে দক্ষিণ খোলা বারান্দা। এসো আমার বেডরুমটা দেখে যাও।

—আবার বেডরুমে কেন এই তো বেশ ছিল।

—ধ্যাৎ এসো তো।

একটানে সোফা থেকে টেনে তুলে নেয় পবিত্রকে।

—লজ্জা একাবারে লজ্জাবতী লতা কে আছে এখানে অ্যা? তুমি তো সেই পবিত্রদা, এক সংগে কলেজে পড়তে। সেই একই রকম আছ। জগৎ কত পাল্টাচ্ছে। পাল্টাচ্ছে মানুষের মণের চেহারা।

—অরুণের সংগে গত পাঁচ বছরের মধ্যে তোমার দেখা হয়নি নিশ্চয়? দেখা হলে দেখতে কত পাল্টে গেছে তোমার বন্ধু।

অবাক হয়ে তাকায় পবিত্র পিয়াসীর দিকে। কোন তুলনাই হয় না সেই পাঞ্জাবী মহিলার সঙ্গে পিয়াসীর। এত নির্জন নারী সান্নিধ্য জীবনে কোন দিন আসেনি। আসবে বলে মনেও হয় না। এ এক কল্পনার জগৎ। সুন্দর ফ্ল্যাট, সুন্দর চেহারা, সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক অবস্থা। অফুরন্ত আরাম। এ জিনিষ পবিত্র কি পরিকল্পনা করতে পারে? অরুণ পিয়াসীদের জীবনের মত সুন্দর রূপমাধুর্য্যভরা জীবন আর হয় না। এ আর এক ঘরে মা বাবা বয়স্থা বোন, বাপ মা মরা ভাগ্না-ভাগ্নি নিয়ে থাকা নয়। মি· জে ব্রল এডভানিরা যদি এই কথাগুলি বুঝতেন তাহলে· মদ মেয়ে মানুষ নিয়ে সময় নষ্ট না করে নিজের জীবনটাই লুটিয়ে দিতো। চাই না তার ঐশ্বর্য প্রাচুর্য গাড়ি বাড়ি, সুন্দরী স্ত্রী চাই শুধু একটা কাজ।

—আপনার নামই তো মি· চ্যাটার্জী, পবিত্র চ্যাটার্জী না?

—আজ্ঞে না মুখার্জী।

—বসুন।

—আপনার জন্যে কিছু করতে পাচ্ছি না বলে গভীর লজ্জা বোধ করছি। মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নেবেন। আর আপনার ঠিকানাটা রেখে যাবেন।

—ওটা এ্যাপ্লিকেশনেই মেনশন করা আছে স্যার।

—ধন্যবাদ আসুন।

পথে নেবে এসেছিল পবিত্র। দুঃখ পাইনি বা লজ্জা পাই নি, অপমানিত ও বোধ করেনি। অবশ্য যে রকমভাবে আশা দিয়েছিল তার বাড়ির সবাই খুবই উৎসাহ বোধ করেছিল।

—কি ভাবছ পবিত্র দা ?

—কৈ কিছু নাতো।

—ভাবছ এরা বেশ সুখেই আছে তাই না ? বলতে পার সত্যি বেশ সুখে আছি। মানুষের এর চেয়ে বেশী সুখের প্রয়োজন হয় না। এখানে চোখের জলের প্রবেশ নিষেধ, তুমি হয়তো ভাবছ, অরুণ তার যোগ্যতা দিয়েই এসব কিছু গড়ে তুলেছে। একথা আমি মানি না, সে যোগ্যতা তোমারও কিছু কম নেই। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশীই আছে। কিন্তু একথা আজ কে বিচার করবে, রোজগার করা, সঞ্চয় করা, আর অফুরন্ত ভোগ করা যার জীবনের ধর্ম, এই প্রেরণা নিয়ে যে বেঁচে থাকে তার কাছে বিচার চাইবে ? তার বিচার করার যোগ্যতা কোথায় ?

—আমি বুঝতে পাচ্ছি না। পিয়াসী তুমি কি ওকে বিয়ে করে সুখী হও নি।

—হয়েছি বৈকি। ভীষণ সুখী হয়েছি। এত সুখ আমার সয় না পবিত্রদা। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। কিছু দুঃখ আমার পাওয়া উচিত, কিছু চোখের জল ঝরা উচিত। অরুণ এত কিছু আমার জন্যে করেছে অথচ ওর জন্যে বা কারু জন্যে আমার কিছু করার নেই সেইটাই আমার সমস্যা। তার চেয়ে বড় সমস্যা আমার মনের এই কথাগুলো মন খুলে বলার মত আপন লোক কেউ নেই। পথে দেখলাম তুমি চলেছ। কিছু না ভেবেই ডাকলাম…

—বুঝলি পবিত্র, তুই আমাকে যাই মনে করনা কেন। চরিত্রহীন মনে কর, বড়লোক মনে কর বা স্বার্থপর মনে কর তাতে আমার কিছুই যায় আসে না, আমার ভাগ্য আমি নিজে হাতে বানিয়েছি, বানাতে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়েছি। আমার এই ধ্যান ধারণা পাল্টে দেবার মত পৃথিবীতে কোন কিছুই নেই। এটা তোর বোঝা দরকার। এই কথাটাই বুঝতে চায় না পিয়াসী বুঝলি, অনেকদিন পর তোকে দেখলাম যেন আয়নায় নিজেকে দেখলাম, না ডেকে পারলাম না। একটু পরেই হয়তো দুজনে দুজনের জগতে ফিরে যাবো।

আর দেখাই হবেনা। মনের কথা বলার মত লোক নেইরে এই টেই ট্রাজেডি। পিয়াসীর কথা বলছিলি ও কিছু মনে করে কিনা? ওর মনে করার মত মন নই নেই। এক কালে ওর-জন্যে রক্তে পাগলামীর ঝড় বইতো, আর এখন রূপসী মেয়ে দেখা মাত্রই রক্ত মাতাল হয়ে উঠে। এসব কথা কি যাকে তাকে বলা যায়, সব সময় চাই নতুনত্ব অভিনবত্ব। একঘেয়েমী বরদাস্ত করতে পারিনা। এ্যাট এনি কষ্ট মিসেস মেহেরাকে আমার চাই। সামনে শনিবার মি. মেহেরা ফ্লাই করছে কায়রো, রবিবার মিসেস মেহেরা সম্পুর্ণ একা, আর রবিবার সন্ধ্যা বেলাই এই টেবিলে এই সময়ে মিসেস মেহেরার সংগে আমার দেখা হবে। পবিত্র তুই ঠিক বুঝতে পারছিস না-মানে-আমি ম্যাড আফটার মিসেস মেহেরা। মেয়েটার মধ্যে হেভী চমক আছে।...

এই সেই অরুণ।

এই সেই পিয়াসী।

পবিত্র নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো পিয়াসীর মুখের দিকে। পিয়াসীর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণের কথাগুলো মনে না করে পারে না। অরুণের কথাগুলোর সংগে পিয়াসীর মনের কোন মিল নেই।

—এখানে তোমার কোন ভয় নেই পবিত্রদা। তুমি নির্ভাবনায় হাত পা তুলে বসো। কি খাবে বলো তোমাকে বেশ পেটপুরে খাওয়াই। জানি এই আসাই তোমার শেষ আসা। আমাকে তোমার খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে, না পবিত্রদা?

পবিত্রর পাশেই ডানলপ পিলো গদীর ওপর নিজেকে লুটিয়ে দিলো পিয়াসী।

—তুমি তো সব হারিয়ে বসে আছ। তোমার আর হারাবার কিছুই নেই। তুমি না হয়ে মিঃ রোজারস হলে তিনি কখনই নির্লিপ্ত হয়ে এতক্ষণ হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন না। তার কথায় ঝরতো ফুলঝুরি। তার চোখে আমি হয়ে উঠতাম রোমের

হেলেন, আমার মধ্যে আবিষ্কার করছেন অভিনবত্ব, তারপর জুলিয়াস সিজার—

পিয়াসীর দিকে তাকালো পবিত্র। তার আয়ত আরক্তিম চোখে কিসের এক অব্যক্ত মাদকতা। কোন তফাৎ নেই সিজার মেহেরার সংগে, এখানে পবিত্র শুধু দর্শক, নায়ক নয়। এখনও অপূর্ব আকর্ষণীয় মাধুর্য সারা অংগে লালায়িত পিয়াসীর বুক সমুদ্র। জীবন সমুদ্রে একটা ছোট তরী নিয়ে ভেসে চলেছে যে নাবিক সে বাতাসে গন্ধ পায় ঝড়ের। তাকে সইতে হয় অনেক ঝড় ঝাপটা এ আর এমন কি। বন্দর তাকে পেতে হবে। এক বন্দর ছেড়ে অন্য বন্দরে পাড়ি দিতে হবে। সংগ্রহ করতে হবে পথের অন্ন জল। তার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এক নতুন সংযোজন।

—ইচ্ছে করলে তুমিও পেতে পার, যা অরুণ পেয়েছে। তা তোমাকে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই!

—রাত কত হলো বলোতো পিয়াসী?

—কি হবে সময়ের কথা ভেবে, ইচ্ছে করলে রাতটা কাটিয়ে যেতে পার।

হেসে উঠে পবিত্র,-- হয়তো পারতাম, কিন্তু বুড়ো মা টা ভাববে, বোনটা বসে থাকবে না খেয়ে।

হেসে উঠে পিয়াসী—আর একজনের ভাবনার কথা তো বললে না পবিত্রদা। বৌদি—বৌদি কি করবে তাতো বললে না?

—সেকি! বিয়েই করোনি, তাহলে তো তুমি স্বাধীন।

—না পিয়াসী আমি এখনও সব দিক দিয়েই পরাধীন।

উঠে বসে পিয়াসী, চোখে মুখে তার তীব্র হতাশার ছাপ। প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে সে তাকায় পবিত্রর মুখের দিকে। ক্ষনিকে তার মুখের সে স্নিগ্ধ কোমলতা মিলিয়ে যায়, সে আর এখন মায়াবী হেলেন নয়, ক্লিওপেট্রাও নয়।

এ চেহারা কল্পনা করা যায়না পিয়াসীর।

—সাধু সাজছো? পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, পারনা লুটে পুটে খেতে। পথে পথে চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছ? মা ভাই বোনের অভাব মেটাতে চাও, সারা জীবনেও পারবে না। মিথ্যে আশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছ, কত টাকা লাগবে বলো? কত টাকা পেলে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে বলো? টাকা গয়না যা চাও নিয়ে যাও।

—আজ আমি উঠি পিয়াসী অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।

—পবিত্র দা আমার ওপর রাগ করলে?

—কেন?

—আচ্ছা পবিত্রদা, এক সময় তুমি আমায় ভালবাসতে। আমিও তোমায় ভালবাসতাম, কিন্তু আর আমাদের মধ্যে ভালবাসা বেঁচে নেই তাই না?

হেসে উঠে পিয়াসী, কোমল হয়ে উঠে ওর চোখ মুখ। অদ্ভূত এক বাৎসল্যরসে সিক্ত হয়ে উঠে ওর কথাগুলো, না, নিজের জন্যে তার কোন দুঃখ নেই, নেই গ্লানি।

—তুমি চলে যাচ্ছ পবিত্রদা।

—আজ উঠি।

—কথা দাও আবার আসবে।

—আসবো।

* * *

—তোর জন্যে আমার সত্যি দুঃখ হয় পবিত্র, তোর জন্যে কিছু করতে পারলে সুখী হতাম। বুঝতেই তো পাচ্ছিস দেশের অবস্থা খুব খারাপ। এ ভাবে দেশ চলতে পারে না। একটা পরিবর্ত্তন চাই। তা না হলে সব ভেংগে চুরে তছনছ হয়ে যাবে। কেউ রেহাই পাবে না। তুইওনা, আমিও না। আমি সাচ বলছি। আরে! তুই হাসছিস, ভাবছিস মাতালের প্রলাপ, ভাবতে

পারিস। তবে দেখেনিস্ আমার কথা একদিন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হবেই হবে। বয়, হুইস্কি। শুয়োরের বাচ্চা মেহেরা। এই বার তুমি কোথায় যাবে? আচ্ছা! গুড নাইট পবিত্র।

অরুণ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। মি· ও মিসেস· মেহেরার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। ওদের দুজনের সংগে সহাস্যে করমর্দন করে। একবার ঘুরে তাকায়ও না পবিত্রর দিকে। মনে হচ্ছে তার কথা সে ভুলেই গেছে। অবাক চোখে পবিত্র তাকিয়ে রইলো অরুণের দিকে।

এই সেই অরুণ?

হ্যাঁ কোন ভুল নেই, এই সেই অরুণ।

——

অশ্বত্থামা হত

পূবদিকের ঘরের একমাত্র জানালাটা সারারাত খোলা ছিল। এই ঘরটা প্রায় ব্যারাকবাড়ির এক প্রান্তের একানে ঘর। ঘরের বাসিন্দা মানিক সরকার। মানিক সরকার একজন অভিজ্ঞ ডাইমেকার। বেশকিছুদিন ধরে তাদের কারখানায় চলেছে লক্-আউট। ধর্মঘট লে-অফ, ছাঁটাই দেশ স্বাধীন হবার অনেক আগে থেকেই শ্রম জীবিদের জীবনে নিত্যকার ব্যাপার। আপাততঃ মানিক সরকার একজন ছাঁটাই শ্রমিক। এই নিয়ে তার চাকরী হলো ছোট বড় মিলিয়ে উনপঁটি কল কারখানায়। সেই দশবছর বয়সে মেশিনবয় দিয়ে শুরু হয়েছিল তার জীবন। হাওড়া, বেলিলিয়াস রোড, মানিকতলা, হাইডরোডের অনেক কল-কারখানাতেই সে কখনও টেম্পোরারী, কখনও ক্যাজুয়েলে বহুবার কাজ করেছে। কাজ শেখা তার হাওড়া বেলিলিয়াস রোডের বাঙ্গালী বাড়িতেই। কাজ শেখা ও করার সময় থেকেই তার অবসর কেটেছে কিছু কিছু পড়া শোনা করে। এই পড়াশোনা তার শ্রমক্লান্ত বৈচিত্রহীন জীবনে মর্য্যাদা বোধ এনে দিয়েছে। দিন যাপনের গ্লানি ও এক ঘেয়েমী থেকে রক্ষা করেছে। আজও সে ছন্নছাড়া। সংসারসুখ বঞ্চিত নিঃসঙ্গ জীবন তার নিত্য দিনের সংগী।

জানলার ওপারের পৃথিবী থেকে প্রতিদিনের মত সকালের আলো-ঝলমলে বেশ খানিকটা তাজা রোদ টপকে পড়ে ঘরের সবটুকু অন্ধকার উদরস্থ করে ছিল। তার নিকটবর্তী পৃথিবীর অতি নিকটতম প্রতিবেশীরা নিত্যদিনের মত, চটকল, লোহাকার-খানা, কোচ ও ওয়াগন ফ্যাক্টরী, মটোর ও নাটবল্টুর কারখানার বিরাট বিরাট যন্ত্রের উদরে নিজেদের রক্ত, ঘাম, জীবনীশক্তি

নামমাত্র মূল্যে বিক্রীকরে স্বতোস্ফুর্তভাবে নিঃস্ব হবার জন্যে যন্ত্র-দানবের সংগে বাধ্যতামূলক জীবন মরণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। ফোর্জিংঢালাই, মোল্ডিং, অটোলেদের যান্ত্রিক প্রকরণের মাধ্যমে, নিজেদের শ্রম আর বুদ্ধি কুশলতা আর সৃজনীশীল স্বপ্নদিয়ে ওরা নিখুঁতভাবে কাজ করছিল। সেই কারিগরী হাতের যাদুকরী দ্রব্য সম্ভারে তেল কালি ঘামের মালিন্যের পুঁতি-গন্ধভরা জীবনের কোন চিহ্ন নেই। নিজের সৃষ্টিকে অম্লান করতে এমন নিষ্ঠুর আত্মদান প্রতিদিন ওরা ছাড়া কে এমন করে উজাড় করে দিতে পারে? একমাত্র মানিক যথবদ্ধ দলছুট ঐরাবতের মত এই সব বিরাট বিরাট কর্মকাণ্ড থেকে বিবর্জিত তার শ্রমশীল নিঃসংগ সত্তার মধ্যে নিজের হারানো অতীতকে খুজছিল। জানলার বাইরে আকাশ ছিল নীল আলোঝলমলে। আকাশের বুকে একটি ধূসর মেঘ রংয়ের মৃতদেহ ঝুলছিল। ঠিক তেলকালি মাখা একজন মেসিনম্যানের চোট খাওয়া রক্তাক্ত দেহের মত বিবর্ণ ধূসর। সে-খানে অনেকগুলো শকুন উড়ছিল। তারমানে মেঘখণ্ডটা এমন জীবন্তরূপে আকাশের গায়ে আটকেছিল যে কোন লোকের চোখে একটা মৃতদেহ বলেই মনে হবে। মৃতদেহটা কোন সৈনিকের অথবা পৌরাণিক যুগের কোন মহাবলী সংগ্রামীরও মনে হতে পারে। সেই পৌরাণিক কাল থেকে মৃত্যুই জীবনের অন্তিম পরি-নতি মৃত্যুনীল ধূসর অনুভূত একজন জীবিত মানুষের কাছে কি ভীষণপীড়া দায়ক এই প্রথম মানিক টের পেলো।

চোখ বুজিয়ে মানিক আড়মোড়া ভাংগতে গিয়ে সারা গায়ে ব্যাথা অনুভব করে, তার শরীরটা কি ভীষণ রোগা হয়ে যাচ্ছে। ওজন ক্রমশঃ কমছে। আপন দেহ যন্ত্রের এই অকেজো চেহারাটা তার ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই দেহই একদিন হবে মৃত-দেহ। মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেললে হয় ধূসর ছাই। একখণ্ড ধূসর ছাই রংয়ের মেঘ মৃতদেহের রূপ নিয়ে আকাশে দৃশ্যমান।

শকুনেরা আকাশে উড়ে। অতি দূর আকাশে। মৃতদেহ, শকুন সৈনিক রণক্ষেত্র, এই সব প্রতিকী সংকেত চোখ বুজলেই একটা দুঃস্বপ্নের ছায়া ফেলছে তার মনে। অবাধ্য মনের এইসব অবৈধ স্মৃতি মন্থন একটা ঘটনা সৃষ্টি করছে।

স্বপ্ন — স্বপ্ন দেখেছে মানিক। গতকাল সারারাত ধরে স্বপ্ন দেখেছে। বিগত দিনের অবিমিশ্র সেই সব ঘটনা প্রবাহের প্রগাঢ় স্রোতে ভেসে গেছে সে। সেইসব স্বপ্নরা জীবন্তদেহ ধারণ করে এখন তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। এই জটিল পৃথিবী তার মনের ওপর পূর্ণগ্রাসের ছায়া ফেলেছে।

মানিক এখন একজন রাহুগ্রস্ত নায়ক। রণক্ষেত্র থেকে দলছুট সৈনিকের মত তার জীবনদীপ এখন ধিক ধিক করে জ্বলছে সবার অলক্ষ্যে। স্বপ্নেরা আসে যায় হাজার হাজার বছরের অন্ধকার ভেদ করে।

বিগত রাতের মানিকের স্বপ্নের :—

১। একসাহেব কোম্পানীতে ভাল মাইনের চাকরী পেয়েছে

২। চাকরী পেয়ে মনের স্বাদে মাংস পরোটা খাচ্ছে।

৩। তাদের গ্রামের মেয়ে উমার সংগে তার বিয়ে হয়েছে।

৪। কেশবদার বৌ পারুল বৌদির সংগে অবৈধ প্রণয়ে জড়িয়ে গেছে।

৫। তাদের এক কালের কমরেড চারুবাবু জেল ভেংগে পালিয়ে রাত্রির অন্ধকারে তার কাছে এসে আশ্রয় চাইছে।

৬। এক বড় রকমের রাজনৈতিক অরাজকতায় গোটা ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়ছে।

শেষের স্বপ্নটাই আত্মঘাতী স্বপ্ন। জীবন সংগ্রামে একজন পরাজিত মানুষের আত্মগ্লানি।

ইত্যাদি।

এইসব স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমটা তার আচমকা ভেংগে যায়। এক

সংগ্রাম ক্ষেত্র ছেড়ে এ যেন আর একসংগ্রাম ক্ষেত্রে ধাবিত হবার অবরুদ্ধ প্রেরণা।

স্বপ্ন, আলোঝলমলে আকাশ, মেঘ, মৃতদেহ, শকুন এই সব সংস্কার কুসংস্কারের আবর্ত্তন একি এক অদম্য গতির প্রতিক?

মানিক ঘুম ভেংগে চোখ চায়, ঘরের চার দেওয়ালের দিকে তাকায়। এখনও খানিকটা আদিম অন্ধকার গুড়িগুড়ি মেরে ঘরের এক কোনে চুপ করে বসে আছে। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নেয় মানিক। শুকনো গলায় ধোঁয়া লেগে কাশি আসে। জলের গ্লাস নিয়ে কয়েক ঢোক জল খায়। জল গিলতেই বুকটা কেমন কন কন করে উঠে। চাদরটা গায়ে টেনে পাশ ফিরে শোয়। স্বপ্নের সেই নিঃস্পাপ কোমল অতীত তারুন্যের আনন্দ বেদনার সেই সব পবিত্র শহীদ স্মৃতি অথবা অর্থহীন অসংলগ্ন বেআব্রু ঘটনা তার চেতনায় যে প্রবাহের সৃষ্টি করেছে তার অনুসন্ধান কার্যে মনো সংযোগ করে মানিক।

ভেবেও পেলনা সে কোনদিন কোন সাহেব কোম্পানীতে চাকরীর দরখাস্ত করেছে। চাকরী তার আগামী কাল থেকে দরকার ঠিকই—হাতের কাজ ফেলেগুলে বসে থাকা—আবার ভাল মাইনে! ভাল মাইনের আশা। একটা চাকরীকে কেন্দ্র করে প্রতিটি মানুষের নুন্যতম আশা আকাঙ্খা যেখানে প্রতিদিন প্রতারিত হয় সেখানে ভাল মাইনের স্বপ্ন। সেই একান্ন থেকে চৌষট্টি ছাঁটাই লকআউট, লেঅফ মুদ্রাস্ফীতির, অজুহাতে প্রতিদিন প্রতিটি পদক্ষেপে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। বাজারের আগুন দরে বেহাল মানুষ।

ভাল খাওয়া মানে প্রয়োজনীয় পুষ্টি।

নিয়মিত খাদ্যের অভাব মানেই অনুন্নত মানের স্বাস্থ্য। একজন সৈনিকের মত একজন লোহাকারখানার কর্মীর চাই লোহার মত কর্মঠ শরীর। নিয়মিত পুষ্টির অভাবে তার শরীর ভাংগছে। লুপ্ত করে দিচ্ছে স্বাধীন সৃজনশীল বোধবুদ্ধি। খাদ্য বিচারের দিন

শেষ। যা পায় তাই খায়। না পেলে উপোস। বিকেলের দিকে তাই দেহ যন্ত্রটা আর সে রকম লোড টানতে পারে না। ইঞ্জিনের মত হান্টিং করে। তার মানে মাথা ঝিমঝিম করে। চোখ মুখ বসে যায়। মুখ দিয়ে নোনা জল উঠে। তার প্রিয় খাদ্য মাংস পরোটা মনের স্বাদে খাওয়া আজ স্বপ্নের সামিল। কিন্তু এমন একটা নগ্ন লোভ! ক্ষুধাতুর মন—মনের এই অবৈধ গাঢ়তর অসুখ—এই সব প্রগাঢ় ইচ্ছা কি করে তাকে গ্রাস করতে সাহস করছে? সেই উমা।

তাদের গ্রামের মেয়ে উমা। উমা শুধু তার গ্রামের মেয়ে নয় বাল্য সংগিনী। বহুদিন হলো সেই উমার বিয়ে হয়ে গেছে। চাকরীর জন্যে বহু বছর সে গ্রামছাড়া। কোন প্রিয় সংগিনীকে নিয়ে সুখকর গৃহকোনের স্বপ্ন এ মনে কোনদিন জাগেনি। এই কয়েকদিন আগে সন্ধ্যে বেলায় শিয়ালদহ স্টেশনে দেখা হয়েছিল উমার স্বামী ব্রজেনের সংগে। বাজার দর, চাকরী, রাজনীতি, বোনের বিয়ে নিয়ে অনেক কথা হলো। সরকার ক্রমশঃ দেশের শ্রমশীল গরীবদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে, ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি পালনে—এ সমালোচনাও করেছিল ব্রজেন। দেশের মধ্যে আগুন জ্বলবে। মানুষের মন বারুদ হয়ে উঠছে। শোলমারীর সাধুই নেতাজী। নেতাজীর মত নেতা এদেশে নেই। রাশিয়া বা চীন থেকে যদি নেতাজী কোনদিন এসে দাঁড়ায় এই ভারতের মাটিতে তাহলে ভারতের কোন প্রধান মন্ত্রী কি তাঁকে তরোয়াল নিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানাবে? এসব বেইমানীর কথা কাগজওলারা ভুলেও ছাপায় না। কমিউনিষ্টদের ফুটো খোঁজাই সংবাদপত্রের কাজ। অবাক হয়ে শুনছিল সে ব্রজেনের মত একজন সাধারণ সংসারীর এই সব দুঃসাহসী কথা। ঠিক তারমত না হলেও ব্রজেনও এসব ভাবছে।

—জানেন দাদা! বলেছিল ব্রজেন।

—আপনার বোনের সে রূপ যৌবন আর নেই। অম্বলের রোগে

ভুগছে। কে জানে এই তৃতীয়বার সন্তান সম্ভাবনার জন্যে কি না।
বহুদিনতো ওকে দেখেননি। আপনাদের বাড়ির কথা, বিশেষ
করে আপনার কথা ও প্রায় জিগেস করে। আপনিতো আমাদের
ভুলেই গেছেন। পারেন তো একবার গিয়ে দেখে আসবেন।
সেই উমা!
তার যৌবনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন মুকুলিত
হয়েছিল উমাকে ঘিরে। সেই স্নেহস্নিগ্ধ পবিত্র মুখ রসসিক্ত
কথাকলি কণ্ঠস্বর, সেইসব সুখসারী স্মৃতি—ভুলেই গিয়েছিল
মানিক। বহুদিন পর আজ মনে পড়ছে। মনে পড়ে মনটা কেমন
পবিত্র হয়ে উঠছে। সারা বুকজুড়ে এ নিঃস্ব জীবনে বেঁচে থাক
এই স্বপ্ন মধুর নবীন প্রেম।
উমার এখন সে চেহারা নেই। নেই সে রূপ। ব্রজেনও তার
অনবদ্য সংসার জীবনে সে অপরূপ মহিমা অম্লান করে রাখতে ব্যর্থ
হয়েছে। দেবী বিসর্জ্জনের নিঃশব্দ হাহাকার ব্যক্ত করেছে ব্রজেন।
উমা এখন জননী, প্রেমিকা নয় প্রেয়সী নয়। উমা এখন রুগ্ন
হতশ্রী অন্তঃসত্বা এক নারী।

আশ্চর্য! মানিক তাকেই কিনা স্বপ্নে দেখলো বিবাহ করেছে।
তার এই দীর্ঘ বত্রিশ বছরের জীবনে বিবাহ নামক অপার্থিব
মনোরম ললিতকলা কোনদিন দানা বেঁধে উঠেনি। কলকাতার
মত এই বৃহৎ জটিল শহরে ছিন্ন মূল এ জীবনে প্রেম, বিবাহ, উমার
ভালবাসা, নিজের অন্তরে উত্তাপে উমা নিয়ে সংসার পাতা নিশ্চয়
উপাদেয়, স্বর্গীয়। কিন্তু এমন ধরণের স্বর্গীয় চাওয়া পাওয়ার কথা
স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন। সেই উমা, কিশোরী উমা মাণিকের
প্রাক্ যৌবনের প্রিয়তম মেয়েটির মুখচ্ছবি বহু চেষ্টায়ও এখন আর
মনে আসছে না। এই সব স্বপ্নরা তার ক্লান্ত বিপর্যস্ত মনের অলি-
গলি টপকে ঢুকে পড়তে চাইছে তার জীবনে। মানিক পথ খুঁজছে
নতুন পৃথিবীর, নতুন জনপদের। এই সব পরাজিত ইচ্ছারা তাকে
একা পেয়ে প্রলোভন দেখাচ্ছে কিনে নিতে চাইছে তার ব্যক্তিত্বকে।

নিদ্রার বিবশ বিবরে যৌবনের পুরুষ মন প্রেমিক অনুভূতি ছাই-চাপা আগুনের মত উত্তপ্ত।

কিন্তু পারুল বৌদি।

কেশবদার বৌ পারুল বৌদি। ওরা একই কারখানায় কাজ করতো থাকতো একই বাসায় পাশাপাশি ঘরে। মানিকের মত একজন নিঃসঙ্গ সুদর্শন আদর্শবান সাহসীমনের যুবক কল কারখানার জীবনে সহজেই বিশ্বাস অর্জন করে নেয় বহুজন সহকর্মীর। সুখ দুঃখ--সংগ্রামের এমন নির্ভরযোগ্য সং প্রেরণা সহজেই জয় করে নেয় পেছিয়ে পড়া অসংগঠিত মেহনতী জনের। কেশবদার মত পোড় খাওয়া মানুষের পাশাপাশি এসে পড়ে মানিক। আবার কেশব-দার মত বহুদর্শী মানুষের নৈতিক সমর্থন ও সক্রীয় সহযোগিতায় মানিকও সংঘাত সংকটের মুহূর্তে অর্জন করে দুর্ব্বার প্রাণশক্তি। এই সব কারণেই ওরা শুধু কর্মস্থানেই নয় পারিবারিক জীবনের আরও কাছাকাছি এক মানবিক বন্ধনেও আবদ্ধ হয়। কেশবদা তার দাদা, বন্ধু, কেশবদার মত একজন সংসারী মানুষের মনোবলও উদারতার কাছে সে ঋণী। শুধু কেশবদা নয় মানিক দিনে দিনে কেশবদা পারুল বৌদির সংসারের সংগে এক অচ্ছেদ্য স্নেহ জালে জড়িয়ে যায়। স্নেহনীড় বঞ্চিত একজন অসহায় তরুন মনের গহনে পারুল বৌদির আপন করে নেবার অকৃপণ উদার প্রভাব মানিককে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখায়। ভাবতে শেখায় শুধু রুজি রোজ গারের জায়গায় নয়, সুখ দুঃখের দিনে রুটি ভাগ করে খাওয়ার সংগ্রামী সৌহার্দ। শিল্পে সংকট সৃষ্টিকারী অফুরন্ত সম্পদের লুটেরা প্রভুশ্রেণী একদিন যুক্তিহীন অজুহাতে বিরাট ক্ষয় ক্ষতির দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় সম্পদ সৃষ্টিকারী সেইসব নিঃস্ব মানুষদের ওপর। তালা ঝোলে কারখানার গেটে কারখানার নোটিশ বোর্ডে বিনা অপরাধে লটকে দেওয়া হয় কিছু লোকের নাম—কেড়ে নেওয়া হয় রুজি রোজগারের অধিকার, মুখের রুটি কেড়ে নিয়ে সোজা পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাবেই পূর্ণিমার চাঁদের স্বপ্ন ঝলসানো

রুটির দুঃস্বপ্নে দু'চোখে অন্ধকার দেখে কত পরিবার। প্রথমে লেঅফ, পরে লক-আউটের বলি হয় মানিক। চোখে অন্ধকার দেখে। দু' দিনেই ফুরিয়ে আসে পকেটের পয়সা। জমে যায় তিনমাসের বাড়ি ভাড়া। যে গৌরবের আলোয় তার অন্তর আলোকিত হতো—স্বপ্নময় সুখী জীবনের জন্যে যে ত্যাগস্বীকারের আদর্শে সে মানুষকে আর একধাপ সংগ্রামে এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান জানাতো সেই এখন ঘেরাও হয়ে পড়ে নির্মম সংকটের আবর্ত্তে। বারবার নিজের মধ্যে খুঁজেছে কোথায় সেই অজেয় পুরুষাকার ?

চারিদিকে শুধু কালো মেঘ, সংকটের কালো মেঘ, অনাহার, উপোষ অপমান অবক্ষয়, অন্ধকার দেখছে মানিক, চোরের মত অপরাধীমন নিয়ে সে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলছে নিজেকে একাধিক্ জনের দৃষ্টির সামনে থেকে। প্রার্থনা করছে মনে মনে হে কালপুরুষ! একটা উপায় বলে দাও। ঠিক সেই সময় একদিন গভীর রাতে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তার দরজায় মৃদু টোকা পড়ে। নিঃশব্দে মানিক শোনে শুনে ভাবে না এ কোন পাওনা দারের শব্দ নয়, কোন বন্ধুরও নয়, নয় কোন পরিচিত জনের, একিসের ইংগিত! কে দরজা খুলতে বলছে ?

দরজা খুলুন। শুনছেন!

এযে পারুল বৌদির কণ্ঠস্বর। সেই স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর। নিঃশব্দে দরজা খোলে মানিক।

একহাতে রুটির থালা অন্য হাতে একটা ঘটিতে জল।

একি! কি ব্যাপার বৌদি ? এত রাতে ?

ক'দিন এভাবে চালাবেন ? ব্যাপারটাকি জানার কথা আমার ?

চলুন ঘরে চলুন।

ধরা পড়ে যায় মানিক। নিঃশব্দে হেসে উঠেন পারুল বৌদি।

—পাশাপাশি ঘরে থাকি কেউ খাবে আর কেউ খাবে না তা কি চোখে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় ? বলুন আপনি পারেন ? আমি সব জানি, শুনেছি আপনার দাদার কাছ থেকে। খেয়ে নিন।

মানিকের চোখে জল এসে যায়।

—অনেক রাত হলো। খেয়ে নিন। —দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় পারুল বৌদি। এই সেই পারুল বৌদি। এমন স্বাধীন মনের মমতাময়ী নারী এমন বন্ধু বৎসল সহৃদয়ের মন এমনি করেই বুঝি সর্বনাশা সংকটের আবর্ত্ত থেকে অন্ধকার মহাযবনিকা মুছে দিয়ে যায়। তাইতো পৃথিবী সুন্দর। সেই সব দিনের পুণ্য স্মৃতি মন্থন করলে কত কথাই মনে পড়ে, টুকরো টুকরো কত প্রীতিময় অনবদ্য ঘটনা। এইখানেই চেতনার পুনঃজন্ম। জন্মান্তর বাদে সে বিশ্বাসী নয়। পরজন্মে বিশ্বাসী মানুষ যে কেউই বলবে তিনি ছিলেন তার অন্তরের আত্মীয় বারবার সে মুগ্ধ বিস্ময়ে পারুল বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছে পারুল বৌদি তুমি আমার কে ?

—কেন বলতো ঠাকুরপো ?

—আজ কতদিন হলো একটা কাজ নেই একটা পয়সা রোজগার নেই।

—সবাইকেই এক পা এগোতে হয় তু'পা পেছোতে হয়।

—কিন্তু আমরা যে ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়ছি।

—তোমাদের থেকে যে আমরা আরও পেছিয়ে আছি ঠাকুরপো ? আমাদের কি হবে ? কি হবে আমাদের সন্তান সন্ততিদের !

—হয়তো খুব অন্যায় করছি। হয়তো এ কোন মহাপাপের পরিণাম, শুধু দিন যাপনের জন্যে একটু প্রাণধারণের জন্যে এই ভাবে এই অভিশপ্ত জীবনের জন্যে বেঁচে থাকা।

—তুমি কি তাহলে মরতে চাও, করতে চাও আত্মহত্যা ?

—বীরের ও মৃত্যু আছে। যুদ্ধে হেরে গিয়ে মরা তবু সে গৌরবের। কিন্তু দাসখত, লিখে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া—নিজের জন্যে, নিজের সুখ এবং স্বার্থের। —জন্যে এ যেভাবতে পারা যায় না।

—ঠাকুরপো তুমি কোন দিন কোন মেয়েকে ভালবেসেছ ?

—ভালবাসা সে অনেক মূল্যবান জিনিষ। ভালবাসা ফুল প্রজাপতি

নদী, নদীর ধারে সবুজ শ্যামল গ্রাম, সেই গ্রামের ছোট্ট মেয়ে উমা, সেই উমার সংগে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো বাবুই পাখির বাসার খোঁজে-সে এক জীবন, তারপর আমি চলে এলাম হাওড়ায় ভর্ত্তি হলাম স্কুল ছেড়ে হাতের কাজ শিখতে বাংগালী বাড়ী, আর উমা একটু ডাগর ডোগর হতেই হয়ে গেল ব্রজেনের সংগে বিয়ে। একাবারে খোদ কলকাতায়।

—তারপর।

—বিয়ে, ফুল, টোপর, সিঁদুর, চন্দন, চেলী সে এক এলাহি ব্যাপার সানাই নহবৎ, আলো, গান, সুর, ছন্দ-গন্ধ, কাব্য, উপন্যাস, মহাকাব্য চলছে চলবে। ক্ষুধার রাজ্য পৃথিবী গদ্যময়।

—তারপর।

তারপর, মেসিন বয়, ম্যান, লেদ, ড্রিল, মার্কিং, ওয়েলডিং, মোল্ডিং ফের্জিং, ডাই, ডাইস—ডাই মেকার মানিক সরকার। এক কাপ চা খাওয়াবে?

— চিনি নেই।

—হ্যাঁগো কাকু চিনি আছে? দরজার বাইরে থেকে বলে উঠে পারুল বৌদির সাত বছরের মেয়ে শ্বাশ্বতী।

—কেরে শ্বাশ্বতী?

—ষ্টোভে কেরোসিন নেই।

—চার আনা পয়সা দেবে একটু বেরুবো। সিগারেট খাবো।

—পয়সা নেই। সিগারেট খাওয়া চলবে না। সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়।

—হোক। হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দেবে-ফ্রি বেডে। এই দীপু-তোর বাবার কৌট থেকে একটা বিড়ি নিয়ে আয়তো।

—কাকু তুমি মার সংগে এত ঝগড়া করো কেন? জাননা ঝগড়া করলে মা আর সেদিন কিছু খেতে পারে না।

দশবছরের দীপুর মুখের দিকে অপরাধীর মত তাকিয়ে হেসে ফেলে মানিক।

—বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না।

শাশ্বতী দরজার আড়াল থেকে বলে সবাই কাজ পায় তুমি একটা কাজ খুঁজে নিতে পার না। কাজ যদি না পাও তাহলে মাষ্টারী তো করলে পার?

—কে শেখাচ্ছে তোমার মা নিশ্চয়। বেশ, যাও বই পত্তর নিয়ে এসো, আজ থেকেই শুরু হয়ে যাক মাষ্টারী।

মনের আনন্দে দীপু শাশ্বতী বই পত্তর নিয়ে মানিককে ঘিরে বসে। দীপু বলে—কাকু আজ তোমার কঠিন পরীক্ষা। দেখা যাক তোমার দ্বারা মাষ্টারী হয় কিনা। মহাভারত পড়েছ?

মানিক হেসে বলে—কিছু কিছু।

দীপু বিজ্ঞের মত বলে কিছু কিছু বললে হবে না। ঠিক ঠিক বলতে হবে। বল দেখি অশ্বত্থামা কে ছিলেন?

—অশ্বত্থামা কৌরব আর পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোনাচার্যের একমাত্র পুত্র ছিলেন

—ভেরি গুড। আবার বলো কৌরবরা তো ছিল অঢেল ঐশ্বর্যের মালিক তবে কেন গুরু দ্রোনাচার্য তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রকে গো-দুগ্ধ কিনে দিতে পারেন নি, কেন পিটুলী গোলা খাইয়েছিলেন দুধ বলে?

—নিশ্চয় গুরুকে সেই রকম উপযুক্ত বেতন দেওয়া হতো না। নয় তিনি ছিলেন বেকার।

—হলো না। আমার মা জানে। মাতো হেডমাষ্টার মশায়ের মেয়ে। আবার বলো মহাভারতের যুদ্ধ কেন হলো?

—ক্ষমতা ও সম্পদ দখলের লড়াই।

—সে যুদ্ধে অশ্বত্থামা কেন যোগ দিয়েছিলেন? সে যুদ্ধে তিনি কি মারা গিয়েছিলেন? পুত্রের মৃত্যু সম্পর্কে গুরু দ্রোনাচার্যকে মিথ্যা কথা কেন শোনানো হয়েছিল?

—যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা বহু নির্দোষ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, মিথ্যে কথা বলে দলে টানে। কোন যুদ্ধেই কোন পক্ষেরই সব সৈন্যরা।

বীরেরা মরে না। মানুষকে যারা প্রতারণা করে নিজেদের সম্পদ সৃষ্টি করে তারা বারে বারেই মানুষকে মিথ্যে ভাওতা দেয়, ভুল পথে চালিত করে।

—ঠিক, ঠিক বলেছ।

—এই নাও চা। পারুল বৌদি এককাপ চা নিয়ে আসে।

মানিক জিগেস করে—পারুল বৌদি তুমি কি গুরু কন্যা দেবযানী?

পারুল : তাই যদি হই?

মানিক : দেহো আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস করিবে প্রয়ান।

পারুল : মনোরথ পুরিয়াছে?
আর কিছু নাহি কি কামনা?

মানিক : আর কিছু নাহি।
আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোন ঠাঁই
মোর মাঝে কোন দৈন্য কোন শূণ্য নাই।

দীপু শাশ্বতী এ আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়। দীপু চেঁচিয়ে উঠে মা, আর একটু বলো মা।

—ওমা খুব ভাল লাগছে আর একটু বলো না। শাশ্বতী জড়িয়ে ধরে তার মাকে।

পারুল : যে বিদ্যার তরে মোরে করো অবহেলা সেবিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ, তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবেনা ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

মানিক : আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ মেয়েটার কানমূলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে পারুল বৌদি। স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছে মানিক। মেয়েটা অহেতুক এই কানমূলা খেয়ে কেঁদে উঠেছে। ছেলেটা মুগ্ধ কৌতুকে তাকিয়ে থেকেছে মানিকের দিকে। কিন্ত

ফিসিয়ে বলেছে—জান কাকু! মা বলে তুমি সুযোগ পেলে লেখা পড়া শিখে অনেক, আরও অনেক বড় হতে পারতে।

এমন সময় ঝড়ের মত কেশবদা ঘরে ফেরে।

—এই যে মানিক তুমি কিছু খেয়েছে?

—কি ব্যাপার দাদা?

—চটপট তৈরী হয়ে নাও। তোমাকে এখুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

—কেন গো? পারুল বৌদি সামনে এসে দাঁড়ায়।

—খবর আছে। কেশবদা ফিস ফিসিয়ে বলে আজ রাতেই তোমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। আর দেরী করো না। তুমি চলে যাও মালিপাঁচঘোড়া হাওড়ার সেই ঠিকানায়।

—বা রে! রান্না হয়ে গেছে ও খেয়ে যাক।

—বাজে বকো না। ওকে এখনই চলে যেতে হবে। এই মুহূর্ত্তে।

—কাকু কোথায় যাবে বাবা?

—অজ্ঞাতবাসে বাবা।

সেই পারুল বৌদি। তারপর কতদিন কত বছর পার হয়ে গেল। কচ্-দেবযানীর আর দেখা হয় নি। দেবযানী মাটির পৃথিবী ছেড়ে দেবলোকে চলে গেছে। ছেলে মেয়ে দুটিকে নিয়ে কেশবদা ফিরে গেছে তার গ্রাম লাভপুরে। সেই পারুল বৌদির সংগে অবৈধ প্রণয়ের স্বপ্ন মানিক কি ভাবে দেখলো। পারুলবৌদি রূপ-জীবনী মনের মানুষ কোনদিনই ছিলেন না। লজ্জা আর আত্ম-গ্লানিতে মরে যেতে ইচ্ছে করলো মানিকের। মনের এই অশ্লীল বিকারে নিজের এই নীচতার প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করে। চোখ-দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ক্ষমা চাইলো কেশবদার কাছে। ক্ষমা চাইলো পারুল বৌদির কাছে। নিজের এই অক্ষম জীবনের কাপুরুষ মনোবৃত্তির জন্যে নিজেকে অপরাধী দাঁড় করিয়ে কুকুরের-মত গুলি করে মারার ইচ্ছা প্রবল হলো। বিদ্রোহী মন পাপাচারী এই মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কলকাতার বিত্তবান

সমাজের নরককুণ্ডে নিমজ্জিত মানুষ এই ভাবেই বুঝি বলি হয় তারমত। ধিক্কার দিলো বিকিয়ে যাওয়া উচ্ছিষ্ট ভোগী ভদ্রলোক সমাজের বিকৃত শিক্ষা সংস্কৃতিকে। কলকাতা—তাকে একা পেয়ে পাঁকে টেনে নাবাচ্ছে। এমনতো ছিল না মানিক। সেদিন—সে রাত্রে সে পৌঁছতে পারেনি হাওড়ার মালি পাঁচ ঘোড়ায়। পথেই গ্রেপ্তার হয়েছিল ভারতরক্ষা আইনে। তারপর বিনা বিচারে প্রায় তিন বছর কারাদণ্ড। আজকের এই কুশ্রী ধরনের কদর্য স্বপ্ন জীবনে দুঃস্বপ্নের দুর্বহ চাপে সে ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে বসেছে। অভাব তাকে নীচহীন করে তুলছে। কলকাতা কল্লোল কলেরবে মুখর। ঘরে বাইরে কত শত পরিচিত মুখ, জীবন সমুদ্রে কত শত নাবিকের কোলাহল, কতশত দাস ব্যবসায়ী মহাজনদের বাজার গরম করা বক্তৃতা, ভণ্ডামী, ভ্রষ্টাচার, রাজনৈতিক ব্যভিচার। এই অপরিচিত জগতে সে এক জন্ম যাযাবর। আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরীত এই অভিশপ্ত জীবনের জন্যে লড়ে যেতে হবে। এ লড়ায়ের কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই। এই সুস্থ সবল পৃথিবীর সংগে, এই আলোহাওয়া বাতাসের সংগে মাণিক এঁটে উঠতে পাচ্ছে না।

তারপর সে স্বপ্ন দেখলো ভারতরক্ষা আইনে ধৃত চারু দত্ত জেল ভেংগে পালিয়েছেন। পালিয়ে রাতের অন্ধকারে তার কাছেই এসেছেন। ভ্রূক্ষেপ নেই পাদিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। তাকে কমরেড বলে সম্বোধন করছেন। আশ্চর্য! সে একজন কমরেড। কমরেড কথাটা শুনতে কত ভাল। ভারতবর্ষ জুড়ে বিরাট এই ভাংগাগড়ার দৃশ্যপটে তার মত একজন সাধারণ কুশিলব থমকে দাঁড়ানো মানুষকে এখনও লোকে কমরেড বলছে। তার কমরেডরা কোথায় কত দূরে চলেগেছে। কত পেছনে পড়ে গেছে সে। তাকে একা পেয়ে যখন ধনবাদী বনিকসভ্যতা তাড়া করে আসছে বন্দুক উঁচিয়ে, তখন চারুদত্ত তাকে কমরেড বলে ডাকছেন। এই ডাকে আজ ও তার সর্ব্বাংগ এক অব্যক্ত আনন্দে শিউরে উঠে। কেন বুঝতে পারে না মানিক। বুঝতে না পারলেও সে চারু দত্তকে তার ঘরে, তার

বিছানায় আশ্রয় দিতে দ্বিধা করে না। তা চারুদত্তরা যত বড় জেল পলাতক হোক না কেন। কিন্তু বাস্তবিক চারুদত্ত রাজবন্দিনন। চারুবাবু বাষট্টি সালে চীনকে আক্রমণকারী বলে স্বীকার করেছিলেন। তার জন্যে মুচলেখা দিয়ে ছিলেন। এইতো চারুবাবুর সংগে মানিকের কালকেই দেখা হয়েছিল। চারুবাবু বহাল তবিয়তেই আছেন। চুটিয়ে রাজনীতি করছেন। কলেজে যাচ্ছিলেন তিনি। আচমকা মানিককে দেখে তার প্রশান্ত মুখে ফুটলো এক গাল হাসি। সেই পুরানো কায়দায় হাত চেপে ধরে আন্তরিক ভাবে একগাল হেসে জিগেস করলেন-বলুন, মানিকবাবু কেমন আছেন? বহুদিন বাদে দেখা। আপনার শরীর কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

হাসলো মানিক। শরীরের প্রতি উপেক্ষা ফুটিয়ে অন্যদিনের মত একই মিথ্যে কথা সচ্ছন্দে বললে-দেখুন না পেটের ট্রাবলে বড় কষ্ট পাচ্ছি।

পেটের ট্রাবল আর বলবেন না। বাংলা দেশের জলহাওয়া পেটের পক্ষে পয়জেনাস্। আমারতো মশাই ক্রমিক এ্যামিস ব্যাসিস্। ডাঃ শচীন চৌধুরীকে দেখিয়ে অনেক ভাল আছি। একজন টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডের মাইনে তো ভালই। একজন শিক্ষকের চেয়েতো নিশ্চয়। একটু আপেল সেদ্ধ আর মাংসের স্টু খান। পুরানো দিনের সেই বোহেমিয়ান টাইপটা একটু ছাড়ুন দেখি।

এই চারুদত্তকে স্বপ্ন দেখলো মানিক। এককালের কমরেড় চারুদত্ত। তারপর এলো চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ। এশিয়াবাসীকে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবার এতবড় সার্থক সুচতুর পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদীর দোসরেরা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে। এই চারুবাবুকে অবিশ্বাস্য হলেও যেদিন চোখের ওপর দেখলো চীনকনসাল অফিসের সামনে স্লোগান দিতে সেদিন মানিক স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল এদেশের মাটিতে নিপীড়িত মানুষের নেতৃত্ব গড়ে উঠতে অনেক দেরী। দুনিয়ার মজুর একহও,

'ইনক্লাব' অনেক দূরের ব্যাপার। তারপর পেট বাঁচাতে, পিঠ বাঁচাতে চারুবাবুরা অনেককিছু করলেন। বিগতরাতে সে চারুবাবুই স্বপ্নে ফিরে এলেন একাবারে এক নম্বর বিপ্লবী হয়ে।

চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে ভারতের স্বাধীন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। অবাক কাণ্ড। স্বপ্নের ঘোড়া গাছে চড়েছে। ভারতীয় মার্কা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী সামরিক শক্তি বুটশুদ্ধ পেটে পা তুলে দাঁড়িয়েছে। এসব কথা গোয়েন্দা পুলিশ শুনলে তাকে কাগাকানুনে এখুনি আবার গ্রেপ্তার করবে। সে কিনা ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে (কালো বাজারীদের সম্পর্কে একদা যিনি ঘোষণা করেছিলেন দেশ স্বাধীন হবার আগে) প্রকাশ্য রাজপথে ল্যাম্প-পোষ্টে ঝুলিয়ে গুলি করতে দেখেছে।

কলকাতা থেকে কয়েম্বাটুর জুড়ে স্বরু হয়েছে সর্ব্বাত্মক হরতাল চারিদিকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, খুন, সন্ত্রাস রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড, অগ্নিকাণ্ড। শহরের বিরাট বাড়ীগুলি জ্বলছে। কার্ফু চারিদিকে। বম্বে বড়বাজারের বড় বড় ব্যবসায়ীরা বর্ডার পার হয়ে জলপথে রাতের অন্ধকারে পালাচ্ছে প্রতিবেশী দেশে।

এইসব আজগুবি স্বপ্নের ছবি তার মন জুড়ে নানা প্রশ্নে উদ্বেলিত। এমনদিন কি আসবে এদেশে সামরিক জুটার পায়ের তলায় পদদলিত হবে জনগণের স্বার্থ। এইতো সেদিন সেই উচ্চাভিলাষী দেশ নায়ক মারা গেলেন। তার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী আকাশ থেকে ছড়ানো হলো তার দেহ ভস্মরাশী। অবশিষ্ট ভাসানো হলো ত্রিবেনী সংগমে।

শেষের স্বপ্নটাই মারাত্মক বিভ্রান্তকারী।

একি বেকারীর জ্বালা ? একি প্রতিহত কোন স্বাধীন মতাদর্শের উত্থান পতন।

এমন ঘটনা বা চিন্তা তো তার জীবনে আসেনি কোনদিন—আত্মহত্যা। ভাবতে ভয় লাগে। বিভৎস বিকৃতি। এই সমাজ-

গর্ভে লুকিয়ে আছে যে পাপবোধ এ তারই বিষাক্ত প্রতিক্রীয়া। শিকারকে একা পেয়ে গেছে দুরাচার।
এমন সময় প্রশান্ত ঘরে ঢোকে। নির্বিকার মানিককে এতবেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। সে এসেছিল একজন গেরিলা সৈনিকের মত প্রচণ্ড তৎপরতা নিয়ে। আশা করেছিল লোহা পেটা ইস্পাতের মত এই মানুষটার অক্ষয় অমর চেতনাবোধ কোন দিনই ভেংগে পড়ার নয়। মানিকের এই নির্বিকার অপ্রস্তুত মানসিক বিবর্ষতা সেকি লক্ষ্য করেছে ? জোর কদমে একটা গোটা কর্মব্যস্ত 'দিন যখন পৃথিবী নামক রণক্ষেত্রকে দুর্ব্বার গতিতে তছনছ করছে, পতন ঘটাচ্ছে রথি, মহারথির, বিবদমান শিবিরে শিবিরে যখন সংগ্রামের নয়া কৌশল নিয়ে চলেছে জোর তৎপরতা ঠিক সেই সময় একজন প্রতিশ্রুতি বদ্ধ সৈনিকের, ক্লান্তির, নৈরাশ্যময় চিন্তার নিঃশব্দ রোমন্থনের এই কি অবকাশ ?
—কি ব্যাপার প্রশান্ত ?
মানিকের সামনে একটা দৈনিক সংবাদপত্র মেলে ধরে প্রশান্ত। এ যেন দর্পনে মুখ দেখা।

"তাসখন্দে ভারতের প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে"

হাত জোড় করা নিরীহ বিক্রিত একটি ছবি।

বিছানা থেকে উঠে পড়ে মানিক। জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। সমস্ত আকাশ তন্ন তন্নকরে খোজে ধুসর মেঘ রংয়ের মৃতদেহটা।
—তুই কি মনে করিস এটা স্বাভাবিক মৃত্যু ?
—জানি না। মানিকের নির্বিকার উত্তর।
একটা মিথ্যা কাল্পনিক কুহকের পেছনে সে কি নিজের মনকে এতক্ষণ অশ্বমেধের ঘোড়ার মত ছুটিয়ে চলেছিল ? তাদের জীবনকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্র তারই প্রতিক্রীড়ায় ভেসে যাক দুরন্ত ঘোড়শোয়ার এটাই গোপন চক্রান্ত। জ্যামিতিক নিয়মে তাসখন্দ্ থেকে ভারত

বর্ষ একটি জটিল পথ। কে বলতে পারে ভারতমহাসাগরের এপারে এই উপমহাদেশে অদূর ভবিষ্যতে 'বিগব্রাদার' দের তথ্যের ভারসাম্য পরীক্ষায় কৌশলের লড়াইয়ে তাদের মত মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে লড়িয়ে দেওয়া হবে না ?

কোথায় সেই আকাশের বুকে ঝুলে থাকা কাল্পনিক মৃতদেহ ? কোথায় সেই কুট কৌশলী শকুনি ইন্দ্রপতন ঘটাতে পারদর্শী ? সত্য এবং মিথ্যা একই রাজপথ জনপদ দিয়ে পাশা পাশি পথ হাঁটে।

মানিক কাগজটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে গিয়ে আর একটি অতিমূল্যবান খবর কাগজের অবহেলিত এককোণে বহু খবরের আবর্জনার একপাশে লুকোনো অবস্থায় পেয়ে চমকে যায়। নিঃশব্দে প্রশান্তকে দেখায় —এই দেখ্।

ঝুঁকে পড়ে প্রশান্ত।

"নয় মাস একুশদিন লাগাতর লক-আউট করার পর মালিকপক্ষ আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করে জাতীয় স্বার্থে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছেন।" ইত্যাদি...

দুই বন্ধু উঠে পড়ে। ঘরের তালাদের পথে নামে। আলোঝলমলে আকাশের তলা দিয়ে শতশত পদাতিকের ভিড়ে ওরাও নিঃশব্দে মিশে যায়। এগিয়ে চলে সেই দিকে—যেখানে চিমনীর ধোঁয়া বয়লার চুল্লির লিলিহান শিখা হাজার হাজার বজ্রমুষ্টি লোহা মাটি গলিয়ে ইস্পাত তৈরী করছে, যেখানে আরও অসংখ্য বন্ধুরা একটি সমান্তরাল রেখায় মিলিত হবার প্রয়াসে ঘিরে আছে গোটা মানচিত্র। সেই দুর্ব্বার জীবনস্রোতের মধ্যে ওরা ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে।